প্রথম প্রকাশ ১৯৫৮

প্রকাশক :

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ধর এল্ এল্ বি

ইউ. এন্. ধর য্যাণ্ড সন্স প্রাঃ লিঃ

১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট

কলিকাতা-১২

মুদ্রাকর :

শ্রীরতিকান্ত ঘোষ

দি সত্যনারাণ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২০৯এ, বিধান সরণী

কলিকাতা-৬

শ্রীযুত সন্তোষকুমার বসু
অধ্যাপক, বিশ্বভারতী,
বন্ধুবরেষু—

‘পরিত্রাণায় সাধূনাং
বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং
ধর্মসংস্থাপনার্থায়—’

রবীন্দ্রনাথের কাব্যনাট্যতত্ত্ব নিয়ে প্রভূত পরিমাণ লেখা আমাদের কলম থেকে বের হয়ে স্তূপীকৃত হয়েছে, কিন্তু তাঁর চিন্তা-ভাবনা নিয়ে লেখার সংখ্যা অনুপাতে খুবই কম। বিশেষে তাঁর রচনার সমাজ-ভাবনার দিকটি নানা কারণে প্রায় উপেক্ষিতই ছিল, সম্প্রতি এ বিষয়ে কারো কারো মনোযোগ আকৃষ্ট হচ্ছে। কিন্তু সে-অভাব পূরণ করার উৎসাহ নিয়ে এ বইটি লিখিত নয়। সাম্প্রতিক ছাত্র এবং তরুণের দল রবীন্দ্র-রচনা পড়তে যেন অনাগ্রহী হয়ে পড়েছে, এমন কি, তাদের মনে রবীন্দ্র-অনাস্থার ভাবও কোনো কোনো ক্ষেত্রে তীব্র হয়ে উঠেছে। যদিও এজন্য ঠিক তরুণদের অপরাধী করা যায় না। আমরাই ভাষণে-কথনে-লিখনে রবীন্দ্রনাথকে এমনভাবে উপস্থাপিত করেছি যাতে কবিকে তারা সনাতনী প্রাচীন ধাতের লেখক ও প্রতিক্রিয়াশীল মানুষ ব'লে সহজেই চিনে রেখেছে। মনে করেছে রবীন্দ্রনাথ শুধু ভূমা-অসীমের তত্ত্ব করেছেন, সেই দৃষ্টিকোণ থেকে কেবল কুহেলিকারই সৃষ্টি করেছেন, চলমান বাস্তব জীবনের প্রকৃতি নিয়ে কিছু বলেননি। রবীন্দ্রনাথ তাদের কাছে মহান্, কিন্তু অচল, শেল্‌ফের সর্বোচ্চে রেখে নমস্কার ক'রে বিদায় দেওয়ার যোগ্য। অথচ তারুণ্য এবং প্রগতিকে রবীন্দ্রনাথের মত এদেশের আর কোন্ মহাজনই বা এত প্রবলভাবে অভিনন্দন জানিয়েছেন? মনোগত এবংবিধ আক্ষেপই আমাদের এই পুস্তিকা গ্রন্থনে প্রবর্তিত করেছে।

তথ্যের দিক থেকে যে দু'টি গ্রন্থ এই বই লেখায় আমাদের উপকৃত করেছে তা হ'ল শ্রীযুত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্র-জীবনী' ও শ্রীযুত নেপাল মজুমদার লিখিত 'ভারতে জাতীয়তা, আন্তর্জাতিকতা ও রবীন্দ্রনাথ'। প্রকাশিত মতামত অবশ্য আমাদেরই। আর এই পুস্তকের একটু অভিনবতা বোধ হয় এইখানে যে, মনীষা হিসেবে রবীন্দ্রনাথের মনন-চিন্তা এবং কবি-হিসেবে তাঁর কল্পনাবস্তু দৃশ্যতঃ পৃথক্ ব্যাপাব হলেও অনেকক্ষেত্রেই যে মৌলভাবে এক এটিও দেখানোর প্রয়াস, প্রগতি-গুরু মহাকবিকে সব মিলিয়ে বিচার করা।

আজকের সমাজ-পরিবর্তনের পটভূমিকায় বইটি তরুণদের নূতন ক'রে রবীন্দ্র-ভাবনায় উদ্‌বুদ্ধ করলে তবেই শ্রম সার্থক মনে করব।

স্নেহাস্পদ ছাত্র শ্রীমান্ মুসা কালিম বইটির শব্দসূচী প্রস্তুত করেছে। প্রকাশক বন্ধু দ্বিজেনদাকেও এই অবসরে অজস্র সাধুবাদ জানাই।

—গ্রন্থকার

বিষয়-সূচী

সমাজ ॥ প্রগতি ॥ রবীন্দ্রনাথ

পূর্বচিন্তা

রবীন্দ্রনাথের সৃজনধর্মী বিপুল সাহিত্যরচনার মৌল উপাদান দু'টি—নিসর্গ এবং মানব-সমাজ। তাঁর মননধর্মী রচনার অর্থাৎ সাহিত্য, শিক্ষা, সমাজ-রাষ্ট্র-বিষয়ক চিন্তার উপাদান একটিমাত্র—ঐ মানব-সমাজ। নৈসর্গিক উপাদান মোটামুটি স্থির, অথচ মানব-সমাজ সদাচঞ্চল, ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তমান। সামাজিক মানুষ রবীন্দ্রনাথও অনুভব, ধারণা, মত নিয়ে কালে কালে পরিবর্তিত। তাঁর পক্ষে বিশেষ এই যে, তিনি নিসর্গের মধ্যেও পরিবর্তন-প্রবাহ লক্ষ্য করেছেন, ঋতুর পালাবদলের মধ্যে নবীনের অশ্রান্ত পদক্ষেপ, নিজ বিকাশের মধ্যেও রূপ-রূপান্তর জন্ম-জন্মান্তর। নিসর্গই হোক, মানুষই হোক আর আত্মনিরীক্ষাই হোক, কবির সবিস্ময় অনুভব তাঁর প্রৌঢ় রচনায় একটিমাত্র ভাবকে কেন্দ্র ক'রে আবর্তিত, তা হ'ল অনিবার্য চলায় নিত্যনব পথের যাত্রী মানুষ, নিসর্গসহ। রবীন্দ্রনাথ ক্ষণবাদী হলেও অস্তিত্ববাদী এবং সেই সঙ্গে আশাবাদীও। কিন্তু তাঁর আত্মনিরীক্ষণমূলক, নিতান্ত সাব্‌জেক্‌টিভ্‌ কবিতাগুলিরও সমাজ-সম্পর্ক নির্ধারণ করা যেতে পারে নানাভাবে। মনে রাখতে হবে রবীন্দ্রনাথ মহাকবি, অর্থাৎ এমন কবি যাঁর আত্মপ্রকাশের মধ্যে মানবসমাজের আত্মকথাও তাঁর জ্ঞাত-অজ্ঞাতসারে প্রকাশিত হয়ে পড়েছে, সাধারণ কবিদের মত যিনি ঠিক সাময়িকতার অনুবর্তন করেন নি, যাঁর রচনার মধ্যে 'আর-একজন কে রচনাকারী আছেন, যাঁহার সম্মুখে সেই ভাবী তাৎপর্য প্রত্যক্ষ বর্তমান'। ফলে সাময়িকতা চিরন্তনতায় এবং ব্যক্তি সমাজে মিশে এক দ্বান্দ্বিক সমাশ্রয় লাভ করেছে। তাঁর নিজের কথা কেমন ক'রে তাঁর অগোচরে মানবসমাজের মর্ম-কথা হয়ে পড়ছে এ বিষয়ে কবি 'অন্তর্যামী' কবিতায় বিস্ময় প্রকাশ ক'রে বলেছেন—

বলিতেছিলাম বসি একধারে
আপনার কথা আপন জনারে,
শুনাতেছিলাম ঘরের দুয়ারে
        ঘরের কাহিনী যত,
তুমি সে ভাষারে দহিয়া অনলে
ডুবায়ে ভাসায়ে নয়নের জলে
নবীন প্রতিমা নব কৌশলে
        গড়িলে মনের মতো।

এর ব্যাখ্যায় 'আত্মপরিচয়ে' তিনি বলছেন—"সেই সোজা কথা, সেই আমার নিজের কথার মধ্যে এমন একটা সুর আসিয়া পড়ে, যাহাতে তাহা ব্যক্তিগত না হইয়া বিশ্বের হইয়া উঠে।" এই ব্যাপারটি উপলব্ধি করেই তিনি সাহিত্য-সমালোচনায় একস্থানে এই প্রণিধানযোগ্য মন্তব্য প্রকাশ করেছেন যে—"সাহিত্য ব্যক্তিবিশেষের নহে, তাহা রচয়িতার নহে, তাহা দৈববাণী।" ফলতঃ একথা সমীচীনভাবে মনে করতেই হয় যে আত্মভাষণশীল গীতিকবি হলেও রবীন্দ্রনাথের বহু কবিতায় সমাজের ভাবনা প্রকাশ পেয়েছে। সমাজ এই কবিকে উপলক্ষ্য ক'রে কবির কল্পনাশক্তির সুবিধা নিয়ে নিজেকে প্রকাশ করেছে তাঁর বিশিষ্ট ভাষারীতির মধ্য দিয়ে।

কবির সমাজ-সচেতনতা যে-কালে বহির্বঙ্গে খুব পরিস্ফুট নয় এমন সময়কার দু'একটি দৃষ্টান্তে কবির অজ্ঞাতে তাঁর মানসে সামাজিক প্রক্রিয়া লক্ষ্য করা যাক। 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ'। বাঁধ-ভাঙার অতিপ্রবল আগ্রহ এবং সীমাতিরিক্ত আবেগ-উচ্ছ্বাসে কবিতাটি আদ্যন্ত দোলায়িত। এর কাব্যার্থ নির্ণয়কল্পে সমালোচক বলেছেন—হৃদয়-অরণ্য থেকে নিষ্ক্রমণ, অন্ধকার থেকে আলোকে আসার উৎসাহ প্রভৃতি। এ ব্যাখ্যা কবিতাটি থেকে স্পষ্টতর কিছু নয়। প্রশ্ন হতে পারে কিসের অরণ্য, কাকে বলি অন্ধকার, কাকেই বা আলোক? দ্বন্দ্ববিমথিত কবিচিত্তের যথার্থ স্বরূপ কী? বলা বাহুল্য, তরুণ কবির ব্যক্তিগত জীবন থেকে তাঁর বহুবর্ণিত অবরুদ্ধতার এবং অন্ধকারের কোনো ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে না। বাধ্য হয়েই আমাদের দৃষ্টি ফেরাতে হবে সমাজ-ইতিহাসের দিকে। সেখানে প্রথমতঃ দেখি, উনিশ শতকের ব্যক্তিক-ভাবনাদীপ্তিহীন নির্দিষ্ট ধারায় বহমান ক্লাসিকতাধর্মী সাহিত্যের প্রাধান্য। মধুসূদন, হেমচন্দ্র, এমনকি নবীনচন্দ্রও একই পথের পথিক। এঁদের সৃষ্টিতে নির্বাচিত বিষয়েরই প্রাধান্য, ভাষাভঙ্গিতে প্রাধান্য পরিস্ফুট সীমিত অর্থের। তারও পূর্বে ভারতচন্দ্রাদিতে রীতিসিদ্ধ দাঁড়াকবির গীত মাত্র। আত্মবিস্তারপ্রবণ, কল্পনায় সর্বগ্রাসী কবিমানসের পক্ষে এই অবরুদ্ধতা দুঃসহ, তাই বিদ্রোহ। 'কেশ এলাইয়া, ফুল কুড়াইয়া' অথবা 'শিখর হইতে শিখরে ছুটিব' প্রভৃতির মধ্যে আবেগমুক্তির সাংকেতিক চিত্র। কিন্তু কেবল সংহত সীমিত ক্লাসিক্যাল সাহিত্যভঙ্গিমাই গীতিকবির এত প্রবল অন্তঃসংঘাতের কারণ হতে পারে না। এর মূল নিঃসন্দেহে আরও গভীরে, অর্থাৎ সমগ্র সামাজিকতার মর্মে নিহিত। সে সমাজ সামন্ততান্ত্রিক স্থাবর প্রথায় জীর্ণ, জড, গতিহীন, নির্জীব। বৈদেশিক সংস্কৃতির ও জীবনধারার সংস্পর্শে তার মধ্যে মাত্র স্পন্দন শুরু হয়েছে, কোনো জাগরণ ও ব্যাপক শুদ্ধি ঘটেনি। কবির মাধ্যমে সমাজের অবরুদ্ধতামোচনের এই আগ্রহ। উনিশ শতকের পুরাতন ও নূতনের সন্ধিলগ্নে বুদ্ধি ও বিবেকবিচারের জাগরণকে সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে বুর্জোয়া-বিপ্লবও বলা যায়। কিন্তু জাতির নবজন্ম বলা সমীচীন হবে না।

কাবণ, কতিপয় আধুনিক শিক্ষিত মানুষের বিবেকমুক্তি জাতীয় বেনেসাঁসের পরিচায়ক নয়। রবীন্দ্রনাথ যেমন সেকালের শিক্ষিত তেমনি ভাবিকালের সামাজিক স্বাধীনতা-কামী সমস্ত মানুষেব হয়েই সামন্তযুগের অমানবীয় স্থবিবতাব বিরুদ্ধে বিদ্রোহ-ঘোষণা কবলেন—'ভাঙ্ ভাঙ্ ভাঙ্ কাবা, আঘাতে আঘাত কব'। এই ভাবেব পবিপুষ্টি এবং পবিণাম কবিব পববর্তী অসংখ্য কবিতায। কাছাকাছি দৃষ্টান্ত হ'ল—'ইহাব চেয়ে হতেম যদি আবব বেদুয়িন'। অনুরূপ আবেগ-উচ্ছ্বাসেব এবং কবিব প্রবল ব্যক্তিত্বেব প্রকাশেব দ্বাবা চিহ্নিত কবিতা 'সোনাব তবী' কাব্যগ্রন্থের 'ঝুলন'—বহিবঙ্গে তেমনই অস্পষ্ট, ফলে অধিকতব অস্পষ্ট কথায ব্যাখ্যাত। অথচ, কবিতাটিতে একটি স্পষ্ট ভাষণ যে পুনঃপুনঃ উচ্চাবিত হযেছে, তা একটু অনুধাবন কবলেই ধবা পডে। সে হল কবিব ব্যক্তিক কল্পসুখদুঃখবিলীন একাকিত্বেব বন্ধন অতিক্রম কবাব তীব্র ব্যাকুলতা। কবি-হিসেবে তিনি শুধু নিসর্গ নিযে আপন মনে যে কল্পনাব জাল গ্রন্থন কবেছেন, তাব পবিচয একালেব আত্মকথায সর্বত্র বযেছে। যেমন, 'কডি ও কোমলে'—

আপনি কণ্টক আমি, আপনি জর্জব।
আপনাব মাঝে আমি শুধু ব্যথা পাই।

অথবা,

কুসুমদলেব বেডা, তাবি মাঝে ছাযা,
সেথা বসে কবি আমি কল্পমধু পান,
বিজনে সৌবভময়ী মধুময়ী মাযা,
তাহাবি কুহকে আমি কবি আত্মদান।
বেণুমাখা পাখা লযে ঘবে ফিবে আসি
আপন সৌবভে থাকি আপনি উদাসী॥

যেমন, 'মানসী' কাব্যে—

সেই ছাযাতে বসিযা সাবাদিনমান
তরুমর্মব পবনে,
সেই মুকুল-আকুল বকুল-কুঞ্জ-ভবনে,

এই স্বার্থনিষ্ঠ জড কল্পনাব কবি হ'ল 'সোনাবতবী' কাব্যেব 'খাঁচাব পাখি'। 'দুই পাখি' কবিতায আত্মনিলীনতা এবং সমাজমুখিতাব দ্বন্দ্ব। এই আত্মকল্পনাবিলাসে রুদ্ধ অবস্থা থেকে কবি মানব-সমাজমুখীনতাব মধ্যে মুক্তি চেয়েছেন 'ঝুলন' কবিতায়। এই মুক্তি পেয়েছেন অবশ্য 'এবাব ফিবাও মোবে' কবিতাব সুবে। ভাবের দিক থেকে

ঐ দুটি কবিতার সাজাত্য আক্ষরিক ভাবেও অনুভব করা যায়। 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতায় সংরুদ্ধ কল্পলোক থেকে মুক্তির পরিস্ফুট আগ্রহ—

এবার ফিরাও মোরে, লয়ে যাও সংসারের তীরে
হে কল্পনে, রঙ্গময়ী। দুলায়ো না সমীরে সমীরে
তরঙ্গে তরঙ্গে আর, ভুলায়ো না মোহিনী মায়ায়।

'ঝুলন' কবিতায় অত পরিস্ফুট না হলেও আত্মগ্লানির একই কথা—

এতকাল আমি রেখেছিনু তারে
যতনভরে
শয়ন 'পরে।
ব্যথা পাছে লাগে, দুখ পাছে জাগে
নিশিদিন তাই বহু অনুরাগে
বাসর-শয়ন করেছি রচন
কুসুম থরে।
দুয়ার রুধিয়া রেখেছিনু তারে
গোপন ঘরে।

এই 'তারে' বলতে কবি কল্পনাবিলাসী অন্তরীণ নিজসত্তাকেই লক্ষ্য করেছেন। কিন্তু বাস্তব সমাজবোধের জাগরণের ফলে 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতায় যেমন— 'ওরে তুই ওঠ্ আজি।' এবং—

বাহিরিনু হেথা হতে
উন্মুক্ত অম্বরতলে, ধূসর-প্রসর রাজপথে
জনতার মাঝখানে।

'ঝুলন' কবিতাতেও তেমনি প্রেম ও নিসর্গরম্যতার স্বার্থমগ্ন বিশ্ববিমুখ অবস্থা থেকে নিষ্ক্রমণের পরিচয়—

ভেবেছি আজিকে খেলিতে হইবে নূতন খেলা,
রাত্রিবেলা।
মরণ-দোলায় ধরি রশিগাছি
বসিব দুজনে বড়ো কাছাকাছি
ঝঞ্ঝা আসিয়া অট্টহাসিয়া
মারিবে ঠেলা—

এবং

ভীষণ রঙ্গে ভবতরঙ্গে ভাসাই ভেলা,
বাহির হয়েছি স্বপ্নশয়ন করিয়া হেলা।

এই কবিতায় আবরণমুক্ত "পরাণ-বধূ" ব'লে যাকে প্রিয়ত্বের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে, সে হ'ল কবির বহু-অভিলষিত এই নবজীবন, এই মানুষ-সমাজের আহ্বানে জাগরিত কবিসত্তা।

এ আহ্বান মহাকবি বারে বারেই অনুভব করেছেন তাঁর নিসর্গপ্রেমসৌন্দর্যনিষ্ঠার মধ্যে এবং যেমন নিজে সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হয়েছেন, তেমনি আমাদেরও রণসজ্জায় সজ্জিত হওয়ার প্রেরণা দিয়েছেন। কিন্তু কবির মর্ত্যপ্রীতি, সৌন্দর্যাসক্তি প্রভৃতিও কার্যকারণসূত্রে বাঙলার বৃহত্তর সামাজিক প্রবৃত্তি থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো ব্যাপার নয়। কবি তাঁর অজ্ঞাতে নানাভাবে আমাদের পরিচিত অথবা অর্ধ-পরিচিত বাসনাবাজিকেই ভাষামূর্তি দিয়েছেন। তবু একথা ঠিক যে মানবনিষ্ঠা এবং সমাজ-সচেতনতাই মহাকবিত্বের প্রধানতম লক্ষণ এবং তা রবীন্দ্রসাহিত্যে প্রচুর পরিমাণে রয়েছে। শুধু তাই নয়, এবিষয়ে রবীন্দ্রনাথ একালের সমস্ত ভাবুকদের থেকে অগ্রগামীও, যেহেতু তিনি সংগ্রাম এবং বিপ্লবের মধ্য দিয়ে ভারতীয় শোষিত সাধারণ মানুষের সর্বাঙ্গীণ মনুষ্যত্বলাভের স্বপ্ন দেখেছেন সাহিত্যে, আর কার্যকর পথ-নির্দেশের প্রয়াস করেছেন প্রবন্ধে, ভাষণে, এমনকি কর্মীর ভূমিকাতেও। এই বিষয়গুলি তুলে ধরার জন্যই আমাদের এই পুস্তকলিখনের প্রয়াস। যে-কোনো কারণেই হোক আমরা আমাদের জাতীয় মহাকবি ও চিন্তানায়কের বিপ্লবী সমাজবাদী প্রকৃতি সম্পর্কে প্রায় নীরব থেকে গেছি, তাঁর নিসর্গপ্রীতি ও প্রণয়ভাবনার কবিতাবলীকে কিছু মান-মর্যাদা দিয়ে বহুমান করেছি তাঁর তথাকথিত এবং আমাদের খুবই মনঃপূত ঈশ্বর-ভাবুকতাকে, আর তাঁর দেশাত্মবোধ-মানবতাবোধ বিষয়ে লিখিত কাব্যগুলির গভীরে না গিয়ে তাঁকে কখনো প্রাচীনধর্মী জাতীয়তাবাদী, কখনো বা ভাবাত্মক বিশ্বপ্রেমিক ব'লে চিহ্নিত করেছি।

রবীন্দ্রনাথ প্রচলিত কোনো ধর্মীয় ধারণার অনুগত ঈশ্বরে বিশ্বাসী ছিলেন না। তার অরূপ বা অসীম এমন একটা সত্তা যার নিসর্গে এবং মানব-সমাজে সক্রিয় পদক্ষেপ। মানুষের প্রগতির মধ্যেই এই ঈশ্বরের বিশেষ অনুভবগম্য প্রকাশ, তাই তাঁরই কথামত, তাঁর কাব্যের ধারা নিসর্গ থেকে ক্রমশঃ মানুষে এসে পরিণাম পেয়েছে। প্রকারান্তরে বলতে গেলে সৃষ্টির এবং মনুষ্যত্বের মধ্যে ছাড়া এক অঙ্গুলি ঊর্ধ্বেও তিনি ঈশ্বরের কল্পনা করতে পারেন না। 'সীমার মধ্যে অসীম' মানেই এই। নিসর্গ এবং মানুষকে তিনি এত চরম ক'রে দেখেছেন যে তার বিশেষ রূপ ঈশ্বরের রূপ ব'লে কল্পিত হয়েছে। এইজন্য রবীন্দ্রনাথকে ঈশ্বরে ভক্তির কবি না ব'লে নিসর্গপ্রীতির এবং মানবানুরাগের কবি বলাই সমীচীন। এসব বিষয় নিয়ে আমরা গ্রন্থান্তরে বিচার-বিশ্লেষণ করেছি*, তার পুনরুক্তি করতে এখন আর ইচ্ছে হয় না। সমানধর্মা হয়ে সহৃদয়তা-

* 'রবীন্দ্র-প্রতিভার পরিচয়' ও 'বৈষ্ণব-রস-প্রকাশ' গ্রন্থে

সহকারে কবিকে ধরতে পারলে দেখা যাবে রবীন্দ্রনাথ কাব্যরসব্রহ্মের কথা বলেছেন, অনুভব করেছেন নিসর্গসৌন্দর্যব্রহ্মকে, পরিবর্তন বা গতিব্রহ্মকে, নমস্কার জানিয়েছেন মানবব্রহ্মকে। চতুর্ভুজ, দ্বিভুজ, সিংহারূঢ়, বৃষারূঢ়, তান্ত্রিক বা অহিংস ঈশ্বরভক্তির এই দেশে এই ধরণের ঈশ্বরবাদ বৈপ্লবিক নিঃসন্দেহে। তবু রবীন্দ্রনাথকে নিরীশ্বর বলা যায় না এই কারণে যে তিনি মানবসমাজে (তথা নিসর্গে) সক্রিয় একটি সত্তা বা ঐতিহাসিক শক্তিকে অনুভব করেছেন। আর এই সত্তা জ্ঞানগম্য নয়, কল্পনাদীপ্ত বোধি বা প্রজ্ঞানের সাহায্যে অনুভবনীয় এমন মনোভাবও হয়ত বা প্রকাশ করেছেন। প্রচলিত সংস্কারাবৃত ধর্মবোধের পরিচয়, রবীন্দ্র-সমকালীনদের মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দ বা মহাত্মা গান্ধীর চারিত্র্যে যে-পরিমাণে দেখা যায়, রবীন্দ্রনাথে তার অংশের অংশও নেই। প্রখ্যাত সাহিত্যিকদের মধ্যে প্রগতিশীল ব'লে স্বীকৃত টলস্টয়ে প্রচলিত ধর্মের এমনকি ধর্মতন্ত্রের প্রতি বিশেষ আনুগত্য পাঠকদের পরিচিত। এরকম ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধ মানুষ-চরমতাবাদ তাঁকে একালের শ্রেষ্ঠ প্রগতিশীল সাহিত্যিক বলেই চিহ্নিত করবে।

প্রবন্ধে ও ভাষণে রবীন্দ্রনাথের প্রগতিশীল সামাজিক ব্যক্তিত্বের পরিচয় দিনের আলোর মতই স্পষ্ট। বিশ শতকের, বিশেষতঃ তাঁর যুদ্ধোত্তর কাব্যনাটকেও প্রায় সেরকমই, তর্কাতীত। এজন্য ভূমিকা করতে গিয়ে আমরা কবির সেই শ্রেণীর দুটি কবিতাকেই বেছে নিয়েছি, যা তাঁর প্রথম জীবনের রচনা, যার মধ্যে সমাজবোধ অপরিস্ফুট এবং পাঠকপক্ষে সন্দিগ্ধও বটে। আর একটু অগ্রবর্তী হয়ে আমরা একথাও বলতে পারি যে, কাব্যনাটকে কবির যে বিপ্লবী ব্যক্তিত্ব নিজকে অবারিত করতে চেয়েছে, তারই বিস্তৃত মননধর্মী প্রকাশ ঘটেছে তাঁর প্রবন্ধাদিতে। কাব্যের ভাবুকতা এবং প্রবন্ধের মননধারা পরস্পরের পরিপূরক সহায়ক হিসেবেই অবস্থান করছে। নানান্ ভঙ্গিতে প্রকাশমান রবীন্দ্রচিত্ত বিচিত্র, কিন্তু বিভক্ত এবং পরস্পর-বিরোধী নয়। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের প্রগতি-ভাবনায় কাব্যার্থের সঙ্গে গদ্যার্থের সমন্বয়-দর্শনও এ আলোচনার অন্যতম কর্তব্য। কিন্তু তার পূর্বে কবিমনীষীর যে ক'টি ভাবনা ও আদর্শ-বিষয়ে তাঁর রক্ষণশীলতা অনুমিত হতে পারে, সেগুলি সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য উপস্থাপিত করছি।

রবীন্দ্রনাথ এককালে সংস্কারমুক্ত বৈদিক ভারতের, মধ্যযুগের ভারতের নয়, পক্ষপাতী হয়ে পড়েছিলেন। সে হ'ল চৈতালি-কল্পনা-নৈবেদ্য কাব্যরচনার যুগে। ঐ সময় 'স্বদেশ' পুস্তকের প্রবন্ধাবলী এবং 'ধর্ম' ও 'শান্তিনিকেতনে'র কিছু ভাষণ। মোটামুটি ঊনিশ শতকের শেষ থেকে বিশ শতকের প্রথম দশক পর্যন্ত কবির প্রাচীন জীবন ও সাহিত্যের দিকে ফিরে-তাকানোর সময়। এই দশকের প্রারম্ভেই শান্তি-

নিকেতনে তাঁব ব্রহ্মাচর্যাশ্রম-স্থাপন। এই সমযকাব ববীন্দ্রনাথ প্রায় নিঃশেষে জাতীযতাবাদী, কাবণ, শুধু বেদ-উপনিষদের তাত্বিক আদর্শই তিনি প্রচাব করছেন না, বর্ণাশ্রমেব অনুগত জীবনকে ববণ কবাব উৎসাহও তিনি প্রকাশ কবেছেন। তাঁব চিত্তে সাময়িকভাবে প্রাচীনেব উপব এই অনুবাগ কয়েকটি কাবণে জন্মেছিল। মুখ্য কাবণ কাব্যিক, রোম্যাণ্টিক। অবক্ষয়িত সমাজে 'শুধু দিনযাপনের শুধু প্রাণধাবণেব গ্লানি' থেকে মুক্তিব আশায এই কাল্পনিক স্বর্গেব আশ্রয চেযেছেন কবি। প্রাচীন তপোবন-জীবনেব যে ছবি তিনি এঁকেছেন তাও কালিদাসেব কাব্য এবং উপনিষদেব কাহিনীব উপব তাঁব কল্পনাপ্রবণ মনেব অনুবঞ্জন। চৈতালি, কল্পনা এবং নৈবেদ্যে কবি কল্পনায় যে প্রাচীন ভাবতকে দেখেছিলেন, তাবই বাস্তব রূপ দেওযাব লীলাময প্রকাশ হ'ল তাঁব ব্রহ্মচর্য-বিদ্যালয এবং পববর্তী শান্তিনিকেতনেব শিক্ষাধাবা। এ তাঁব কাব্যকল্পনাবই মর্মরূপ, 'কর্মরূপে সেও কাব্য'। বলা যায, যে-পলাতক মন নিযে কবি প্রাচীনে প্রযাণ কবেছিলেন 'চৈতালি'-'কল্পনা' কাব্যে, তা-ই স্থাযী আদর্শ ভাবরূপ পেয়েছিল নৈবেদ্যে এবং আদর্শ কর্মরূপ পেযেছিল শান্তিনিকেতনে। কাব্যেব মত একেও কবিব 'বচনা' বলা যেতে পাবে। ক্রমে আদর্শেব সঙ্গে প্রচলিত বাস্তবেব সামঞ্জস্য স্থাপন কবিকে কবতে হযেছে। 'বিশ্বভাবতী' সেও আদর্শ এবং বাস্তবেব মিশ্রণ। আদর্শরূপ অপসৃত হতে হতে ক্রমে হযত বা এটি মামুলি শিক্ষাযতনে পবিণত হতে চলেছে। সে যাই হোক, কবিব প্রিয় কাব্যাদর্শেব সন্তান ব'লে এই শিক্ষাযতনেব উপব স্নেহান্ধ মমত্ব এত বেশি ছিল যে তিনি অন্যপক্ষে 'গৃহছাড়া লক্ষ্মীছাড়া' স্বভাবেব এবং বিপ্লবী পথিক মনোভাবেব প্রতিষ্ঠাতা হযেও শান্তিনিকেতনকে বাইবেব চলমান জনজীবনেব স্পর্শ থেকে বাঁচিযে বাখতে চেষ্টা কবতেন। তবু অসহযোগ এবং চবকা-শব্দবেব উচ্ছ্বাস কি ছাত্র কি অধ্যাপক সকল আশ্রমিককেই একদা স্পর্শ কবেছিল, গান্ধী-সুভাষ মত-সংঘর্ষেও আশ্রমিকদেব চিত্ত কম আন্দোলিত হয়নি। এসব নিযে কবি উদ্বিগ্ন হলেও প্রবল প্রতি-বাদ কখনোই কিন্তু কবেন নি, তাব কাবণ তিনি একনাযকতন্ত্রেব সমর্থক ছিলেন না। আব তিনি নিজে দলীয় বাজনীতিতে যোগ না দিলেও, দেশেব এমনকি বিদেশেবও সমস্ত বাজনীতিক ঘটনাব সঙ্গে পূর্ণ সংযোগ বেখে চলতেন, ভাষণে এবং লিখনে, প্রতিবাদে অথবা কদাচিৎ সমর্থনে তিনি যথেষ্ট সোচ্চাব ছিলেন। শান্তিনিকেতন সম্বন্ধে স্নেহদুর্বলতাব অধীন হলেও অবশ্য তিনি একে দ্বিতীয় অচলাযতন বা তাসেব-দেশও ক'বে তুলতে চাননি এবং এব জন্মকাল থেকে এব সম্বন্ধে দ্বন্দ্ব-সংশয-শঙ্কা ভোগ কবেই এসেছেন। এই প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে বাইবে যে ভুল-বোঝাবুঝি ছিল সে-বিষযে অবহিত হয়ে কবি একসময বলেছিলেন—"শান্তিনিকেতনকে কেউ কেউ মনে কবে পৌবাণিক যুগেব জিনিস, তপোবনেব বল্কলে আগাগোড়া ঢাকা। হাযবে ভুবদৃষ্ট, শান্তিনিকেতন

যে কী, সেটা কিছুতেই সুস্পষ্ট হয়ে উঠল না। যারা প্রাচীনপন্থী তারা আমাদের ললাটে সনাতনেব ছাপ না দেখে চটে যায়, যাবা তরুণ তাবা আমাদেব মধ্যে পুবাতনের পবিচয় পেয়ে শ্রদ্ধা হাবায়" (পথে ও পথেব প্রান্তে)। অতএব, শান্তিনিকেতনকে ববীন্দ্রনাথেব বৈপ্লবিক ভাবকল্পনা ও চিন্তাধাবাব বিবোধী ব'লে কেউ অনুভব কবলে তাঁকে এই বলেই নিরস্ত কবতে হবে যে, এ আধুনিক বিশ্বেব শ্রেষ্ঠ কলাবিদেব কলাকর্ম-সামঞ্জস্যেব এক আশ্চর্য বহিঃপ্রকাশ এবং সেই অর্থে তা নিতান্ত সহনযোগ্য। তা ছাড়া দেখতে হবে, নৃত্য-গীত নিসর্গ-সৌন্দর্যেব মধ্যস্থতায কিশোবমনেব বিকাশেব যে আয়োজন তাও এক হিসেবে বৈপ্লবিক এবং স্বভাবেব পথে শিক্ষণ-পদ্ধতিব আমূল পরিবর্তনেব দিশাবী হওয়াব গৌবব এদেশে ববীন্দ্রনাথেবই প্রাপ্য।

প্রগতি-পথিক রবীন্দ্রনাথেব ক্ষেত্রে দ্বিতীয সন্দেহেব অবকাশ হ'ল তাঁব প্রবন্ধে এবং ভাষণে বাবংবাব উপনিষদেব মন্ত্র উদ্ধাব। এবিষযেও আমাদেব সুচিন্তিত অভিমত আমবা অন্যত্র বিচাবপূর্বক ব্যক্ত কবেছি। পুনরুক্তিব সংক্ষেপ ক'বে এইমাত্র বললেই যথেষ্ট হবে যে তাঁব প্রগতিমূলক ধাবণার অনুকূলে তিনি উপনিষদ্-মন্ত্রেব নূতন ব্যাখ্যা দিযেছেন। ফলে আধুনিক বাষ্ট্রনীতিক চিন্তাব ক্ষেত্রেও উপনিষদ্-বচন উদ্ধাব ক'বে নিজ বক্তব্যকে সমর্থন কবতে তাঁব কোনো দ্বিধাই হযনি। এবিষযে দু'তিনটি দৃষ্টান্ত এখানে দিচ্ছি, সর্বত্র একই ব্যাপাব বুঝতে হবে : (১) "কিন্তু যেনাহং নামৃতা স্যাম্ কিমহং তেন কুর্যাম্"—এ কথাটি যুবোপেবও অন্তবেব কথা। যুবোপও নিশ্চযই জানে, বেলে টেলিগ্রাফে কলে কাবখানায সে বড়ো নহে। এইজন্যই যুবোপ বীবেব ন্যায সত্যব্রত গ্রহণ কবিযাছে, বীবেব ন্যায সত্যেব জন্য ধনপ্রাণ উৎসর্গ কবিতেছে, এবং যতই ভুল কবিতেছে, যতই ব্যর্থ হইতেছে, ততই দ্বিগুণতব উৎসাহেব সহিত নূতন করিয়া উদ্যোগ আরম্ভ কবিতেছে—কিছুতেই হাল ছাডিযা দিতেছে না। মাঝে মাঝে অমঙ্গল দেখা দিতেছে, সংঘাতে সংঘর্ষে বহ্নি জ্বলিযা উঠিতেছে, সমুদ্রমন্থনে মাঝে মাঝে বিষও উদ্গীর্ণ হইতেছে, কিন্তু মন্দকে তাহাবা কোনোমতেই মানিযা লইতেছে না। অস্ত্র তাহাদেব প্রস্তুত, সৈন্যদল তাহাদেব নির্ভীক এবং সত্যেব দীক্ষায তাহারা মৃত্যুঞ্জযী বললাভ কবিয়াছে" (পথেব সঞ্চয়)। (২) "শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ। তোমবা যে ধামে রযেছ, যে লোকে বাস করছ, সে কোন্ লোক? ··তোমবা দিব্যলোকে বাস কবছ, অমৃতলোকে বাস কবছ।···সেই দিব্যধামেব আলো কোথা থেকে আসে? তমসঃ পবস্তাৎ। সত্য সেই জ্যোতি যা যুগে যুগে মোহের অন্ধকাবকে বিদীর্ণ ক'রে আসছে···বিরোধেব ভিতব দিযে সত্যকে পাচ্ছে, এছাডা সত্যকে পাবাব আব-কোনো উপায় মানুষেব নেই। ··ভেবে দেখো, মানুষকে কি অমৃতের পুত্র ক'বে তোলা সহজ। মানুষেব বিকাশে যত বাধা, ফুলেব

বিকাশে তত বাধা নেই।···এইজন্য ঈশ্বরকে ইতিহাসের বেড়া যুগে যুগে ভাঙতে হয়। তাঁর আলোককে তাঁর আকাশকে যা নিষেধ ক'রে দাঁড়ায় তারই উপরে একদিন তাঁর বজ্র এসে পড়ে, সেইখানে একদিন তাঁর ঝড় বয়। তবে মুক্তি। স্তূপাকার সংস্কার যা জমা হয়ে উঠে সমস্ত চলবার পথকে আটকে বসে আছে, সেইখানে রক্তস্রোত বয়ে যায়। তবে মুক্তি। স্বার্থের সঞ্চয় যখন অভ্রভেদী হয়ে ওঠে, তখন কামানের গোলা দিয়ে তাকে ভাঙতে হয়। তবে মুক্তি।··সংসারের পোষ্যপুত্র যারা তারা সংসারের ধর্ম গ্রহণ করে, সে ধর্ম—যে সবল সে দুর্বলের উপর প্রভুত্ব করবে। কিন্তু, মানুষ যে সংসারের পুত্র নয়, সে যে অমৃতের পুত্র। সেইজন্য তাকে নিজের গদা দিয়ে স্বার্থের ধর্ম, যা তার পরধর্ম, তাকে ধূলিসাৎ করতে হবে। এ সংগ্রাম মানুষকে করতেই হবে।····ইতিহাসবিধাতা তাই বললেন—নতুন হতে হবে। কামানের গর্জনে আজ সেই বাণীই শুনতে পাচ্ছি—নতুন হতে হবে।"—ইত্যাদি (শান্তিনিকেতন)। (৩) " ·· অথচ একদিন উপনিষদে বিধাতার কথা বলা হইয়াছিল, যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাৎ শাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ। অর্থাৎ তাঁর বিধান যথাতথ, তাহা এলোমেলো নয় এবং সে বিধান শাশ্বত কালের। তাহা নিত্যকাল হইতে এবং নিত্যকালের জন্য বিহিত। তাহা মুহূর্তে মুহূর্তে নূতন নূতন খেয়াল নয়। সুতরাং সেই নিত্যবিধানকে আমরা প্রত্যেকেই জ্ঞানের দ্বারা বুঝিয়া কর্মের দ্বারা আপন করিয়া লইতে পারি। তাকে যতই পাইব ততই নূতন নূতন বাধা কাটাইয়া চলিব। কেননা, যে বিধানে নিত্যতা আছে কোথাও সে একেবারে ঠেকিয়া যাইতে পারে না, বাধা সে অতিক্রম করিবেই। এই নিত্য এবং যথাতথ বিধানকে যথাতথরূপে জানাই বিজ্ঞান। সেই বিজ্ঞানের জোরে য়ুরোপের মনে এত বড়ো একটা ভরসা জন্মিয়াছে যে সে বলিতেছে, 'ম্যালেরিয়াকে বিদায় করিবই, কোনো রোগকেই টিকিতে দিব না, জ্ঞানের অভাব, অন্নের অভাব লোকালয় হইতে দূর হইবেই, মানুষের ঘরে যে-কেহ জন্মিবে—সকলেই দেহে মনে সুস্থসবল হইবে এবং রাষ্ট্রতন্ত্রে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের সহিত বিশ্বকল্যাণের সামঞ্জস্য সম্পূর্ণ হইয়া উঠিবে।'···" (কালান্তর)। এই হ'ল তাঁর উপনিষদ্ তত্ত্বকে কালোপযোগী ভাবনা দিয়ে নতুন ক'রে অনুভব ও প্রচার করা। উপনিষদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মনের খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক যদ্যপি ছিল, উপনিষদকে তিনি নিতান্ত স্বকীয় এবং আধুনিক অর্থ দিয়ে নবীন ক'রে তবেই গ্রহণ করেছেন। অমৃত, ভূমা, তপস্যা প্রভৃতি শব্দ পুনঃ-পুনঃ ব্যবহার করলেও ঐ শব্দগুলিকে মানুষের দুঃখবরণ, সংগ্রাম, অভিব্যক্তির ধারায় জয়যাত্রা প্রভৃতি অর্থে প্রয়োগ করেছেন। ফলতঃ উপনিষদের উপরেই রবীন্দ্রচিন্তা প্রভাব বিস্তার করেছে, রবীন্দ্রনাথের উপরে উপনিষদ্ নয়।

রবীন্দ্রনাথ পৌরাণিক এবং মধ্যযুগীয় চিন্তায় বিন্দুমাত্র আস্থাবান্ ছিলেন না, কারণ, কুসংস্কার, আচার-প্রথার দাসত্ব এবং জাতীয় জীবনের জড়ত্ব সামন্ততান্ত্রিকতা-সহায় পৌরাণিক ব্যবস্থা থেকেই প্রসার লাভ করেছে। উপনিষদের যুগকে তিনি জীর্ণতামুক্ত স্বাধীন চিন্তার যুগ বলেই মনে করতেন, এমন কি ঐকালের রাজাদেরও তিনি শ্রেণী-স্বার্থমুক্ত ও মানবতার রক্ষক ব'লে বিবেচনা করতেন। তাঁর এই ধারণার সঙ্গে অবশ্য কবিসুলভ স্বপ্ন মিশ্রিত ছিল, সেকথা পূর্বেই বলেছি। ফলতঃ এরকম অভিলাষ পোষণ করা তাঁর পক্ষে খুবই স্বাভাবিক ছিল যে—

যে জীবন ছিল তব তপোবনে,
যে জীবন ছিল তব রাজাসনে,
মুক্ত দীপ্ত সে মহাজীবনে চিত্ত ভরিয়া লব।

বৈশ্য ধনতন্ত্রপ্রধান এবং উপকরণবহুল আধুনিক যান্ত্রিক ও কৃত্রিম জীবন থেকে নিষ্কৃতি লাভ করতে চেয়ে তিনি প্রাগৈতিহাসিক জনপদ-জীবনকে কখনো কখনো শ্রেয় ব'লে মনে করেছেন, যেমন—'দাও ফিরে সে অরণ্য, লও এ নগর' প্রভৃতি। কিন্তু কবির একালের, মহাযুদ্ধ-পূর্বেকার এই মনোভাব অবশ্যই কাব্যিক, পলাতক, মানবসমাজ-দর্শনের দ্বারা এ মনোভাব এখনও পরিপুষ্ট নয়। এই মনোভাবেরই উচ্চতম অবস্থা নৈবেদ্য কাব্যে। এখানেও লক্ষণীয় উপনিষদের উপর কবির কল্পনার অনুরঞ্জন। তপোবনের জীবনের আদর্শ কোনো ইতিবৃত্তে পাওয়া যায় না, তিনি নিয়েছেন কবির অর্থাৎ কালিদাসের কাব্য থেকে। একথা তিনি নিজেই বলেছেন কয়েক জায়গায়। যেমন—

"আমি আশ্রমের আদর্শরূপে বার বার তপোবনের কথা বলেছি। সে তপোবন ইতিহাস বিশ্লেষণ ক'রে পাই নি। সে পেয়েছি কবির কাব্য থেকেই। তাই স্বভাবতই সে আদর্শকে আমি কাব্যরূপেই প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছি।" (আত্মপরিচয়)

"প্রাচীন ভারতের তপোবন জিনিসটার ঠিক বাস্তব রূপ কী তার ঐতিহাসিক ধারণা আজ সহজ নয়। তপোবনের যে প্রতিরূপ স্থায়িভাবে আঁকা পড়েছে ভারতের চিত্তে ও সাহিত্যে সে হচ্ছে একটি কল্যাণময় কল্পমূর্তি, বিলাসমোহমুক্ত প্রাণবান্ আনন্দের মূর্তি।

আধুনিক কালে জন্মেছি। কিন্তু এই ছবি রয়ে গেছে আমারও মনে। বর্তমান যুগের বিদ্যায়তনে ভাবলোকের সেই তপোবনকে রূপলোকে প্রকাশ করবার জন্যে একদা কিছুকাল ধরে আমার মনে আগ্রহ জেগেছিল।"

"কালিদাসের বহুকাল পরে জন্মেছি, কিন্তু এই ছবি রয়ে গেছে আমারও মনে।

যৌবনে নিভৃতে ছিলুম পদ্মাবক্ষে সাহিত্যসাধনায়। কাব্যচর্চাব মাঝখানে কখন এক সময়ে সেই তপোবনেব আহ্বান আমাব মনে এসে পৌঁছেছিল। ভাববিলীন তপোবন আমাব কাছ থেকে রূপ নিতে চেযেছিল আধুনিক-কালের কোনো একটি অনুকূল ক্ষেত্রে। যে প্রেবণা কাব্যরূপ-রচনায প্রবৃত্ত কবে, এব মধ্যে সেই প্রেবণাই ছিল—কেবলমাত্র বাণীরূপ নয়, প্রত্যক্ষরূপ।"

(শিক্ষা)

অতএব 'নৈবেদ্য' বচনা এবং শান্তিনিকেতন-বিশ্বভাবতী গঠনেব ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথকে প্রতিক্রিযাশীল মনে কবলে তাঁকে একেবাবেই ভুল বোঝা হবে। দেখতে হবে, তিনি কী চেয়েছেন, তাঁব প্রাচীনানুবাগময কাব্য এবং শান্তিনিকেতনেব যথার্থ স্বরূপ কী। তিনি কি পৌবাণিক এবং প্রাক্-পৌবাণিক জীবনধাবাকে প্রতিষ্ঠিত কবতে চেযেছেন, না, মানবমূল্যহীন আধুনিক যান্ত্রিকতাব এবং উপনিবেশবাদী শিক্ষাব প্রতিবাদে সজীব এবং বেগবান্ প্রাণমনবুদ্ধিকে উৎসাহিত কবতে চেযেছেন। বিশ্বভাবতী এবং শ্রীনিকেতন মিলিযে পূর্ণাঙ্গ মানুষগঠনেব যে পবিকল্পনা তাব সঙ্গে আমাদেব পুবোপুবি মতেব মিল যদি না-ও হয, এব সংগঠনেব মধ্যে যদি কিছু অসংগতি থেকেও থাকে, তবু অভিপ্রাযেব দিক থেকে বিচাব ক'বে একে মৌলিক ভাবে প্রগতিশীল ব'লে মনে কবতেই হয। অবশ্য, আমবা ববীন্দ্রকালেব প্রসঙ্গ বিচাব ক'বেই একথা বলছি, একালেব প্রসঙ্গ নয। গতিশীল জীবন এবং মনেব সঙ্গে বিদ্যাব যোগ, ছাত্রেব চিত্ত ও বুদ্ধিব স্বাধীনতা, প্রকৃতিব অবাবিত সাহচর্যে আনন্দেব সঙ্গে বিদ্যালাভ, যুবোপীয জ্ঞান-বিজ্ঞানেব সঙ্গে প্রাচ্য কলা ও তত্ত্ববিদ্যাব সমন্বয, আন্তর্জাতিক ভাববিনিময, আদর্শ কেন্দ্র ক'বে প্রযোজনেব সঙ্গে এব যথাসাধ্য সামঞ্জস্য— এইসব হ'ল শান্তিনিকেতন বিদ্যালয ও বিশ্বভাবতীব মৌলিকতা এবং ঔপনিবেশিক শিক্ষণ-পদ্ধতি থেকে এব পার্থক্য। সাংসাবিক বিরুদ্ধতা, বাইবেব বাধা এবং দুঃসহ আর্থিক অনটনক্লেশেব মধ্য দিযেই কবিকে এই প্রতিষ্ঠান গ'ডে তুলতে হয়েছে। তাছাডা এও বোঝা কঠিন নয যে পবাধীনতাব মধ্যে একে বক্ষা কবতে গিযে কবিকে কদাচিৎ আত্মপ্রকাশে ও কার্যে অনভিপ্রেত সংযমও বক্ষা কবতে হযেছে। শিক্ষাব ক্ষেত্রে কবিব পবীক্ষামূলক পদক্ষেপেব সময, ব্রহ্মচর্যবিদ্যালযেব রূপে আবির্ভাবকালে, এই বিদ্যাযতন যদিচ প্রাচীনেব অনুগত ছিল (ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায এবং বেবাচাঁদ তাঁকে এই আদর্শে উদ্বোধিত ক'বে থাকতেও পাবেন), কুডি বছবেব মধ্যে এব প্রাচীন কঞ্চুক অপসৃত হযে দেখা দিয়েছে একান্ত নিজস্ব এবং নবীন রূপ। সুতবাং কি কাব্যে কি শান্তিনিকেতনে ববীন্দ্রনাথ উপনিষদেব আদর্শেব তথা সামন্ততান্ত্রিক ধাবাব অনুসবণ কবেছেন এবকম অভিমত শ্রদ্ধেয় নয।

রবীন্দ্রনাথ কেবল শান্তি এবং অহিংসার বাণী প্রচার ক'রে গেছেন, সাধারণ্যে এরকম ভুল ধারণাও যে প্রচলিত না রয়েছে এমন নয়। রবীন্দ্রনাথ যদিচ শান্তং শিবমদ্বৈতমের কথা বলেছেন এবং বুদ্ধির উৎকর্ষে, সৌন্দর্যবোধে এবং সমাজবোধে উদ্দীপ্ত পূর্ণাঙ্গ জীবনের প্রতিষ্ঠায় মঙ্গল নির্দেশ করেছেন, তবু পথ-হিসেবে নির্জলা শান্তিকে দেখেন নি, এবং বাস্তব ও ইতিহাসানুগত দৃষ্টির অধীন ছিলেন ব'লে তা চানও নি। তিনি পুনঃপুনঃ এই ধারণা প্রকাশ করেছেন যে বিরোধ এবং সংগ্রামের মধ্য দিয়েই শান্তং শিবমদ্বৈতম্ লভ্য, বাস্তব দ্বন্দ্বসংঘাতকে, অগ্রগামী জীবনের দুঃসাহসিকতাকে পরিহার ক'রে নয়। তাঁর কাব্য-কবিতায় যদিচ এই ভাবুকতার বিশেষ প্রকাশ (এ বিষয়ে পরে আমরা বিস্তৃত আলোচনা করছি), প্রবন্ধে এবং ভাষণেও নানা স্থানে তিনি স্পষ্টভাবে তাঁর এই উপলব্ধি জানিয়েছেন। সবচেয়ে বড় কথা, রবীন্দ্রনাথ কোনো স্থিতাবস্থাকেই কোনোদিন চরম ব'লে মনে করেন নি। যেমন ব্যক্তি, তেমনি সমাজ ও জাতির পক্ষে গতিশীলতাকেই যথার্থ জীবন এবং সীমালঙ্ঘন ক'রে অসীমের দিকে যাত্রা ব'লে তিনি অভিহিত করেছেন। মধ্যযুগীয় প্রথা এবং শাস্ত্রের বন্ধনে জর্জর, বিবেকহীন জাতিবর্ণবিভাগে শক্তিহীন ভারতবর্ষকে প্রবুদ্ধ করতে চেয়েছেন তিনি পদে পদে। অনেক সময় বৈদেশিক পরাধীনতার চেয়ে স্বাদেশিক পরাধীনতাই তাঁর কাছে বেশী পীড়াদায়ক মনে হয়েছে। তাঁর দৃঢ় ধারণা ছিল যে-দেশ ভুয়ো শাস্ত্র এবং প্রথা তৈরি ক'রে নিজের মানুষকে শৃঙ্খলে আবদ্ধ ক'রে ছোট ক'রে রেখেছে, তার রাষ্ট্রিক স্বাধীনতা পাবার নৈতিক অধিকার নেই। পাশ্চাত্ত্য দেশের বুদ্ধি এবং বিজ্ঞানের জয়যাত্রা এবং সবক্ষেত্রে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও দুঃসাহসিক অভিযানকে তিনি নমস্কার জানিয়েছেন এবং স্বাদেশিক জড়ত্বের জন্য বেদনা বোধ করেছেন। পথের সঞ্চয়, কালান্তর, রাশিয়ার চিঠি প্রভৃতির আলোচনা, এমন কি 'মানুষের ধর্ম'ও এবিষয়ে প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। এই আধুনিক জাতীয়-প্রগতিকে অভিনন্দন জানিয়ে কবি 'জাপানযাত্রী'র এক জায়গায় বলেছেন—

> মানুষের মধ্যে যে-সব মহাজাতি কুলত্যাগিনী তারাই এগচ্ছে, ভয়ের ভিতর থেকে অভয়ে, বিপদের ভিতর দিয়ে সম্পদে। যারা সর্বনাশা কালোর বাঁশি শুনতে পেলে না তারা কেবল পুঁথির নজির জড়ো ক'রে কূল আঁকড়ে বসে রইল, তারা কেবল শাসন মানতেই আছে। তারা কেন বৃথা এই আনন্দলোকে জন্মেছে যেখানে সীমা কাটিয়ে অসীমের সঙ্গে নিত্যলীলাই হচ্ছে জীবনযাত্রা, যেখানে বিধানকে ভাসিয়ে দিতে থাকাই হচ্ছে বিধি।

এরকম উপলব্ধি-অনুসারে তিনি 'বারে বারে নূতন, ফিরে ফিরে নূতন' সৃষ্টির উপাসক হয়েছেন এবং পুরাতনের পথিকদের তীব্রভাবে আক্রমণ করেছেন। শান্তি-

নিকেতনে গান্ধীজি-প্রসঙ্গে কিছু বলতে গিয়ে তিনি রক্ষণশীলদের এইভাবে সমালোচনা করেছেন—

> পূর্বপুরুষের পুনরাবৃত্তি করা মনুষ্যধর্ম নয়। জীবজন্তু তাদের জীর্ণ অভ্যাসের বাসাকে আঁকড়ে থাকে। মানুষ যুগে যুগে নব নব সৃষ্টিতে আত্মপ্রকাশ করে, পুরাতন সংস্কারে কোনোদিন তাকে বেঁধে রাখতে পারে না।

প্রবন্ধে এবং ভাষণে প্রকাশিত কবির এই মনোভাবের পূর্ণ সমর্থন পাওয়া যাবে তাঁর কাব্য-নাটকে প্রায় সর্বত্রই এবং বিশেষ ভাবে বলাকা, গীতালি, মহুয়া, অচলায়তন, ফাল্গুনী, মুক্তধারা, রক্তকরবী, তাসের দেশ প্রভৃতিতে।

পুরাতন এবং নূতন, রক্ষণশীল এবং বিপ্লবী—জীবনধারার এই দুই বিপরীত কোটির মধ্যে ক্রমাগত দ্বন্দ্ব-সংঘাত এবং ক্রমাগত নূতনের জয়—এটি রবীন্দ্র-উপলব্ধির একটি স্থায়ী সম্পদ, যা তিনি আমাদের দান ক'রে গেছেন, এবং তাঁর পূর্বে আর কেউ এমনভাবে আমাদের দিতে পারেন নি। পাশ্চাত্ত্য দার্শনিক হেগেল এবং তাঁর অনুবর্তীরা দুই বিরুদ্ধশক্তির সংঘাত এবং অহরহ নূতনের অভ্যুদয়ের বিষয়টি নানাভাবে বিশ্লেষণ ক'রে যে নূতন জীবনদর্শনের সূত্রপাত করেন, তার সঙ্গে রবীন্দ্র-উপলব্ধির সাদৃশ্য অথচ অধিকতর বাস্তবতা ও গভীরতা লক্ষণীয়। এই বিরোধ বিপ্লবকে ঢাকা দিয়ে সুবিধাবাদী বুর্জোয়া মনোভাবের শান্তিজল রবীন্দ্রনাথ বর্ষণ করেন নি। কবি-হিসাবে তিনি স্বপ্নের ইন্দ্রজাল রচনা করলেও মানুষ, সমাজ এবং জাতির জীবনের বাস্তব তাৎপর্যকে তাঁর কাব্যে আশাতীত মর্যাদা দিয়েছেন। এজন্য তিনি শুধু কবি নন, মহাকবি। রবীন্দ্রনাথ স্বপ্ন এবং শান্তির ললিত বাণী শুনিয়েছেন এমন ধরনের অভিযোগের প্রতিবাদ ক'রে তিনি তাঁর একটি প্রবন্ধে একদা বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে তাঁর সম্বন্ধে এরকম ধারণা যথার্থ দর্শনের পরিচায়ক নয়। ঐ প্রবন্ধেই তিনি এও বুঝিয়ে দিয়েছেন যে দ্বন্দ্ববিরোধহীন তরল অবিমিশ্র শান্তি সৃষ্টির বা মানবজীবনের পক্ষে কল্যাণকর সত্য নয়। তিনি বলছেন—

> সত্যের একটি সুষমা আছে—সেই সুষমা না থাকলে সত্য আপনাকে আপনি ধারণ ক'রে রাখতে পারে না। এ কথাটা যথার্থ। কিন্তু এই সুষমাটা বৈষম্যকে বাদ দিয়ে নয়—বৈষম্যকে গ্রহণ ক'রে এবং অতিক্রম করে—শিব যেমন সমুদ্রমন্থনের সমস্ত বিষকে পান ক'রে তবে শিব। তাই সত্যের প্রতি শ্রদ্ধা করে পৃথিবীটি বস্তুত যেমন, অর্থাৎ নানা অসমান অংশে বিভক্ত, তাকে তেমনি করেই জানবার সাহস থাকা চাই। ছাঁট-দেওয়া সত্য এবং ঘর-গড়া সামঞ্জস্যের প্রতি আমার লোভ নেই। আমার লোভ আরও বেশি, তাই আমি অসামঞ্জস্যকেও ভয় করি নে।…যে শ্রেয়

মানুষেব আত্মাকে দুঃখের পথে দ্বন্দ্বের পথে অভয দিয়ে এগিয়ে নিয়ে চলে সেই শ্রেযকে আশ্রয় কবেই প্রিয়কে পাবাব আকাঙ্ক্ষাটি 'চিত্রা'য় 'এবাব ফিরাও মোরে' কবিতাটিব মধ্যে সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত হযেছে। বাঁশিব সুরেব প্রতি ধিক্কাব দিযেই সে কবিতার আবম্ভ······অনন্ত আকাশে বিশ্বপ্রকৃতিব যে শান্তিময় মাধুর্য-আসনটা পাতা ছিল, সেটাকে হঠাৎ ছিন্নবিচ্ছিন্ন ক'বে বিবোধ-বিক্ষুব্ধ মানবলোকে রুদ্রবেশে কে দেখা দিলে ? এখন থেকে দ্বন্দ্বেব দুঃখ, বিপ্লবেব আলোডন। সেই নূতন বোধেব অভ্যুদয যে কী বকম ঝডেব বেশে দেখা দিযেছিল এই সমযকাব 'বর্ষশেষ' কবিতাব মধ্যে সেই কথাটি আছে · ···তাব পবে আমাব বচনায বাবে বাবে এই ভাবটা প্রকাশ পেযেছে—জীবনে এই দুঃখবিপদ-বিবোধমৃত্যুব বেশে অসীমেব আবির্ভাব।··· খেযাতে 'আগমন' ব'লে যে কবিতা আছে, সে কবিতায যে-মহাবাজ এলেন তিনি কে ? তিনি যে অশান্তি। সবাই বাত্রে দুযাব বন্ধ কবে শান্তিতে ঘুমিযেছিল, কেউ মনে কবে নি তিনি আসবেন। যদিও থেকে থেকে দ্বাবে আঘাত লেগেছিল, যদিও মেঘগর্জনেব মতো ক্ষণে ক্ষণে তাঁব বথচক্রেব ঘর্ঘব ধ্বনি স্বপ্নেব মধ্যেও শোনা গিয়েছিল, তবু কেউ বিশ্বাস কবতে চাচ্ছিল না যে তিনি আসছেন, পাছে তাদেব আবামেব ব্যাঘাত ঘটে। কিন্তু দ্বাব ভেঙে গেল—এলেন বাজা। ·····"

কবিব এই আত্ম-সমীক্ষা প্রথম মহাযুদ্ধকালেব। যদিও তিনি তাঁব যুদ্ধপূর্বকালেব এমন কি বঙ্গভঙ্গ ঘটনাব পূর্বেকাব বচনাতেও তাঁব জীবনসংঘাত-সচেতনতা লক্ষ্য কবেছেন। 'বিচিত্র প্রবন্ধে'ব মধ্যে ১৯০৪ খ্রীস্টাব্দে লেখা 'পাগল' ব'লে দ্বন্দ্ব-সংঘাত-বিবোধমৃত্যু-ববণেব যে উল্লেখযোগ্য কাব্যিক প্রবন্ধটি বয়েছে তাও তিনি এ প্রসঙ্গে আমাদেব লক্ষ্যে এনেছেন। বস্তুতঃ ঐ সময থেকে আবম্ভ ক'বে ববীন্দ্রকাব্যে অশান্তি-বিবোধময বাস্তব জীবনেব দিকে আগ্রহ প্রবল হযে দেখা দিযেছে এবং কবি উত্তবোত্তব দ্বন্দ্ববিক্ষুব্ধ গতিচালিত নবীন জীবনেব খুব বেশি পক্ষাপাতী হযে উঠেছেন। গীতাঞ্জলিব 'অশান্তিব অন্তবে যেথায় শান্তি সুমহান্' এব এবং গীতালিব সকল দ্বন্দ্ববিবোধমাঝে জাগ্রত যে ভালো' থেকে প্রান্তিকেব "শান্তির ললিত বাণী শোনাইবে ব্যর্থ পবিহাস" পর্যন্ত সামাজিক বা বাষ্ট্রিক অন্যায অবিচাবেব বিরুদ্ধে সংগ্রামী আহ্বান জীবন-সত্যে প্রতিষ্ঠিত কবিব কণ্ঠে মুহুর্মুহু উচ্চাবিত হযেছে।

উল্লিখিত বিচাব-বিবেচনা অনুসবণে স্বাভাবিকভাবেই অনুমান করা যাবে যে ববীন্দ্রনাথ ঠিক অহিংসাব পূজাবি ছিলেন না, অন্ততঃ গান্ধীজী যেভাবে অংহিসা-সত্যে আস্থাবান্ ছিলেন সে-ভাবে নয়। ববীন্দ্রনাথ গান্ধীজীব সত্যাগ্রহ এবং নিষ্ক্রিয়

প্রতিবোধের দুঃখদহন তপস্যাকে মর্যাদা দিয়েছেন ঠিকই, কিন্তু ধর্মনীতিব আশ্রয়ে অহিংসাপালনকে পরিহাৰ করেছেন। অমানবিক অন্যায়-আচরণকেই তিনি হিংসা ব'লে মনে কবেছেন, কিন্তু বাহুবলে এব সক্রিয় প্রতিরোধকে তিনি উৎসাহিতই কবেছেন। আত্মতপস্যাব দৃষ্টান্তে গান্ধীজীব এই সবল বিশ্বাস জন্মেছিল যে সমাজেব কোটিপতি ব্যবসায়ী থেকে আবম্ভ ক'বে নিবন্ন ভিক্ষুক পর্যন্ত সকলেই নিঃশেষ সৎ হযে উঠেছে বা শেষ পর্যন্ত হয়ে উঠবে, আব কলেব গুঁতো এবং বুলেটেব মুখে বুক ফুলিযে জীবন দান ক'বে নীতিবলে বলীয়ান্ ভারতবাসী সাম্রাজ্য-বাদীদেব মানসিক পবিবর্তন ঘটাতে সক্ষম হবে। এবকম সংস্কাব তাঁর এতই প্রবল ছিল যে চৌবিচৌবা থেকে আবম্ভ ক'বে আগস্ট আন্দোলন পর্যন্ত তাঁর ধাবণাব পুনঃপুনঃ বিপর্যয অনুভব ক'বেও তিনি নিজমত ও পথ থেকে বিন্দুমাত্র বিচ্যুত হবাব প্রযোজন বোধ কবেন নি। আন্দোলনেব ডাক দিযেই—না, এ বোধ হয় ঠিক হচ্ছে না মনে ক'বে আন্দোলন প্রত্যাহাব কবেও নিযেছেন বাবংবাব এবং এ ব্যাপাবে তাঁব বিশ্বস্ত অনুগামীদেব মতপার্থক্যেব বিষযটি অনুধাবনযোগ্য ব'লেও তিনি মনে কবেন নি। নিজমতে আস্থা তাঁব এতই সুদৃঢ ছিল। ববীন্দ্রনাথ তাঁব সামগ্রিক বাজনীতি-সমাজনীতিক চিন্তায এবকম কোনো স্থিব ও পূর্বনির্দিষ্ট পথেব পথিক ছিলেন না। ধর্মবোধচালিত কঠোব আত্মপ্রত্যয তাঁব ছিল না এবং এ ধাবণাও তিনি পোষণ কবতেন না যে কঠোব ব্যক্তিগত তপস্যা ও আধা-ধর্মীয আধা-বাজনৈতিক আন্দোলনেব ফলে আমবা স্বাধীনতাব যোগ্য হযে স্বাধীনতা অর্জন কবব। কর্মেব মধ্য দিযে দেশেব মাটিব সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও ঘনিষ্ঠ যোগেব ফলে এবং মধ্যযুগীয প্রথা বর্জন ক'বে একমানবতা অর্জনেব দ্বাবা বাস্তব আত্মশক্তিতেই আমবা স্বাধীনতা পাব এমন ধাবণাই ববীন্দ্রনাথ সুচিন্তিত-ভাবে পোষণ কবতেন। নতুবা ইংবেজ চ'লে গেলেও আমাদেব স্বাধীনতা নামে-স্বাধীনতা মাত্র হবে। এ বিষয়ে ববীন্দ্রনাথ গান্ধীজীব চেযে অধিকতব বাস্তব-দৃষ্টি-সম্পন্ন এবং যুক্তিনির্ভব ছিলেন। অনেকে মনে কবেন ববীন্দ্রনাথ উপনিষদীয় অধ্যাত্মবাদী ছিলেন ব'লে গান্ধীজীব অসহযোগ এবং বযকটকে না-ধর্মী সুতবাং গ্রহণেব অযোগ্য মনে কবেছিলেন। একথাও ঠিক নয। 'কালান্তব'এব একটি প্রবন্ধে তিনি অসহযোগ (পবে অবশ্য যথার্থ অসহযোগেব তিনি সমর্থনও কিছুটা জানিয়েছেন) এবং বিলাতি বস্ত্র বর্জনকে না-ধর্মী-আন্দোলন বলেছেন ঠিকই, কিন্তু সে ঐ গঠনমূলক কর্মেব অভাবেব দিক থেকেই, তা তাঁব আলোচনাব স্বরূপ অনুধাবন কবলেই বোঝা যায। চবখা-বিষযে তাঁব দুটি দিক থেকে আপত্তি ছিল। এক, প্রথাপীড়িত দেশে এ আব একটা অন্ধ প্রথাব সৃষ্টি, দুই, মিলে-বোনা বস্ত্রে বহুগুণ অর্থনীতিক সুবিধা। য়ুবোপীয বিজ্ঞাননির্ভব জীবনবাদকে গান্ধীজী অভ্যর্থনা জানাতে পাবেন নি, অথচ ববীন্দ্রনাথ

পুরোপুরি সমর্থন করেছেন, যদিও অমানবীয় যান্ত্রিকতায় তিনি আহত হয়েছেন। পরিণত সমাজবোধে রবীন্দ্রনাথের এই বাস্তব প্রগতিশীলতা লক্ষ্য ক'রে তাঁর পূর্বেকার 'দাও ফিরে সে অরণ্য, লও এ নগর' প্রভৃতি মনোভাবকে রোম্যান্টিক্ পলায়নকামিতা বলতেই হবে।

এই শতাব্দীর প্রারম্ভের দিকে স্বামী বিবেকানন্দ এদেশের শোষিত শূদ্র জনতার যেভাবে প্রবল সপক্ষতা করেছিলেন এবং তাদের মনুষ্যত্বে উন্নয়নের জন্য যে আন্তরিক উদ্যম প্রকাশ করেছিলেন, তা এক হিসেবে রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজীর মধ্যেও ততখানি উচ্ছ্বাস-প্রাবল্যে দেখা যাচ্ছে কি না সন্দেহ। আবার, তিনি প্রথাসিদ্ধ হিন্দুয়ানির বিরোধিতা ক'রে দরিদ্রের উন্নয়নমূলক সেবাকেই একমাত্র ধর্ম ব'লে ঘোষণা করেছিলেন। প্রচলিত আবেদন-নিবেদন-মূলক রাজনীতির সঙ্গে (রবীন্দ্রনাথের মতই) কোনো যোগ রক্ষা করা তিনি অযৌক্তিক ব'লে বিবেচনা করতেন। ফলতঃ পরবর্তী স্বাদেশিকদের এবং রবীন্দ্রনাথের উপরও তিনি কিছুকাল অসামান্য প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। আমাদের ধারণা, ১৮৯৪ খ্রীস্টাব্দের প্রথমের দিকে লেখা রবীন্দ্রনাথের 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতার আকস্মিক বাস্তব জীবনে পথ-পরিবর্তনের উৎসাহ এবং নিপীড়িত মানুষের জন্য বেদনাবোধ স্বামীজীর আমেরিকায় প্রদত্ত বক্তৃতা ও প্রকাশিত পত্রাদির দ্বারাই উদ্বোধিত হয়েছিল। আবার কবির 'স্বদেশ' গ্রন্থের প্রাচীন ভারতের জীবনধারার সমর্থনমূলক প্রবন্ধগুলিও পরোক্ষভাবে স্বামীজীর হিন্দু-সংস্কৃতির গৌরব-কীর্তনদ্বারা উদ্বোধিত হতে পারে। অবশ্য স্বামীজীর স্বপ্নের সমাজতন্ত্রবাদের দ্বারা রবীন্দ্রনাথ একালে প্রভাবিত হননি। লক্ষ্য করতে হবে, তখনকার বিপ্লবী স্বাদেশিকতার সঙ্গে ধর্মাচরণের যোগ স্বল্প ছিল না। শ্রীঅরবিন্দ এবং নিবেদিতা এর পথ দেখিয়েছিলেন। আর নিবেদিতা যে স্বামীজীর ভাবাদর্শেই কায়বাক্‌চিত্ত অর্পণ করেছিলেন এ সকলেরই জানা। কিন্তু তবু এতদূর মানবিক হওয়া সত্ত্বেও স্বামীজী যে পরবর্তী প্রগতিমূলক স্বদেশচিন্তায় স্থান পেলেন না, তার কারণ অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। আমাদের মনে হয়, মুখ্যতঃ স্বামীজীর জীবনবোধ অধ্যাত্মবোধে বিশেষ ভাবে নিহিত ছিল ব'লে এবং ধর্মাচরণের নূতন ব্যাখ্যা দিলেও প্রথা ও সংস্কার সমন্বিত ধর্মাচরণে সম্প্রদায়সহ নিজে নিতান্ত মনোযোগী ছিলেন ব'লে পরবর্তীকালে গুরুসহ তিনিও ধর্মরাজ্যের পথিক ব'লেই জনমানসে চিহ্নিত হয়েছেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত মিশনও কার্যক্রমের দ্বারা ক্রমে তাঁর বৈপ্লবিক জীবনবাদের অপসরণে সহায়তা করেছে হয়ত বা। স্বামীজীর চিন্তায় চারিত্র্যে একটা দ্বান্দ্বিক দ্বিধার পরিচয় তার চিঠিপত্রেও বেশ ফুটে উঠেছে। লক্ষ্য করতে হবে এই সন্ন্যাসী ভাবরাজ্যের সমুচ্চে উঠে ভারতের শূদ্রশ্রেণীর জন্য অশ্রুমোচন করলেও জাতিভেদ এবং অস্পৃশ্যতা-মোচনের কার্যকর দৃষ্টান্ত স্থাপনে

অনাগ্রহী ছিলেন। অথচ পৌরাণিক ও মধ্যযুগীয় হিন্দুসংস্কারের জড় প্রথানুগত্যের রবীন্দ্রনাথ কতই না বিরোধী। স্বাধীনতা নিয়ে আন্দোলনের পূর্বে স্বগৃহে নিম্নশ্রেণীর মানুষকে মুক্তি দেওয়ার জন্যেই রবীন্দ্রনাথ পুনঃপুনঃ আবেদন করেছেন। আমাদের শক্তির এই স্বকৃত অপচয় রবীন্দ্রনাথকে যৌক্তিকভাবেই পীড়া দিয়েছিল। তাই তিনি আমাদের স্বাধীনতাচেষ্টায় এই স্ববিরোধের ব্যাপারটি দেখিয়ে আমাদের চৈতন্যের উদ্বোধ ঘটাতে চেষ্টা করেছিলেন।

স্বামীজীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের এইখানে সুবৃহৎ পার্থক্য। রবীন্দ্রনাথ ধর্মতন্ত্রহীন উদার হিন্দুধর্ম বা মানবধর্মের উদ্‌গাতা। স্বামীজী ধর্মতন্ত্রকে পরিত্যাগ করতে চাননি। তাঁর ধারণা এই ছিল যে শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে সন্ন্যাসের আদর্শ পরিব্যাপ্ত হ'লে সমাজের এসব ত্রুটি আপনা থেকেই চলে যাবে। প্রথমে জাতিভেদ অস্পৃশ্যতা প্রভৃতি সামাজিক কুসংস্কার নিয়ে যুদ্ধে নামলে ঝঞ্ঝাটের সৃষ্টি হবে, আদর্শ বিস্তারে বাধা পড়বে। স্বামীজী শূদ্রজাতির অভ্যুত্থানে আশাতীতভাবে আগ্রহী হলেও এবং অশিক্ষা ও দারিদ্র্যমোচনে যত্নবান্ হলেও বিষয়টিকে আধুনিক রাষ্ট্রনীতি ও সমাজনীতির দিক দিয়ে বিবেচনা করেন নি। তিনি ত্যাগীর সেবাধর্মের উপরেই এবিষয়ে সমস্ত দায়িত্ব অর্পণ করতে চেয়েছিলেন। অথচ রবীন্দ্রনাথ রাষ্ট্র ও সমাজের বিরুদ্ধে সংগ্রামের আহ্বান জানিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ কাব্যে কবি হয়েও সমাজচিন্তায় বাস্তববাদী, আর বিবেকানন্দ স্বভাবে যোগী এবং সন্ন্যাসী হয়ে বাস্তবকেও আদর্শায়িত করতে চেয়েছিলেন। ত্যাগ এবং সেবার আদর্শ প্রচারিত হ'লে নরনারায়ণবোধও সাধারণ্যে অনায়াসে প্রতিষ্ঠিত হবে এই ছিল তাঁর উচ্চাশা এবং এইভাবে হয়ত তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের ঈশ্বর-ভক্তির সঙ্গে আধুনিক মানবতাবাদের একটা সমন্বয়ও করতে চেয়েছিলেন। রবীন্দ্রপক্ষে বিশেষত্ব হ'ল তিনি সমাজ-সংস্কারকে ধর্মীয় বা দার্শনিক কোনো ব্যাপারের সঙ্গে যুক্ত করতে চান নি। কাব্য-কবিতায় তিনি মানুষ-সত্যতার সঙ্গে ভাব ও কল্পনার সংস্পর্শ যদি বা রক্ষা করেছেন, প্রবন্ধে ও চিন্তায় ভাবলেশ পরিহার করারই প্রয়াস করেছেন। স্বপক্ষ স্থাপন করার জন্য তিনি কদাচিৎ উপনিষদ্ আহরণ করলেও তা দিয়ে নিজ বক্তব্যেরই সমর্থন করতে চেয়েছেন। আর তাঁর এই সব প্রবন্ধের স্টাইলে কাব্যগুণ বা আলংকারিকতা থাকলেও যুক্তির সমাবেশই প্রধানভাবে লক্ষণীয়। অথচ স্বামীজীর বক্তব্যে আলংকারিকতা নাই থাক, ভাবপ্রাধান্য যথেষ্ট। আমাদের আরও মনে হয়, ১৯৩০-এর পর থেকে স্বামীজীর ধর্মনৈতিক স্বাদেশিকতার প্রভাব যে তরুণদের চিত্তে ক্রমশঃ ক্ষীণ হয়ে এল তার বহিরঙ্গ একটা কারণ, তাঁর আমেরিকার মত ধনসাম্রাজ্যিক রাষ্ট্রের অধীন ধনিক-সহায়তা-প্রাপ্তি। স্বামীজীর স্বাদেশিকতার মধ্যে নিঃসন্দেহে কোনো খাদ ছিল না, তিনি স্বদেশে তাঁর অভিলষিত শিক্ষাবিস্তার এবং

দরিদ্র অনুন্নতের জাগরণের জন্যেই বৈদেশিক সাহায্যের প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে এব সঙ্গে পবিবর্তনশীল দেশাত্মবোধক চিন্তাধারার তেমন সামঞ্জস্য বইল না। তা ছাড়া সকলে দেখলে তাঁব প্রতিষ্ঠিত মিশন দরিদ্রনারায়ণেব বাস্তব সাহচর্য থেকে এবং তাঁব অভীপ্সিত শূদ্রবাজকতা থেকে দূবে সবে গেছে। স্বামীজীব সংস্কার-প্রয়াস প্রচলিত হিন্দুযানিব সঙ্গে দৃঢভাবে সংসক্ত হওয়ায় মুসলমানেবা এই স্বাদেশিকতাব বাইবেই থেকে গেলেন। অথচ ববীন্দ্রনাথেব সমাজ-সচেতনতায় কোনো ধর্মীয পক্ষ না থাকায, আবাব, হিন্দুয়ানিব তীব্র বিবোধিতা এবং উদার মানবীয়তার জন্য নানান্ ক্ষেত্রে তাঁর মুসলিম-সপক্ষতা থাকায 'বর্তমান ভাবতে'ব মত স্মবণীয ভাব-দর্শনেব অধিকাবী হযেও প্রগতিমূলক স্বাদেশিক চিন্তায স্বামীজীব পূর্ণাঙ্গ স্থান রইল না, অথচ ববীন্দ্রনাথ কালজযী হযে থাকলেন।

ভাবতবর্ষ হিন্দুব মত মুসলমানেবও স্বদেশ এ বোধ জাগতে স্বাদেশিকদের বেশ কিছু বিলম্ব হয়ে গেছে। ইংবেজেব দেওযা আঘাতে এবং একপেশে মুসলিম-লীগের অভ্যুদয়ে চৈতন্যের উদয যখন হ'ল তখন মনেব মিল ঘটতে বিলম্ব হযে গেছে। মহাত্মাজী খিলাফৎ আন্দোলনেব উপব নির্ভব ক'বে অসাধ্য সাধন কবতে চেষ্টা করে-ছিলেন এবং সামযিক ভাবে হযত সফলও হযেছিলেন। কিন্তু তাব পব থেকে যে বিভেদেব সৃষ্টি হ'ল তা একেবাবে বাস্তব এবং স্পষ্ট, দুইজাতিতত্ত্বে এবং বাষ্ট্রবিভাগে তাব সমাপ্তি। সম্প্রতি বাঙালি মুসলমান ভ্রাতাবা অসহ নির্যাতনেব মধ্যে দিযে বক্তেব মূল্যে এব খানিকটা প্রায়শ্চিত্ত কবলেন, কিন্তু ভেবে দেখতে হবে, বাষ্ট্রচেতনাব এবং জীবনেব নব মূল্যবোধেব উত্তবোত্তব অভ্যুদয-হেতু সাম্প্রদাযিক পার্থক্যেব ভাবনা নিতান্ত মন্দীভূত হওয়াব ফলেই এটি ঘটেছে। সন্দেহ নেই পশ্চিমা মুসলমানদের উগ্র সাম্প্রদাযিক মনোভাবই স্বাদেশিকতার কালে দুই সম্প্রদাযেব প্রত্যাশিত মিলনের প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়িযেছিল, তবু এও সত্য যে হিন্দুধর্মের দার্শনিক উদাবতাব সঙ্গে নিতান্ত অন্ধ প্রথা আচাব-সর্বস্বতা মিশ্রিত ছিল ব'লেই মুসমলমানকে মানবীয়তাব দিক থেকে আপন ব'লে হিন্দুব অনুভব না কবতে পাবা ঐ পঙ্কিলতাকে আবও ঘোলা ক'বে তুলেছিল। রবীন্দ্রনাথ ঠিকই ধবেছিলেন যে একদিকে ধর্মেব গোঁড়ামি অন্যদিকে অন্ধ কুসংস্কার এই দুইয়ে মিলে বাধা অলংঘনীয় ক'বে তুলেছে। তিনি এই বিষবৃক্ষেব গোড়া ঘেঁসে কোপ বসাতে চেযেছিলেন গ্রামসংগঠনের বিধান দিয়ে। এতে হিন্দুর মধ্যেকাব উচ্চবর্ণ-নিম্নবর্ণ পার্থক্যও শিথিল হযে পড়ত এবং কম্যুন্যাল এওআর্ডেব বিভেদ-প্রয়াসও আপনা থেকেই খর্ব হয়ে পডত। বস্তুতঃ দূরদর্শী রবীন্দ্রনাথ তাঁব স্বদেশী-সমাজের দ্বিমুখী আঘাতে যেমন বিদেশি শাসনকে নিষ্ক্রিয় ক'রে তুলতে চেয়েছিলেন, তেমনি নিজ-সমাজের স্বার্থ ও ভেদবুদ্ধি চূর্ণ কবতে চেযেছিলেন। সাধনার বন্ধুব পথ ছেড়ে কর্মহীন

আন্দোলনের সহজ রাস্তা ধরায় আমাদের হাল কী হচ্ছে তাব প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত এ সমাজের ভুক্তভোগী আমরাই। আজ বেদনাব সঙ্গে আমাদেরই স্বীকাব কবতে হচ্ছে যে দেশগঠনেব উপযোগী জাতীয় চরিত্র আমাদেব সংগঠিত হয়নি।

রবীন্দ্র-আদর্শে সাম্প্রদায়িক ধর্মবোধের অভাব, চিব-নূতনেব উপাসনা, সামন্ত-তান্ত্রিক ও পৌবাণিক প্রথাব তীব্র বিরোধিতা, জাতীয়তাব সঙ্গে মানবিকতাব সংমিশ্রণ, ব্যক্তি-স্বাধীনতা থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তবণ প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য তাঁকে বিশ শতকেব প্রগতিভাবুক মনীষীদেব পুরোবর্তী ক'রে তুলেছে। অবশ্য তিনি জড়বাদী ছিলেন না, ভাবজীবনকেই যথাযথ মর্যাদা দিয়েছেন, কিন্তু এজন্য বস্তুজীবনেব মূল্যকে তিনি লঘু ক'বে দেখেন নি। যেখানে দারিদ্র্যে অনাহাবে অশিক্ষায মানুষেব জীবনেই সংশয়, যেখানে অসহায মনুষ্যত্ব ক্ষীণ কণ্ঠে নিষ্ফল বিলাপ কবছে, সেখানে প্রতিষ্ঠিত নীতিকে ঘৃণা ক'রে তিনি সংগ্রামেবই আহ্বান জানিযেছেন। এইখানেই স্বামী বিবেকানন্দেব সঙ্গে তাঁব সাধাবণভাবে মিল এবং জড়বাদনির্ভব সাম্যবাদধর্মী মানবিকতাব সঙ্গেও। জড়বাদ ভাববাদেব মূলে যে পার্থক্যই থাক, ব্যাবহাবিক মানবিকতাব ক্ষেত্রে পার্থক্য সামান্যই। অবশ্য বিকৃত ভাষ্য বচনা ক'বে ভাববাদকে মানবীযতাব পবিপন্থী ক'বে তোলা যেমন সহজ, তেমন জড়বাদকে নয। তা ছাড়া ভাববাদে জীবনসংগ্রামেব আত্যন্তিকতাব বিষয যথার্থই অবহেলিত হযেছে। অথচ 'ত্যাগেব দ্বাবাই ভোগ কববে' এমন নীতি-কথা যেমন জড়বাদমূলক সমাজবাদেব, তেমনি ভাববাদেবও। ববীন্দ্রনাথ নিরবচ্ছিন্ন শ্রেণীসংগ্রামে আস্থাশীল নন, অথচ আধুনিক সমাজ-জীবনে ধনতান্ত্রিক গোষ্ঠীব শোষণ-সম্পর্কে তিনি যে যথেষ্ট সচেতন তাব অ-কাল্পনিক স্পষ্ট প্রমাণ বযেছে তাঁব জীবনের শেষ দুই দশকেব ভাষণগুলিতে। মুনাফাখোব কাবখানা-মালিকদেব বিষযে তাঁব বিক্ষোভ আবও পূর্বেকাব। একথা ঠিক যে পণ্যেব উৎপাদন-কর্তৃত্বেব জাতীযকবণ-বিষয়ে ও ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তির অধিকাব-বিলোপ নিযে কবিকে সুসমঞ্জস কোনো অভিমত প্রকাশ কবতে দেখা যায না। ববং কোনো কোনো ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত অধিকারকে মেনে নেওযাব দিকেই তাঁব প্রবণতা লক্ষ্য কবা যায় এবং জমিদাবি-প্রথা-বক্ষণেব দিকেই তাঁব ঝোঁক বেশি তাঁর সম্পর্কে এমন মন্তব্যও অসমীচীন হবে না, তবু সেক্ষেত্রেও স্বদেশের এবং সেকালেব বিশিষ্ট পবিস্থিতিব দিক বিবেচনা ক'রেই কবিব কঠোব সমালোচনা থেকে নিবৃত্ত হতে হবে। মনে বাখতে হবে যুদ্ধোত্তর পবাধীন ভারতবর্ষ অল্পস্বল্প কল-কারখানার মুখ দেখতে থাকলেও কৃষি এবং কৃষিজীবনই তখনকাব সমাজ-চিন্তাব মুখ্য বিষয়, শ্রমিকসমস্যা নয়। চিবাচবিত সামন্ততান্ত্রিকতার সংস্কাবে অবলুপ্ত নিষ্প্রাণ কৃষকদের সম্পর্কে কবিব সমবেদনা এবং পথনির্দেশ বিখ্যাত এবং কালোপযোগীও বটে। বিদেশী শাসনেব অধীনে স্বদেশে অন্ততঃ এতটা চিন্তা

এবং কর্মেব উদ্যোগ আর কারুবই ছিল না। আপাততঃ জমিদারি-ব্যবস্থা সংরক্ষণ-বিষযে তাঁব অভিমতকেও এই বিশিষ্ট পরিস্থিতির দিক দিযে বিচার ক'রে দেখতে হবে। রবীন্দ্রনাথ কার্যতঃ এবং সর্বতোভাবে সামন্ততন্ত্রেবই শ্রেণীভুক্ত ছিলেন এমন কথা অশ্রদ্ধেয হবে, যেমন হবে তাঁর সম্বন্ধে এবকম মন্তব্য যে তাঁব জাতীযতাবোধ বিশ্বপ্রেমে সমাচ্ছন্ন হযে পডেছিল। কবিচিত্তে কল্পনাধর্মী প্রাচ্য জাতীযতাবোধেব প্রথম উচ্ছ্বাসেব পরই প্রতীচ্য জীবনধর্মেব দিকে পক্ষপাত ('পথেব সঞ্চয়' দ্রষ্টব্য) একটি লক্ষণীয ঘটনা। এখন থেকে জাতীয সংকীর্ণতাব বিরুদ্ধে সংগ্রাম এবং দুঃসাহসিক জীবনববণের উৎসাহ, যুরোপেব মনীষাব সঙ্গে সহানুভূতিমূলক পবিচযে পূর্ব-পশ্চিমেব ভাবসম্মিলন কামনা।

ববীন্দ্রনাথ কোনো বিষযেই কোনো দৃঢ প্রত্যয বা পূর্বসংস্কাব নিযে জীবন আবম্ভ কবেন নি। আশাতীত মুক্ত মনেব অধিকাবী হযে কালে কালে কল্পনা ও অভিজ্ঞতায যা সঞ্চয় কবেছিলেন, স্বাধীন বুদ্ধি নিযে বিচাব ক'বে যা বুঝেছিলেন, তাবই অধিকাব আমাদেব দিয়ে গেছেন। এই বুদ্ধিব মুক্তিব দিক থেকে তাঁব উপব যদি কাবো প্রভাব পড়ে থাকে, তা বামমোহনেব, কিছুটা বিদ্যাসাগবেবও হওযা সম্ভব। তাঁব লেখায পূর্বাপব মিলিযে যদি কোনো অসংগতি চোখে পড়ে, তাহলে সেই অসংগতিকেই বড ক'রে না দেখে কোন্ সিদ্ধান্ত তাঁব অভিপ্রেত তা তাঁব বিশেষ স্বভাব এবং পবিবর্তন-শীল মানসিকতা মিলিযে ধবতে হবে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাঁর স্থান-কাল-পবিবেশেব অধীনতাব বিষযটিও বিবেচনা ক'বে দেখতে হবে।

প্রথম অধ্যায়

চিন্তা-কর্ম-কল্পনা

॥ মুখ্য ঘটনা ও রবীন্দ্রচিত্তধর্ম ॥

কাব্য-রচনায রবীন্দ্রনাথ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সামযিকতাব অনুগামী নন, কেবল সমাজচিন্তায মুখ্যতঃ ঘটনাপ্রবাহেব অনুবর্তী। কল্পনামূলক রচনায় তিনি সাময়িক দাবি তেমন পূবণ কবেন নি, কবেছেন বৃহৎ কালেব ও কালবাহিত ঐতিহ্য-সংস্কাবের। তবু রবীন্দ্রনাথ অভিনব, অভিনবতাব পূজাবী এবং সম্পূর্ণ মৌলিক, কি কল্পনায় কি মননে। তাঁব মননময় বহির্মুখ সিদ্ধান্তগুলিতে তিনি কী পবিমাণ স্বকীয় তা তাঁর সমকালীন সমাজ বা স্বদেশ বিষযে চিন্তানায়কদেব সঙ্গে তুলনায বোঝা যায়। মোটামুটি হিসেব ধরলে বলা যায, বামমোহন ও বিবেকানন্দেব সঙ্গে তাঁব যে পরিমাণ ভাবসাযুজ্য, মহাত্মা গান্ধীব সঙ্গে সে পবিমাণ নয। আবাব পঞ্চাশোত্তব জীবনে তিনি প্রতিষ্ঠিত ও প্রচলিত প্রায কোনো কিছুবই অনুবর্তী নন। তখন থেকে তিনি এত দ্রুতগতি নবীন যে তাঁব নাগাল পাওযাব সাধ্য কোনো বুদ্ধিজীবী স্বাদেশিকেবই ছিল না।

রবীন্দ্রনাথ কৈশোবে তাঁব পাবিবাবিক পবিবেশেব বশীভূত ছিলেন। সে পবিবেশ শাস্ত্র ও প্রথাব সংস্কাব থেকে মুক্ত উন্নত মধ্যবিত্তেব জীবনাচরণেব পবিবেশ। সুবৃহৎ পবিবাবেব মধ্যেকাব নাবীপুরুষেব স্নেহপ্রীতিসখ্যপূজার রম্য সম্পর্ক, নানান্ পাল-পার্বণ, কিছুটা ধর্মীয় এবং বিশেষভাবে সাহিত্যিক আবহাওযা। প্রথম-যৌবনেব বিলাত-যাত্রায নোতুন জীবনেব সঙ্গে পবিচয় ঘটলেও তা তাঁব প্রতিষ্ঠিত মধ্যবিত্ত পাবিবাবিক সংস্কাবেব মধ্যে কোনো বিভ্রাট ঘটাতে পাবে নি। মাত্র তাঁব গীতধর্ম ও গীতিকাব্যিকতাকে স্বল্প প্রসাবিত ও প্রবৃদ্ধ কবেছিল। দ্বিতীয বাবের সংক্ষিপ্ত বিলাত ভ্রমণে যুবোপীয জীবনেব উপব বীতবাগেব ভাবই প্রবল। কিন্তু তাঁর জীবন-দৃষ্টিব এবং সেইসঙ্গে কাব্যকল্পনাতেও প্রকৃত পবিবর্তনেব সঞ্চাব হ'ল জমিদাবি দেখা-শুনাব জন্য শিলাইদহে গমনেব পব। শিলাইদহ, শাজাদপুব, পতিসব, কুষ্টিয়া, পাবনা-নাটোব-বাজসাহী মিলিযে যে মধ্য-উত্তববঙ্গ, তাব নিসর্গ এবং গ্রামীণ মানুষেব জীবন-ধাবাব সঙ্গে প্রায় একাত্ম হযে তিনি কাটিয়েছিলেন কুড়ি-পঁচিশ বছব। এই সময়েই তাঁব মাটিব সঙ্গে নিবিড় পবিচয় এবং এর প্রভাব তাঁব জীবনের শেষ পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল। লক্ষণীয় এই যে, নাগবিক জীবন এবং পারিবাবিক জমিদারতান্ত্রিক পবিবেশের সংস্কাব তিনি অতি সহজেই অতিক্রম করতে পেবেছিলেন, কেবল ত্যাগ কবতে পাবেন নি বোধ হয তাঁর আজন্ম সঙ্গী একটি উদাব সহজ ধর্মীয় মনোভাব, যা হযত তাঁব পিতাব

সাহচর্যে কিছুটা প্রবৃদ্ধ হয়েছিল এবং যে পিতৃঋণ তিনি সাধ্যমত পবিশোধ করার প্রযাস কবেছিলেন শান্তিনিকেতন উপাসনা-মন্দিবে ধর্মপ্রবক্তাব আসন গ্রহণ ক'বে এবং উপনিষদ্-ভাষ্য লিখে। অবশ্য এক্ষেত্রেও তাঁব সহজাত এবং

১৮৮২-১৯১০ মৌলিক ধর্মবোধেব প্রেরণা ছিল বলতে হবে, কাবণ, ঈশ্বব, সৃষ্টি, মানুষ, দেশকাল প্রভৃতি বিষযে তিনি যা যা বলেছেন তাতে তাঁব নিজ ধাবণাব ধাবাই লক্ষণীয় হয়েছে। তাঁব কৈশোব জীবনে যে দুটি বিষয় তাঁব মনকে যথার্থ ই আকর্ষণ ও খানিকটা নিযমিত কবেছিল তা হ'ল ঠাকুব-পবিবাবেব সাহিত্যিক-আবহাওযা এবং স্বাদেশিকতায অনুবাগ ও 'হিন্দুমেলা'ব অনুষ্ঠান। পৌরাণিক-সংস্কাব-শূন্য উদাব মুক্ত মানসিকতা এবং মানবীয সামাজিক সম্পর্ক-বক্ষাব ধাবাও ববীন্দ্রনাথেব বুদ্ধিমনেব একটা বিশেষ গঠন গ'ড়ে তুলতে সাহায্য কবেছিল এমন ধাবণাও স্বচ্ছন্দে কবা যেতে পাবে। ভাবত-সাম্রাজ্যে তখন প্রখ্যাত ভিক্টোবীয যুগ অর্থাৎ আশা ও কল্পনা নিযে ভাবতেব শিক্ষিত ও পদস্থ ব্যক্তিদেব বৈদেশিক অধিকাবেব কাছে পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ। এদিকে শিক্ষিত ভাবতীযদেব তুষ্ট কববাব জন্যে ব্রিটিশবাজেব যেমন কিছুটা প্রশাসনিক উদাবনীতিব আশ্বাস, তেমনি চীন ও আফ্রিকায ভিন্নভাবে উপনিবেশ-সম্প্রসাবণ। এব মধ্যে বাঙ্‌লায 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকাব সঙ্গে বঙ্কিমেব জাতীযতা ও সমাজ-সমালোচনাব দীপ্তি এবং স্বল্প পবেই ঠাকুব-পবিবাব থেকে 'ভাবতী' পত্রিকাব প্রকাশে সাহিত্যেব সঙ্গে যুবোপীয ও দেশীয জীবনধাবাব আলোচনা আবম্ভ। ববীন্দ্রনাথেব স্বদেশচিন্তাব উদ্বোধনেব এবং দেশ ও সমাজ সম্পর্কে সচেতনতাব কিছু পবিচয একালেব লেখাগুলি বহন কবে। ইলবার্ট বিল নিযে প্রতি-আন্দোলন, সুবেন্দ্রনাথেব ইণ্ডিযান ন্যাশ্‌নাল কনফাবেন্স, ন্যাশ্‌নাল ফাণ্ড্ গঠন, সিভিল সার্ভিসে প্রবেশেব বযস নিযে ও ভার্নাকুলাব প্রেস আইন প্রভৃতি নিযে আন্দোলন, ১৮৮৫তে কংগ্রেসেব প্রতিষ্ঠা ও আইনসভাব সম্প্রসাবণ নিযে আবেদন-নিবেদন—এই সব তখনকাব ঘটনা এবং এই নিযে ববীন্দ্রনাথেব সময সময আলোচনা। কিন্তু ববীন্দ্রনাথেব অন্তর্দৃষ্টি-সহকাবে বাজনীতি ও সমাজনীতি বিষযে পর্যালোচনা ১৮৯০-৯১-এব আগে তেমন দেখা যায না। বস্তুতঃ ১৮৯১এ প্রকাশিত 'সাধনা' পত্রিকাতেই তাঁব স্বদেশ বিষয়ে মৌল চিন্তাব প্রকাশ ঘটতে দেখা যায। এখন থেকে ১৯১০-১১ পর্যন্ত ইংরেজেব বাজনীতি, উপনিবেশবাদ ও ভাবতেব প্রাচীন ও আধুনিক সমাজ-আদর্শ নিযে রবীন্দ্রনাথকে বিশেষভাবে আগ্রহশীল থাকতে দেখা যায। এই সমযেব মধ্যে শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মবিদ্যালয-স্থাপন, এই সময়েই বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলন, ববীন্দ্রনাথেব বাজনীতিক আন্দোলনে যোগদান ও প্রত্যাবর্তন, এই সময়েই তাঁব বিখ্যাত 'স্বদেশী সমাজ'-এব পবিকল্পনা গ্রহণ ও প্রচাব। হিন্দু-মুসলিম বিরোধ নিয়ে কবিব নবচৈতন্য

এবং প্রগতি-চিন্তাও এই প্রথম পর্বেব অন্যতম বৈশিষ্ট্য। রবীন্দ্রনাথের অবিমিশ্র স্বদেশিয়ানার এই অধ্যাযটিকে আমরা প্রথম পর্ব ব'লে ধবেছি।

কবিব অন্তর্লোকে ১৯১০ খ্রীঃ থেকেই নিজ পূর্বস্বভাবেব পরিবর্তন লক্ষ্য কবা যায। এখন তিনি আব প্রাচীনেব অন্ধ সমর্থক নন, সংকীর্ণ হিন্দুধর্মের তীব্র সমালোচক, অবহেলিত অপাঙ্‌ক্তেয মানুষেব পক্ষপাতী এবং যুবোপীয জীবনের প্রগতিশীলতাব সমর্থক। ১৯১২ খ্রীঃ বিলাতযাত্রায C F. Andrews-এর সঙ্গে ও বের্গসঁ'ব মতেব সঙ্গে তাঁব পবিচয, এবং ইংল্যাণ্ডেব মনীষীদের সঙ্গে ভাবের আদান-প্রদান, আবাব ১৯২০-২১ এ বোমাঁ রোলাঁ প্রমুখ যুবোপীয মানবতাবাদী ও প্রগতিবাদী মনীষীদের সঙ্গে পবিচয। এব মধ্যবর্তী সমযে প্রথম মহাযুদ্ধ ও ববীন্দ্রচিত্তেব বিশেষ পবিবর্তন, এই সময থেকেই সবুজপত্রেব মধ্যস্থতায কবিব প্রগতিমুখী মনেব প্রকাশ, কবিতা প্রবন্ধে। এই সমযেই মধ্য উত্তব-বঙ্গে নিজ আদর্শ অনুযাযী কৃষি ও কৃষকেব সংগঠনে অধিকতব আত্মনিযোগ। এবই মধ্যে জালিযানওযালাব হত্যাকাণ্ড, রবীন্দ্রনাথেব উপাধিত্যাগ, অসহযোগ আন্দোলন ও তাঁব তীব্র সমালোচনা, আবাব এই সমযেই যেমন দেশীয অমানবিকতাব, তেমনি যুবোপীয বাষ্ট্রস্বার্থ ও
১৯১০-২৫ ধনতান্ত্রিকতাব বিরুদ্ধে ভাষণ ও সাহিত্যিক বচনা। আবাব একালেই তাঁব নূতন শিক্ষাদর্শেব বিশ্বভাবতী-প্রতিষ্ঠা এবং শ্রীনিকেতনেব পল্লী-সংগঠনেব প্রাবম্ভ। ১৯১০ থেকে মোটামুটি ১৯২৪-২৫ পর্যন্ত ব্যাপ্ত ওই কালটিকে আমবা ববীন্দ্রনাথেব প্রগতিমূলক সমাজচিন্তাব দ্বিতীয পর্ব ব'লে চিহ্নিত কবছি। এই পর্বেব মধ্যেই যদ্যপি রুশ-বিপ্লব ও বিশ্বে পূর্ণাঙ্গ সমাজতান্ত্রিক বাষ্ট্রেব আদর্শ প্রতিষ্ঠাব উদ্‌যোগ, তবু পবাধীন দেশে এ বিষযে প্রচাবের অসুবিধায ববীন্দ্রচিত্তেও কোনো অভিঘাতেব চিহ্ন নেই। তবু ববীন্দ্রনাথ স্বকীয চিন্তা ও উদ্‌যোগে এদেশেব সামন্ত-তান্ত্রিক সমাজব্যবস্থাব বিরুদ্ধে এবং গ্রাম-সংগঠনে যে পবিবর্তনেব আয়োজন করেছিলেন তা সোভিয়েট কার্যপ্রণালীব সগোত্র। বিভিন্ন কাবণে এই পর্বটিই তাঁব স্বাদেশিকতার দিক দিযে সব চেযে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

কবি ও প্রগতিবাদীব চিত্তে তৃতীয পবিবর্তনেব পবিচয় পাওয়া যাচ্ছে তাঁব রাশিযা পবিদর্শনেব কিছু আগে থেকেই। একালেব সবচেয়ে বড লক্ষণ ভারতে শিল্পপ্রসাব ও ধনতান্ত্রিকতাব প্রারম্ভ এবং ববীন্দ্রচিত্তে এব প্রতিক্রিযা, কি অসহযোগ বা সহযোগেব মধ্য দিয়ে অসহযোগ, কি আইন-অমান্য—যাবতীয স্বদেশী আন্দোলনেব প্রতি ঔদাসীন্য। যদিও সব সময়েই ইংবেজের দমননীতি ও অবিচাবেব সমভাবেই প্রতিবাদেব আগ্রহ এবং নূতন রীতিতে গ্রাম-সংগঠনের উদ্‌যোগ। রাশিযা পরিদর্শনেব পূর্ব থেকেই ববীন্দ্রনাথ বৈজ্ঞানিকভাবে স্বদেশ ও সমাজ চিন্তায় আত্মনিযোগ কবেছেন।

শ্রীনিকেতনে পল্লী-উন্নয়ন-পবিকল্পনা পাকাপাকিভাবে ঠিক হওয়াব পব থেকেই তিনি সমবায়নীতি, যৌথ খামাব, কৃষিতে যন্ত্রের ব্যবহাব প্রভৃতির উপর জোব দিচ্ছেন, এব সঙ্গে অশিক্ষা-দূরীকবণের ব্যাপাব তো আছেই। কলকারখানায় মুনাফা-লোভী মালিকদের শ্রমিক-শোষণের বিষয়ে তিনি পূর্বেই সচেতন। রুশ বিপ্লবেব বারো তেরো বৎসব পবে গিযে তিনি বিস্ময়-সহকাবে লক্ষ্য করলেন শ্রীনিকেতনে স্বকীয় উদ্যোগে তিনি যা করছেন কার্যতঃ সেখানে তাবই 'বিস্তৃত দেশজোড়া প্রকাশ'। সঙ্গে সঙ্গে হতভাগ্য স্বদেশের কথাই তাঁর মনে পড়েছে। বলশেভিকেবা গ্রাম থেকে শহর পর্যন্ত আপামব সাধাবণেব সর্বাঙ্গীন উন্নতি বিধানের জন্য যে নোতুন রাষ্ট্রতত্ত্ব বা সমাজতত্ত্বেব আশ্রয গ্রহণ কবেছিলেন তাব পরিমাপ কবাব প্রয়োজন কবি বোধ কবেন নি, কাবণ, ফলেই তত্ত্বেব সার্থকতার পবিচয়। রাশিয়া ভ্রমণেব পবে অবশ্য তিনি দলবিশেষেব একচ্ছত্র আধিপত্য, ব্যক্তিক সম্পত্তিব সম্পূর্ণ বিলোপ প্রভৃতি সম্পর্কে দু' একটি চিঠিতে ভিন্নমত পোষণ কবেছেন*, কিন্তু সোভিয়েটদেব দেশগঠন-বিষযে যে উচ্ছ্বসিত বিস্ময ও আস্থামূলক সমর্থন তিনি জানিযেছেন, তাব কাছে তাত্ত্বিক পার্থক্য মূল্যহীন হযে পড়েছে। যাই হোক, সোভিযেট সম্পর্কে ক্বচিৎ তাঁব বিরুদ্ধ অভিমতেব ক্ষেত্রে দেশকাল-পবিবেশেব কথাও চিন্তা কবতে হবে। বিশেষতঃ বলশেভিক কার্যক্রম-সম্পর্কে কবিব উচ্ছ্বসিত আগ্রহে ভীতিপ্রবণ ধনতন্ত্রবাদী বিদেশী শাসকদেব ও তদনুগত ভাবতীযদেব যখন সন্দেহ উদ্রিক্ত হওযাবই কথা। ববীন্দ্রনাথ যে এবিষযে সতর্ক হয়ে পড়েছিলেন তাব অন্য প্রমাণও বযেছে। কিন্তু শ্রেণীস্বার্থপবাযণ শোষক এবং শোষিতেব মধ্যেকাব অনিবার্য সংগ্রামেব বিষযে কবি কতদূব সচেতন হযে পড়েছেন তাব পরিচয পাওয়া যায তাঁব সমবায়-সম্বন্ধে লিখিত ও শ্রীনিকেতনেব বাৎসবিক উৎসবে প্রদত্ত কয়েকটি ভাষণ থেকে। ববীন্দ্রজীবনেব পবিণত এই অধ্যাযটিব মধ্যে সাধাবণ মানুষের জন্য তাঁব অন্তর্বেদনা সাহিত্যেও পুনঃপুনঃ রূপ নিযেছে। বহু পূর্বেকাব জীবনে বচিত 'এবাব ফিবাও মোবে' থেকে পার্থক্য এই যে, এখনকাব বক্তব্য এবং প্রকাশ অনুচ্ছ্বসিত, যেন সত্যের উপলব্ধিতে সহজ এবং আন্তরিকতাগুণে স্বচ্ছ। শুধু গ্রামীণ কৃষক নয়, নাগরিক জীবনেব অবশেষপাত্র শ্রমিকেবাও তাঁর সার্থক মূল্যাযন ও সহানুভূতির সৌভাগ্য লাভ কবেছে। ববীন্দ্রনাথ পূর্বপ্রতিষ্ঠিত কোনো তত্ত্ব বা মতবাদের ভিত্তিতে এদেশের অবস্থা বিচাব কবেন নি। পূর্বেকাব ব্রিটিশ-বিবোধী গঠনমূলক স্বাদেশিকতা এবং পরবর্তী-কালেব সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি তাঁব স্বকীয় অভিজ্ঞতালব্ধ ও ক্রমপবিণত সামাজিক ভূয়োদর্শনের ফল—এটিই রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আমাদের গৌববেব বিষয়।

১৯২৫ এর পর

---

* এবিষয়ে বন্ধুবর নেপাল মজুমদার মহাশয় অনুসন্ধান ও আলোচনায় নিরত।

॥ প্রথম পর্ব ॥

পথ ছিল অবরুদ্ধ, আত্মলীন স্বপ্নের কুহকে অদৃশ্য। স্বজন-পরিজন-প্রিয়-পরিচিতের বন্ধনে সীমায়িত, নিতান্ত স্বকীয় দুঃখসুখের কাকলিতে করুণ। সহসা দ্বার ঈষৎ উন্মুক্ত হতেই চলিষ্ণু মানবসমাজ কবিব অন্তরে আশ্রয় প্রার্থনা কবলে। এই আবেদনেব স্পর্শে কবি-চিত্তের জাগরণ ঘটল। প্রথম চৈতন্যেব আভাসে অর্থহীন শৃঙ্খলাহীন অপবিমিত আবেগ-উচ্ছ্বাসে অস্ফুট আনন্দেব অভিব্যক্তিই 'নির্ঝরেব স্বপ্নভঙ্গ'। এখনকাব এই প্রায-অপবিচিত গীতিকবিই যে উত্তবোত্তব সমাজমুখী হযে আধুনিক জীবনের মহাকবি হবেন, তাব পবিচয় ঈষৎ আভাসিত হযেছে এই কবিতায়, তখন আমরা যা ধবতে পারিনি।

লক্ষণীয় এই যে, প্রবন্ধাদি বচনাব পূর্বে অর্থাৎ মননধর্মী সমাজ-অধ্যযনেব পূর্বে সাহিত্যেই তাঁব জীবনমুখিতা পবিস্ফুট হযেছে। এবিষযে প্রবল প্রমাণ বযেছে তাঁব 'সোনাব তবী' 'চিত্রা' 'চৈতালি' কাব্যে, বহু কবিতার সুগভীব পল্লী ও মৃত্তিকা-প্রীতিতে। পূর্বেই আমরা বলেছি যে শিলাইদহবাসে কবিব জীবনে প্রথম প্রত্যক্ষ ও পবিস্ফুট পবিবর্তন আসে। একদিকে কাব্যে নিসর্গপ্রীতিব এই উৎসাব,* অন্যদিকে জীবনে কৃষক-প্রজাদেব সঙ্গে সহানুভূতিময পবিচয এবং যে-মাটি ফসল উৎপন্ন ক'বে জীবনধারণ সম্ভবপব ক'বে তুলেছে তাব সঙ্গে আদান-প্রদান সম্পর্কে আবদ্ধ আত্মীযতা-অনুভব, এ ববীন্দ্রজীবনে অনিবার্য অথচ নোতুন অভিজ্ঞতা। নগবীব কখনো মন্দীভূত কখনো প্রদীপ্ত রাজনীতিক উত্তাপ থেকে, তখনকাব ভিক্ষাবৃত্ত পোলিটিক্যাল এজিটেশন থেকে দূরে থাকায় ববীন্দ্রনাথ যেন জীবনেব সঙ্গে প্রাথমিক পূর্বসংস্কাবহীন পবিচযই গভীবভাবে লাভ কবাব সৌভাগ্য অর্জন কবতে পাবলেন। আব কল্পনায় এবং অন্তর্দৃষ্টিতে তিনি যা পেলেন, চিন্তায এবং অধ্যয়নে, বিচাব এবং অভ্যাসেব ধাবায তাকেই অপ্রভাবিত-ভাবে ও পূর্ণভাবে আত্মস্থ কবতে লাগলেন। কবি-কল্পনায এবং সমাজসেবী কর্মীর ভূমিকায কোনো দ্বন্দ্ব বইল না। কাব্যিক পৃথিবী-প্রীতিব সঙ্গে সঙ্গে বাস্তব ভূমিপ্রীতি এবং কৃষকপ্রজাপ্রীতি ববীন্দ্রচিত্তে কেমন সমরেখায় অগ্রসব হয়েছিল তা 'ছিন্নপত্রে'ব পাঠক নিশ্চয়ই উপলব্ধি করবেন। বাস্তব প্রীতিব দুটো দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক, কাল্পনিক প্রীতিও যে সুগভীব আন্তবিক তা তাঁব কবিতাব পাঠকদেব সুপরিচিত।

---

* "এক সময়ে যখন আমি এই পৃথিবীর সঙ্গে এক হয়ে ছিলুম, যখন আমার উপর সবুজ ঘাস উঠত··· আমার এই যে মনের ভাব এ যেন······সূর্যসনাথা আদিম পৃথিবীর ভাব।"

"এখানকার প্রকৃতির সঙ্গে সেই আমার একটি মানসিক ঘরকন্নার সম্পর্ক, সেই একটি অন্তরঙ্গ আত্মীয়তা আছে—যা ঠিক আমি ছাড়া আর কেউ জানে না। সেটা যে কতখানি সত্য তা বললেও কেউ উপলব্ধি করতে পারবে না"। "এই আত্মীয়তাকেই আমি যথার্থ এবং সর্বোচ্চ ধর্ম ব'লে মনে করি।"

(১) "কোথায় প্যারিসেব আর্টিস্ট্-সম্প্রদায়েব উদ্দাম উন্মত্ততা আর কোথায আমাব কালীগ্রামের সবল চাষী প্রজাদেব দুঃখদৈন্য-নিবেদন। আহা, এমন প্রজা আমি দেখিনি—এদের অকৃত্রিম ভালোবাসা এবং এদের অসহ্য কষ্ট দেখলে আমাব চোখে জল আসে। আমাব কাছে এই সমস্ত দুঃখপীড়িত অটলবিশ্বাসপবায়ণ অনুবক্ত ভক্ত প্রজাদেব মুখে এমন একটি কোমল মাধুর্য আছে, এদেব দিকে চেয়ে এবং এদেব কথা শুনে সত্যি সত্যি বাৎসল্যে আমায় হৃদয় বিগলিত হযে যায়। বাস্তবিক, এবা যেন আমাব একটি দেশ-জোড়া বৃহৎ পবিবারেব লোক। এই সমস্ত নিঃসহায নিরুপায় নিতান্ত-নির্ভবপব সবল চাষাভুষোদেব আপনাব লোক মনে করতে বড়ো একটা সুখ আছে। এদেব ভাষা শুনতে আমাব এমন মিষ্টি লাগে—তাব ভিতব এমন স্নেহমিশ্রিত করুণা আছে। এবা যখন কোনো একটা অবিচাবেব কথা বলে—আমাব চোখ ঝাপসা হযে আসে—অন্য নানা ছলে আমাকে সামলে নিতে হয। এবা অনেক দুঃখ অনেক ধৈর্য-সহকাবে সহ্য কবেছে, তবু এদেব ভালোবাসা কিছুতেই ম্লান হয না। ....." (ছিন্নপত্র, ১১১)

(২) "আমাব এই দবিদ্র চাষী প্রজাগুলোকে দেখলে আমাব ভাবি মাযা কবে—এবা যেন বিধাতাব শিশু-সন্তানেব মতো—নিরুপায—তিনি এদেব মুখে নিজেব হাতে কিছু তুলে না দিলে এদেব আব গতি নেই। পৃথিবীব স্তন যখন শুকিয়ে যায় তখনি এবা কেবল কাঁদতে জানে, কোনোমতে একটুখানি খিদে ভাঙলেই আবাব তখন সমস্ত ভুলে যায। সোসিযালিস্টবা যে সমস্ত পৃথিবীময ধন বিভাগ ক'বে দেয সেটা সম্ভব কি অসম্ভব ঠিক জানিনে—যদি একেবারেই অসম্ভব হয তাহ'লে বিধিব বিধান বড়ো নিষ্ঠুব, মানুষ ভাবি হতভাগ্য।" (ঐ, ৯৫)

শিলাইদহ-শাজাদপুব-কালীগ্রামে পল্লীসংগঠন কাজে সাধ্যমত আত্মনিয়োগেব দশ-বাবো বছব আগেকাব লেখা এই সব চিঠি। পবে যাকে কর্মে ফলপ্রসূ ক'বে তোলাব উদ্যোগ কবলেন, পূর্বে তাকে কতদূর আন্তবিকভাবে গ্রহণ করেছিলেন তাব প্রমাণও এসব স্বগতভাষণ। আমরা মনে করি, শিলাইদহে আসার পব কবিব দৃষ্টি-কোণে যে পরিবর্তন ঘটল তাব জেব শ্রীনিকেতনের পল্লীসংগঠন অধ্যায় অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত চলেছিল মধ্যেকাব বহু নূতনত্ব বহু বিচ্ছিন্নতাব স্তর অতিক্রম ক'রে। নিসর্গ এবং পল্লী-মানুষ সান্নিধ্যেব এই অধ্যায়টিকে কবি বিস্মৃত তো হন-ই নাই, কল্পনা ও কর্মেব বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে এই অন্তবলব্ধ স্বাদেশিকতাকে সম্পূর্ণতা দেওযাব প্রয়াস করেছেন শেষ পর্যন্ত।

মনীষী ও কবির মৃত্তিকা-প্রীতি যে কতদূব আন্তবিক ও মানুষেব বাস্তব কল্যাণেব সঙ্গে বিজডিত তাব পরিচয় স্বরূপ ১৯১৫-র তাঁব একটি ভাষণ থেকেও কয়েক পঙ্‌ক্তি উদ্ধার কবে দেখানো যেতে পাবে— "তাব পবে মাটিব কথা, যে মাটিতে আমবা জন্মেছি। এই হচ্ছে সেই গ্রামেব মাটি, যে আমাদেব মা, আমাদেব ধাত্রী, প্রতিদিন যার কোলে আমাদেব দেশ জন্মগ্রহণ কবছে। আমাদেব শিক্ষিত লোকদেব মন মাটি থেকে দূবে ভাবের আকাশে উডে বেডাচ্ছে…সমস্ত দেশেব ধূসব মাটি, এই শুষ্ক তপ্ত দগ্ধ মাটি, তৃষ্ণায় চৌচিব হয়ে ফেটে গিয়ে কেঁদে ঊর্ধ্বপানে তাকিয়ে বলছে, 'তোমাদের ঐ যা-কিছু ভাবেব সমারোহ ঐ যা-কিছু জ্ঞানেব সঞ্চয়, ও তো আমাবই জন্যে—আমাকে দাও, আমাকে দাও। সমস্ত নেবাব জন্যে আমাকে প্রস্তুত কবো, আমাকে যা দেবে তাব শতগুণ ফল পাবে।' এই আমাদেব মাটিব উত্তপ্ত দীর্ঘনিশ্বাস আজ আকাশে গিয়ে পৌঁচেছে, এবাব সুবৃষ্টির দিন এল ব'লে, কিন্তু সেই সঙ্গে চাষেব ব্যবস্থা চাই যে।" প্রকৃত বঙ্গভঙ্গেব পূর্বেই স্বদেশী-সমাজ গঠনেব যে ডাক তিনি দিয়েছিলেন, যাব কথা পববর্তী বহু ভাষণেব মধ্যেই উচ্চাবণ কবেছেন, অথচ উচ্চকণ্ঠ বাজনীতিকেবা যাকে অবহেলাই ক'বে এলেন, সেটি যে তাঁব মুখেব কথা নয়, অন্তবেব নিঃশেষ বার্তাবহ, তাব প্রমাণ তিনি কর্মেব মধ্য দিয়ে নিজেই দিয়ে গেলেন, আব আমাদেব পক্ষে ঐ ব্যাপাবটির নিতান্ত প্রযোজনেব প্রমাণ মিলছে আজকেব সমাজ-তান্ত্রিক গ্রামকেন্দ্রিক দৃষ্টিকোণ গঠনেব আগ্রহে এবং ধর্মনিবপেক্ষ 'সোনাব বাংলা' গড়ে তোলার সংকল্পে। শিলাইদহ অবস্থানকালে কবিকল্পনাব বোম্যাণ্টিক প্রবণতা তাকে কিছুকালেব জন্য প্রাচীনেব সৌন্দর্যস্বপ্নে পবিভ্রমণ কবিয়েছে ঠিকই (কল্পনা ও নৈবেদ্য কাব্য তুং), কিন্তু পল্লীব মানুষ ও নিসর্গ থেকে বিচ্যুতি এই সাময়িক পর্যাযেও লক্ষ্য কবা যায় না। কবিব ঐ প্রাচীন প্রবৃত্তিব সঙ্গে সামঞ্জস্য বেখেছে তাঁব ব্রহ্মচর্য-বিদ্যালয় ও শান্তিনিকেতন সংগঠন।

সোনাবতবী-চৈতালি-ক্ষণিকাব যুগেব কবিকল্পনা এবং মনীষাব এই মৌল এক-মুখিতাব পবিচয় তাঁব পূর্ব-রচনা অর্থাৎ 'ছবি ও গান' থেকে 'কডি ও কোমল' এমন কি 'মানসী' পর্যন্ত তেমন পাওয়া যায় না, অর্থাৎ ঐ সময়কাব স্বপ্নব্যাকুল কবিত্ব এবং সমাজমুখী গদ্য-পদ্য রচনাব প্রবৃত্তি ঠিক একই মৌল উৎস থেকে নিযন্ত্রিত নয়, ববং সমান্তরাল, এমন কথা বললে হয়ত অসংগত হয় না। ববীন্দ্রনাথ 'ভাবতী' পত্রিকাব সাময়িক প্রযোজনের তাগিদেই 'জুতা ব্যবস্থা' 'চীনে মবণেব ব্যবসায়' 'টাউনহলেব তামাসা' 'হাতে কলমে' (১৮৮২-৯০) প্রভৃতি আলোচনা হযতো বা লিখেছেন। তবু এই সব আলোচনার মধ্যেই এমন একটি কথাব উপব জোব দেওযা হয়েছে যা নোতুন এবং যা রবীন্দ্রনাথেবই স্বাদেশিকতা বিষয়ে চিবন্তন কথা। সেটি হ'ল, সভাসমিতি

আন্দোলনে সত্যকার কাজ হবে না, যার যেটুকু সাধ্য তাই দিয়ে অশিক্ষা দূর করতে হবে, অন্নাভাব-মোচনেব পথ দেখাতে হবে দেশের অবহেলিত সাধারণ মানুষকে, ইংবেজি আভিজাত্য ত্যাগ ক'বে গ্রামীণ মানুষেব সমকক্ষ হতে হবে। চাকুরিতে ইংরেজের সমকক্ষতা ভিক্ষা করার মত হেয়তা আর কিছু হতে পাবে না। "ইংরেজেব কাছে ভিক্ষা কবিযা আমরা আব সব পাইতে পারি, কিন্তু আত্মনির্ভরতা পাইতে পাবি না" "আমাদেব চাবদিকে আশে-পাশে আমাদের গৃহেব মধ্যেই আমাদের কার্য-ক্ষেত্র।" রবীন্দ্রজীবনীকাব ঠিকই ধবেছেন যে এসব বাজনীতিক আলোচনায় তাঁর পবিণতকালেব গঠনমূলক স্বাদেশিকতাব বা স্বদেশী সমাজেব আভাস ফুটেছে। আমবা আব একটু অগ্রসব হ'যে একথাও বলতে পারি যে আমলাতান্ত্রিক ইংরেজি-শিক্ষিত শ্রেণীগঠনেব বিবোধিতা কবায তাঁব সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিকোণেবও ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। তা ছাড়া দেখা যায, তখনকার ভাবতবর্ষেব যে উল্লেখ্য বিষয়টিতে যৌবনাবম্ভেব লেখক হাত দিয়েছেন, সেটি হ'ল শাসক ইংবেজ চরিত্র এবং ইংবেজের ও ভারতবাসীব পাবস্পবিক সম্পর্ক। এবিষয়ে স্বাধীন ও স্থাযী মতামত তাঁব পূর্বে বামমোহন ও বঙ্কিমচন্দ্র কিছু দিযেছিলেন। তাঁব সমকালীন দেশনেতা সুবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও তঁদনুসাবী গোষ্ঠীব কাউন্সিল বা সিভিল সার্ভিসে স্থানলাভ বিষযে আবেদন-নিবেদনেব বিষয নিযেও একালেব ববীন্দ্রনাথেব মন্তব্য প্রকাশ। এবকম সামযিকতাব তাগিদে ববীন্দ্রনাথ প্রচাব, নবজীবন, বঙ্গবাসী প্রভৃতি পত্রিকায প্রকাশিত আচাবসর্বস্ব হিন্দুয়ানির প্রতিবাদকল্পেও কিছু আলোচনা লেখেন এবং পবে প্রচলিত হিন্দুয়ানিব সমর্থক চন্দ্রনাথ বসুব সঙ্গে আহাব এবং বিবাহাদি সামাজিক প্রথা নিযে বিতর্কেও প্রবৃত্ত হন।

১৮৯০এব কাছাকাছি সমযেব কাব্যবচনাব মধ্যে 'মানসী'তে ও 'বিসর্জনে' (বঘুপতি চবিত্রেব মধ্যে) তাঁব সেকালকাব সামাজিক ও বাজনীতিক মতামত অল্পস্বল্প প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু এগুলি ঠিক স্বাদেশিক ততটা নয, যতটা বাঙলা ও বাঙালিকে নিযে, যেমন 'দেশের উন্নতি' 'দুবন্ত আশা' 'বঙ্গবীব'। এর মধ্যে 'দেশেব উন্নতি'তে সভা-বক্তৃতাধর্মী অসার এজিটেশন্ এবং তথাকথিত বাজনীতিকদের নিন্দা কবা হয়েছে। আব 'দুবন্ত আশা' কবিতায় এই কৃত্রিম জড ও অপমানে লাঞ্ছিত জীবনেব বন্ধন ত্যাগ ক'বে বিঘ্নবিপৎসংকুল বীবেব জীবন ববণ কবাব উৎসাহ প্রকাশ কবা হয়েছে। এই ভাবটি একালকার 'গুরুগোবিন্দ' কবিতাবও মর্মকথা, কিন্তু এতে প্রস্তুতি-হিসেবে ইঙ্গিত দেওযা হযেছে নীবব সাধনাব দিকে, যা মঞ্চে অসাব বক্তৃতাব বিবোধী। এই মনোভাব নিযে লেখা, সামযিক হ'লেও, আন্তবিক গীতিকথা হ'ল "আমায় বোলো না গাহিতে বোলো না।" হিসেব ক'রে দেখলে এ গানের মর্মকথায

আজও প্রযোক্তব্য সত্য লুকিযে রয়েছে। সে যাই হোক, একালের সমাজমুখী ববীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে লক্ষণীয় বিষয় হ'ল (১) আমাদের পবাধীনতা ও ইংরেজ চরিত্র বিষয়ে তাঁব সচেতন মনোভাব, (২) উচ্চ রাজপদ লাভের জন্য আবেদনাত্মক মনোভাবের বিবোধিতা, (৩) আত্মনির্ভবতা ও স্বকীয উদ্‌যোগে যথার্থ দেশহিতের প্রযাসকে অভিনন্দন। লক্ষণীয এই যে, যৌবনাবম্ভে দু'বাব বিলাত-ভ্রমণের পবও স্বাদেশিক মনোভাবে তিনি অবিচলিত ছিলেন। বাল্যে-কৈশোবে দৃষ্ট 'হিন্দুমেলা'ব আদর্শ তাঁর চিত্তে এসব বিষযে কিছুটা প্রভাব বিস্তাব কবেছিল এমন অনুমান করা যেতে পাবে।

'ভারতী'তে প্রকাশিত ববীন্দ্রনাথেব প্রাথমিক বাজনীতিক প্রবন্ধগুলি সম্বন্ধে যে বিচাবই কবা যাক, তিরিশোত্তর পূর্ণ যৌবনে লেখা 'সাধনা'য় প্রকাশিত ইংবেজ ও ভাবতবাসী, ইংরেজেব আতঙ্ক, অপমানেব প্রতিকাব, সুবিচারের অধিকাব, রাজা ও প্রজা, রাজনীতিব দ্বিধা প্রভৃতি আলোচনাগুলি (খ্রীঃ ১৮৯৩-৯৪) তাঁব পবিণতবোধেব পবিচাযক, সুতবাং তাঁব বাজনীতিক ও সমাজনীতিক সত্তাব মূল্যাযনের দিক থেকে অপবিহার্য বিবেচনা কবতেই হয। এব স্বল্প পূর্বে 'শিক্ষার হেবফেব' প্রবন্ধে ইংবেজিব স্থানে মাতৃভাষার সপক্ষতা ক'বে তিনি যেমন তৎকালীন আমলাতান্ত্রিক মনোভাবেব তেমনি বক্তৃতাসম্বল বাজনীতিকদেব আত্মাভিমানেব ত্রুটি দেখিযে দিয়েছেন।

'সাধনা'য় বাজনীতিক হিসেবে আত্মপ্রকাশেব পব ববীন্দ্রনাথ যেমন ইংবেজ চবিত্রের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ ক'বে তাদেব অহমিকা এবং ঘৃণাপর স্বভাবেব পবিচয ফুটিযে তুলতে লাগলেন, তেমনি আমাদের দুর্বলতা কোথায তাও দেখিযে দিলেন এবং এব চেযেও যা গুরুত্বপূর্ণ দিক, সেই উপনিবেশিকতা ও সাম্রাজ্যবাদেব স্বরূপও যথাসাধ্য উদ্‌ঘাটিত কবতে লাগলেন। সেকালে এদেশেব বাজনীতিকেবা বিদেশী শাসনকে এভাবে দেখতে অভ্যস্ত ছিলেন না, অন্ততঃ বঙ্গভঙ্গেব পূর্বে নয। 'ইংবেজ ও ভাবতবাসী' প্রবন্ধটি (১৮৯৩) সেকালে সাময়িকপত্রে প্রশংসিত হয়েছিল। এই প্রবন্ধে শাসক ইংবেজেব প্রভুমনোভাবাপন্ন ও উন্নাসিক চবিত্রের জন্যই যে আমাদেব সঙ্গে মনেব মিল ঘটছে না এই বিষযটি প্রতিপন্ন ক'বে তাদেব উপনিবেশবাদী স্থিতিব স্বরূপ কবি এইভাবে পবিস্ফুট কবেছেন—

> "ইংলণ্ড উত্তরোত্তর ভাবতবর্ষকে তাহাদেবই রাজগোষ্ঠেব চিবপালিত গোরুটির মতো দেখিতেছেন। গোয়াল পরিষ্কাব বাখিতে এবং খোল বিচালি জোগাইতে কোনো আলস্য নাই, এই অস্থাবব সম্পত্তিটি যাহাতে রক্ষা হয় সে পক্ষে তাঁহাদের যত্ন আছে, যদি কখনো দৌরাত্ম্য করে সেজন্য শিংদুটা ঘষিয়া দিতে ঔদাসীন্য নাই, এবং দুইবেলা দুগ্ধ দোহন কবিযা লইবার সময় কৃশকায় বৎসগুলাকে একেবারে বঞ্চিত করে না। কিন্তু তবু স্বার্থের

> সম্পর্কটাকেই উত্তরোত্তর জাজ্বল্যমান করিয়া তোলা হইতেছে।...... ভারতবর্ষ কেবল হিসাবের খাতায় শ্রেণীবদ্ধ অঙ্কপাতের দ্বারা নির্দিষ্ট। ইংলণ্ডের প্র্যাক্‌টিক্যাল লোকের কাছে ভারতবর্ষের কেবল মণ-দরে, সের-দরে, টাকার দরে, সিকার দরে গৌরব। সংবাদপত্র এবং মাসিকপত্রের লেখকগণ ইংলণ্ডকে কি কেবল এই শুষ্ক পাঠই অভ্যাস করাইবেন। ভারতবর্ষের সহিত যদি কেবল তাহার স্বার্থের সম্পর্কই দৃঢ় হয় তবে যে শ্যামাঙ্গিনী গাভীটি আজ দুধ দিতেছে, কালে গোপকুলের অযথা বংশবৃদ্ধি ও ক্ষুধাবৃদ্ধি হইলে তাহার লেজটুকু এবং ক্ষুরটুকু পর্যন্ত তিরোহিত হইবার সম্ভাবনা। এই স্বার্থের চক্ষে দেখা হয় বলিয়াই তো ল্যাঙ্কাশিয়ার নিরুপায় ভারতবর্ষের তাঁতের উপর মাশুল বসাইয়াছে আর নিজের মাল বিনা মাশুলে চালান করিতেছে।"

ইংরেজের সঙ্গে ভারতবাসীর বর্ণগত, চরিত্রগত, ব্যবহারগত যে সব অনৈক্য আছে তা আমাদের পক্ষ থেকে বিলুপ্ত ক'রে মিলন ঘটানোর প্রয়াসের রবীন্দ্রনাথ বিরোধী। পরবর্তী কোনো সময়ে তিনি যে সাংস্কৃতিক মিলনের উদ্যোগী হয়েছিলেন, সে মনোভাবও এখানে নেই। স্বদেশীয় চরিত্রে নানা দুর্বলতা বিষয়ে ওয়াকিবহাল হয়েও তিনি ঘোর স্বাদেশিক। পরিশেষে এই মূল্যবান্ প্রবন্ধটিতে বলদৃপ্ত সাম্রাজ্যগর্বিত শাসকের দয়ার উপর নির্ভর না ক'রে যথাসাধ্য স্বাবলম্বী হওয়ার উপদেশই শোনালেন—

> কেবলমাত্র ভিক্ষা করিয়া কখনোই আমাদের মনের যথার্থ সন্তোষ হইবে না। আজ আমরা মনে করিতেছি, ইংরেজের নিকট হইতে কতকগুলি অধিকার পাইলেই আমাদের সকল দুঃখ দূর হইবে। ভিক্ষাস্বরূপে সমস্ত অধিকারগুলি যখন পাইব তখনও দেখিব, অন্তর হইতে লাঞ্ছনা কিছুতেই দূর হইতেছে না—বরং যতদিন না পাইয়াছি ততদিন যে সান্ত্বনাটুকু ছিল সে সান্ত্বনাও আর থাকিবে না।......যদি অরণ্যে রোদনও হয় তবু বলিতে হইবে যে, ইংরাজি ফলাইয়া কোনো ফল নাই, স্বভাষায় শিক্ষার মূলভিত্তি স্থাপন করিয়াই দেশের স্থায়ী উন্নতি, ইংরেজের কাছে আদর কুড়াইয়া কোনো ফল নাই, আপনাদের মনুষ্যত্বকে সচেতন করিয়া তোলাতেই যথার্থ গৌরব; অন্যের নিকট হইতে ফাঁকি দিয়া আদায় করিয়া কিছু পাওয়া যায় না, প্রাণপণ নিষ্ঠার সহিত ত্যাগ স্বীকারেই প্রকৃত কার্যসিদ্ধি।

ইংরেজের কাছ থেকে ক্রমাগত অবিচার, অপমান এমন কি প্রহার সহ্য ক'রে চুপ ক'রে যেতে বাধ্য হওয়ার মত অবমাননা রবীন্দ্রনাথের কাছে অসহনীয় হওয়ায় তার প্রতিকারের পথ নির্দেশ করতে চেয়েছেন 'অপমানের প্রতিকার' প্রবন্ধে। এ বিষয়ে

তাব প্রথম বক্তব্য হ'ল, মারের পরিবর্তে পাল্টা মার বিধেয়। কিন্তু কেনই বা ইংরেজ সহজেই এদেশীয়দের অভদ্র ভাষায় গালাগালি কবে, গায়ে হাত তুলে এবং কেনই বা আমবা তা নীববে হজম করি সে ব্যাপাবেব মূল তিনি আমাদের জাতীয় প্রকৃতির মধ্যেই খুঁজে পেয়েছেন এবং সেই মৌল প্রকৃতিবই সংশোধনের নির্দেশ দিয়েছেন—

"বাঙালিব প্রতি বাঙালি কিরূপ ব্যবহার কবে সেইটে গোড়ায় দেখা উচিত। কাবণ, তাহাবই উপব আমাদেব সমস্ত শিক্ষা নির্ভব করে। আমবা কি আমাদেব ভৃত্যদিগকে প্রহাব কবি না, আমবা আমাদের অধীনস্থ ব্যক্তিদেব প্রতি ঔদ্ধত্য এবং নিম্নশ্রেণীয়দিগেব প্রতি সর্বদা অসম্মান প্রকাশ কবি না। আমাদেব সমাজ স্তবে স্তবে উচ্চে নীচে বিভক্ত, যে ব্যক্তি কিছুমাত্র উচ্চ আছে, সে নিম্নতব ব্যক্তিব নিকট হইতে অপবিমিত অধীনতা প্রত্যাশা কবে। নিম্নবর্তী কেহ তিলমাত্র স্বাতন্ত্র্য প্রকাশ কবিলে উপবেব লোকেব গায়ে তাহা অসহ্য বোধ হয। ভদ্রলোকেব নিকট 'চাষা বেটা' প্রায মনুষ্যের মধ্যেই নহে। ক্ষমতাপন্নেব নিকট অক্ষম লোক যদি সম্পূর্ণ অবনত হইয়া না থাকে তবে তাহাকে ভাঙিযা দিবাব চেষ্টা কবা হয।......সেই সকল কাবণে আমবা যথার্থই মনুষ্যত্বহীন হইযা পড়িযাছি, এবং সেই কাবণেই ইংবেজ ইংবেজেব প্রতি যেমন ব্যবহাব কবে, আমাদেব প্রতি সেরূপ ব্যবহাব কবে না।"

সার্থক আত্মসমালোচনা। যাঁবা ববীন্দ্রনাথকে অভিজাত এবং বুর্জোয়া-কম্‌প্লেক্স্-এব লেখক বলে আজও মনে কবেন তাঁদেব এসব বিবেচনা ক'বে দেখতে অনুবোধ জানাই। এবও পবে কবি যখন হিন্দু-মুসলিম-সমস্যা, অসহযোগ প্রভৃতি নিযে নিজ মতামত প্রকাশ কবছেন তখনও আমাদেব আভ্যন্তবীণ দুর্বলতাব দিকেই সর্বাগ্রে দৃষ্টি দিতে বলেছেন। স্বাধীনতা-আন্দোলনেব যুগেব হিন্দু-মুসলিম-সমস্যা-সম্পর্কে ববীন্দ্রনাথ কত আগে থাকতে সচেতন এবং বিষযটিকে কবি কতদূব বাস্তবভাবে দেখাব প্রযাসী তাব প্রমাণ পাওযা যায 'সুবিচাবের অধিকাব' প্রবন্ধ থেকে। এটিও সাধনা-পৃষ্ঠে লেখা, বাঙ্‌লা সন ১৩০১ অগ্রহাযণে প্রকাশিত। কিন্তু এ লেখাটির অবলম্বন একটি সামযিক ঘটনা মাত্র, সেজন্য হিন্দু-মুসলিম সমস্যাব সমাধানে পববর্তীকালে যে সামাজিক মিলনেব প্রসঙ্গ তুলেছেন তা এখানে দেখা যায় না। ববংচ ইংবেজ সবকাবেব ছোটখাট কর্মচাবীরা যে হিন্দু-মুসলমান বিদ্বেষবহ্নিকে ফুৎকাবেব দ্বাবা উদ্দীপিত কবছেন সাধাবণেব এই ধাবণাব কিছুটা প্রতিধ্বনিই একালকাব প্রবন্ধে লক্ষণীয় ('ইংবাজেব আতঙ্ক'ও দ্রষ্টব্য)। ববীন্দ্রনাথ তাঁব সাহিত্যসৃষ্টিব ও সাহিত্য-চর্চাব অবকাশে তৎকালীন ইংবেজ শাসনেব অবিচাবেব দৃষ্টান্ত, ইংবেজি সংবাদপত্রেব

পক্ষপাতিত্ব প্রভৃতি নিয়ে সাময়িক উল্লেখ্য ঘটনাবলীর সঙ্গে এত যোগাযোগ রাখতেন যে ভাবলে অবাক হতে হয়। এমনকি দক্ষিণ আফ্রিকায় ইংরেজেব উপনিবেশ পাকা কবাব নৃশংস অভিযানও তাঁর দৃষ্টির বাইরে ছিল না ('রাজনীতির দ্বিধা' প্রবন্ধ দ্রঃ)। তাছাডা যখন দেখা যায় যে একালেব অধিকাংশ সময়ই তাঁর কাটছে মধ্য-উত্তরবঙ্গে এব· পবিভ্রমণে।

এ সময়কাব বাজনীতিক আলোচনাব পাশাপাশি চলেছে কাব্যে তাঁব সৌন্দর্য-সাধনা এবং আন্তরিকতাময় পৃথিবীপ্রীতি, আব মুখ্যতঃ পল্লীজীবন নিয়ে লেখা গল্প-গুলি। বাজনীতিক অনুভব সাহিত্যে কোথাও কোথাও প্রভাব বিস্তার কবেনি এমন নয়, তবে তাব পবিসব সামান্য। যেমন বলা যায় 'মেঘ ও বৌদ্র' গল্প, কি 'এবাব ফিবাও মোবে' কবিতা। গল্পটিতে ইংবেজ বাজকর্মচাবীর উৎকট অবজ্ঞা ও নিপীডন এবং কবিতাটিতে লাঞ্ছিত সাধাবণ মানুষেব দুঃসহ জীবনেব বর্ণনা। শিলাইদহ-বাসে কবিজীবনে যে মুক্তি ঘটল তাব ফলে কেবল নির্যাতিত কৃষকসমাজই নয়, স্বদেশেব যাবতীয় দবিদ্র ও লাঞ্ছিত মানুষেব মর্মবেদনাব সমব্যথী হলেন কবি। এই কবিতাটিব সঙ্গে সমবেখায় গ্রথিত 'ঝুলন' ও 'নির্ঝবেব স্বপ্নভঙ্গে'ব বিষয় পূর্বেই বলা হযেছে। কবিতাটিতে বাস্তবেব সঙ্গে আদর্শবাদেব মিশ্রণ লক্ষণীয়। আমবা পূর্বেই বলেছি স্বামী বিবেকানন্দেব মানবিকতাব প্রভাব এব মধ্যে থাকা খুবই সম্ভব। কবি স্বপ্ননীড ত্যাগ ক'বে জনসমাজে এই যে এলেন ('বাহিবিনু হেথা হতে ধূসব প্রসব বাজপথে, জনতাব মাঝখানে') তাব প্রভাব তাঁব কবিজীবনে গভীব হ'ল বলেই 'অন্তর্যামী' কবিতায "যে পথে পান্থ চাহে চলিবাবে চলিতে দিতেছ কই" "কভু বা পন্থ গহন জটিল, কভু পিচ্ছল ঘন পঙ্কিল" প্রভৃতি উক্তি কবলেন। এখন থেকে কর্মী ববীন্দ্রনাথেব জন্ম হ'ল। 'চিত্রা' কাব্যেব মধ্যে কবিব মৃত্তিকা-প্রীতি এবং কৃষক-প্রীতিব উল্লেখযোগ্য কবিতা হ'ল 'দুই বিঘা জমি'। কবিতাটিকে 'মাটিব মায়া' নাম দিলেও ক্ষতি হ'তনা, কিন্তু তাতে কৃষক-জীবনের বাস্তবতা তেমন দ্যোতিত হ'ত কিনা সন্দেহ। দবিদ্র কৃষক অত্যাচাবী জমিদাবেব অথবা নাযেব-গোমস্তা-আমিনেব হাতে কিভাবে নিগৃহীত ও সর্বস্বান্ত হয তা শিলাইদহে জমিদারিব কাজে এসে রবীন্দ্রনাথ মর্মে মর্মে উপলব্ধি কবেছিলেন। তাঁব সহানুভূতি কতদূব প্রজাসাধাবণেব সপক্ষে ছিল তাব প্রমাণ তাঁব একালেব পত্রাবলী, পববর্তীকালের 'বাযতেব কথা' ও শ্রীনিকেতনেব ভাষণ, পাবনা সম্মিলনীতে ভাষণ, স্বদেশী সমাজ প্রঃ এবং লেখায় যত্রতত্র নানাভাবে ছডিয়ে বয়েছে। রবীন্দ্রনাথ কবি হয়েও বাস্তবভাবে মানবিক ও সামাজিক ছিলেন নিঃসন্দেহে। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদেশেব কৃষক' এবং রেভাঃ লালবিহারী দে'র বিখ্যাত 'Bengal peasant life'-এর পব কৃষকজীবন নিয়ে উল্লেখযোগ্য সহানুভূতি রবীন্দ্রনাথেরই। ইং ১৮৯৫-৯৬ সালে

লেখা 'চৈতালি'র কয়েকটি কবিতায় পূর্বোক্ত 'অপমানের প্রতিকাব' 'সুবিচাবেব অধিকাব' প্রভৃতিব বক্তব্যেব প্রতিধ্বনি লক্ষণীয়। যেমন, 'অভিমান' কবিতায়—

নিজের বিচাব যদি নাই নিজ হাতে,
পদাঘাত খেযে যদি না পাব ফিবাতে—
তবে ঘবে নতশিবে চুপ ক'রে থাক্,
সাপ্তাহিকে দিগ্বিদিকে বাজাসনে ঢাক।

যেমন 'পবৃবেশ' কবিতায মুখে-স্বদেশী অথচ ভাষা ও পবিচ্ছদে বিদেশীদেব প্রতি তিবস্কাববাক্য :

কে তুমি ফিবিছ পবি প্রভুদেব সাজ।
ছদ্মবেশে বাডে না কি চতুর্গুণ লাজ। ইত্যাদি

এমন কি কালিদাস-সম্পর্কে যখন মন্তব্য কবছেন তখনও একালেব বর্ণনায পবনিগৃহীত জীবনেরই ছাযাপাত ঘটেছে, যেমন—

কখনো কি সহ নাই অপমানভাব,
অনাদব, অবিশ্বাস, অন্যায বিচাব, ··

স্বদেশমৃত্তিকার অনুবাগে লিপ্ত কবিব এই সহজ অনায়াস স্বাদেশিকতাব পবিচয একালকার 'কল্পনা' কাব্যেব কযেকটি কবিতাতেও দেখা যাব, যেমন, বঙ্গলক্ষ্মী, শবৎ, ভিক্ষাযাং নৈব নৈব চ, মাতাব আহ্বান প্রভৃতি। 'উন্নতি লক্ষণ' কবিতায তখনকাব সভামঞ্চে বক্তৃতা-পবাযণ নব্যহিন্দু ও নকল স্বাদেশিকদেব মৃদুভাষায ব্যঙ্গ কবা হযেছে। এই সময়কাব একটি উল্লেখ্য কবিতা হ'ল 'বর্ষশেষ' (১৮৯৮ চৈত্র)। কবিতাটিতে ঝড-দুর্যোগেব বর্ণনা উপলক্ষ্য ক'রে যান্ত্রিক কৃত্রিম ও প্রথানুগত জীর্ণ জীবনে অসহিষ্ণু কবি দীনতাশূন্য বলিষ্ঠ জীবনেব মধ্যে মুক্তি চেযেছেন। আত্মকথায় কবিতাটি বচিত হ'লেও তা যে তদানীন্তন সমাজ-জীবনেব প্রতিঘাতে উচ্চারিত তা স্পষ্ট এবং কেবল পবাধীনতার গ্লানিই নয়, সমাজেব জাতিবর্ণভেদ এবং বাস্তব জীবনের পুঞ্জীভূত দীনতা-হীনতা সবই এতে ব্যক্ত হযেছে। এর মধ্যেকাব "খিন্ন শীর্ণ জীবনের শতলক্ষ ধিক্কারলাঞ্ছনা" যদিচ 'অপমানেব প্রতিকার,' 'সুবিচাবের অধিকার' 'কণ্ঠবোধ' এবং 'প্রসঙ্গ-কথা'র আলোচনা-গুলিকে স্মবণ করিয়ে দেয, "শুধু দিনযাপনেব শুধু প্রাণধারণের গ্লানি, শরমের ডালি। নিশি নিশি রুদ্ধঘরে ক্ষুদ্রশিখা স্তিমিত দীপেব ধূমাঙ্কিত কালি" প্রভৃতি বর্ণনা সমাজের সংকীর্ণতাকে লক্ষ্য ক'রেই গ্রথিত। রবীন্দ্রনাথ কেবল রাজনীতিক মুক্তি নয়, সমাজের সামগ্রিক মুক্তি চেয়েছেন এবং ক্রমশঃ আমাদের অন্তর্নিহিত দুর্বলতার বিরুদ্ধেই বেশি সংগ্রাম কবেছেন এর পরিচয তাঁর চিন্তাভাবনায় শেষ পর্যন্ত সর্বত্রই রয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না, নানা কারণেই ছিলেন না, কিন্তু তাঁর মত পুরোবর্তী রাজনীতিক (সংকীর্ণ অর্থে নয়) চিন্তানায়ক দেশে স্বল্পই ছিলেন। ইংরেজেব সাম্রাজ্যবাদী শাসনের বিকৃতরূপ এবং শোষণের স্বরূপ নিয়ে বাংলা ইংরেজিতে তিনি যা লিখে গেছেন তাতে তাঁব বচনাবলীব অন্ততঃ দু'-তিন ভলুম সম্পূর্ণ হযে যায়। এ ছাডা সমাজেব ও কৃষকেব সর্বাঙ্গীন উন্নতিব অভিলাষ নিযে বাস্তব উদ্যোগ ও রচনা তো রয়েছেই। ১৯০০ খ্রীস্টাব্দের পূর্বে কবির গঠনমূলক স্বাদেশিকতার অন্য একটি উল্লেখ্য ব্যাপার হ'ল রাজনীতিক আন্দোলনে মাতৃভাষাব ব্যবহাব সমর্থন। ১৮৯৭এ কংগ্রেসেব নাটোব প্রাদেশিক সম্মেলনে ইংবেজিতে বক্তৃতাব বিপক্ষে প্রতিবাদ ক'বে বাঙলা প্রবর্তনেব প্রথম প্রযাস তিনিই কবেন। দেশে যেখানে শতকবা আঠানব্বই জন ইংরেজিতে অনভিজ্ঞ সেখানে ইংবেজিতে বক্তৃতাব অর্থ যে প্রকাবান্তবে জাতীযতাবিবোধী উপনিবেশিকতারই সমর্থন এবং অবাস্তব ছেলেমানুষি তা তিনি তৎকালীন বাজনীতিকদেব চেয়ে ভালোভাবেই বুঝেছিলেন। নাটোব সম্মেলনেব পব 'ভারতী' পত্রিকায, 'বঙ্গদর্শনে' সভাসমিতিতে মাতৃভাষা ব্যবহাবেব যৌক্তিকতার বিষয পুনঃপুনঃ উত্থাপন করেন * এবং ১৯০৮এ পাবনায় প্রাদেশিক সম্মেলনেব সভাপতিত্ব কবতে গিযে কংগ্রেস সভায মাতৃভাষার ব্যবহার প্রায প্রতিষ্ঠিত ক'বে দেন। 'সাধনা' পত্রিকা বন্ধ হযে যাবাব পর (১৮৯৫ শেষ) মুখ্যত 'ভারতী' এবং 'বঙ্গ-দর্শন' আশ্রয় ক'রে তাঁব জাতীয়তাবাদী এবং সাম্রাজ্যবাদ-বিবোধী চিন্তাগুলির বিন্যাস করতে থাকেন। কিন্তু ইতিমধ্যে যেমন দেশের মধ্যে নোতুন বাজনীতিক ব্যাপার ঘটতে থাকে, তেমনি নিজের মধ্যেও জাতীয়তামূলক সাহিত্যিক আদর্শেব অভিনবতা উপলব্ধি কবতে থাকেন, যার ফলে কয়েক বৎসরেব জন্যে প্রাচীন ভাবতের ঐতিহ্যেব মধ্যে তিনি আত্মনিয়োগ কবেন। এ বিষয়ে আমরা একটু পরেই আসছি। আপাততঃ বাজনীতি-প্রবাহ লক্ষ্য করা যাক।

১৯০৫এ বঙ্গভঙ্গ-প্রতিবোধ আন্দোলনই ভাবতেব প্রথম যথার্থ স্বাদেশিক আন্দোলন। তবু এব পূর্বে ধর্মনীতিব ভিতব দিয়ে জাতীয়তাবোধ এবং বৈদেশিক শাসনেব বিরুদ্ধতাব মনোভাব উন্মেষিত হয় মহাবাষ্ট্রে বালগঙ্গাধর তিলকেব নেতৃত্বে। ১৮৯৩ খ্রীঃ গো-বক্ষা সমিতিব প্রতিষ্ঠা হয়। ব্যাপারটি আজকেব দৃষ্টিতে মুসলিম-বিবোধী সুতরাং প্রতিক্রিযাশীল নিশ্চয়ই, কিন্তু তখনকাব পটভূমিতে এতেই হিন্দুর জাতীয়তাবোধ জাগে, এবং ব্রিটিশ-বিরোধিতায় হিন্দুরা যে মুসলিমদের অগ্রবর্তী তাতেও সন্দেহ নেই। এদিক থেকেই বোধ হয় রবীন্দ্রনাথ 'ইংবেজের আতঙ্ক' প্রবন্ধে ব্যাপাবটির সমর্থন করেছিলেন। প্রবন্ধটিতে তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন যে গোরক্ষা বা

* 'অপরপক্ষের কথা' 'সফলতার সদুপায়' 'পাবনা সম্মিলনীতে ভাষণ' প্রভৃতি দ্রঃ।

গোহত্যা নিয়ে সরকারের মাথাব্যথা তেমন নেই, যেমন আছে ঐ বিষয়টিকে কেন্দ্র ক'রে জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনায়। তা-ছাড়া তিনি লক্ষ্য করেছেন যে তখন থেকেই হিন্দু-মুসলিম ভ্রাতৃবিবোধ উদ্দীপিত ক'রে জাতীয় ভাবকে নষ্ট ক'রে দেওয়ার একটা ষড়যন্ত্রও এক শ্রেণীর ইংরেজ কর্মচারী করতে আরম্ভ করেছেন। এর তিন-চার বৎসর পরে তিলকের নেতৃত্বে শিবাজী-উৎসব প্রবর্তিত হয়। ঐ সময় পুনা-বোম্বাইয়ে প্লেগ আরম্ভ হওয়ায় প্লেগ-নিবোধক আইনের জবরদস্তি প্রয়োগে 'নেটিভ' নাগরিকদের উপর অত্যাচার আরম্ভ হয়। প্রতিবাদী নাটুভ্রাতাদের বিনা বিচারে কারারুদ্ধ করা হয় এবং পরে বিক্ষুব্ধ জনতা পুনায় প্লেগ-নিবোধক সমিতির সভাপতি র‍্যান্ড্ সাহেবকে হত্যা করলে পর এর জন্যে পরোক্ষভাবে তিলককে দোষী সাব্যস্ত ক'রে তাঁকে দেড় বছরের জন্য কারাদণ্ড দেওয়া হয়। ভারতে ইংরেজের দেওয়া এই প্রথম রাজনীতিক দণ্ড। রবীন্দ্রনাথ মহারাষ্ট্রের আন্দোলন ও পরিণামের প্রতিটি বিষয়েই খোঁজখবর রাখতেন এবং এই নিয়ে 'ভারতী' পত্রিকার প্রসঙ্গ-কথায় কয়েকটি প্রতিবাদমূলক সারগর্ভ আলোচনাও করেন ('সমূহ' দ্রঃ)। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি রাজা-প্রজা সম্পর্কের আরও নানান্ ব্যাপার নিয়ে কতদূর জাগ্রত এবং তাঁর বিচার বিশ্লেষণ কিরকম তীক্ষ্ণ ছিল তারও পরিচয় রয়েছে এই প্রসঙ্গ-কথাগুলিতে। কিন্তু এই সময়কার একটি উল্লেখ্য ঘটনা যা ইংরেজের ভারত-কল্যাণের ছদ্মবেশ অপহৃত করলে তা হ'ল দেশীয় সংবাদপত্রগুলির মুখ বন্ধ করার জন্য সিডিশন বিল প্রণয়ন। এ হ'ল ১৮৭৮ খ্রীঃ প্রবর্তিত ভার্নাকুলার প্রেস আইনের নবতন সংস্কার। এর প্রতিবাদে 'কণ্ঠরোধ' নামে প্রবন্ধ লিখে কবি টাউন হলের সভায় পাঠ করেন। প্রবন্ধটি পরে 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিতও হয়। প্রবন্ধটিতে অবশ্য ইংরেজশাসনের বিরুদ্ধে খুব প্রবল প্রতিবাদ তেমন দেখা যায় না। এতে শুধু শাসক ইংরেজের বিবেক জাগানোর একটা প্রয়াস ছিল এবং সম্ভবতঃ আমাদের জনমত জাগানো পরোক্ষ উদ্দেশ্য ছিল। 'কণ্ঠরোধে' রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য ছিল— প্রজাদের চিত্তবৃত্তি না জানতে পারাই রাজার পক্ষে সন্দেহ ও ভয়ের কারণ। এরকম ক্ষেত্রে অনর্থক ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়ে অল্প ব্যাপারও গুরুতর আকার ধারণ করে। অতএব সংবাদপত্রের মুখ বন্ধ না করাই রাজার পক্ষে নিরাপদ। তা ছাড়া কোনো অভিযোগের বিষয় প্রকাশিত হতে না দিলে প্রজার মনেও নানান্ জনরবে নানান্ সন্দেহ জেগে ওঠে এবং গোপনে রাজার প্রতি বিদ্বেষও সঞ্চারিত হয়। বলা বাহুল্য, প্রজাকল্যাণ ও ঔপনিবেশিক দমন-পীড়ন-নীতি পরস্পরবিরুদ্ধ। তবু রবীন্দ্রনাথ যে বিবেক-উজ্জীবনের প্রয়াস করলেন তার কারণ শাসক ইংরেজ চরিত্রের উপর শ্রদ্ধাবোধ নয়, সব জেনে শুনেও প্রায় শেষ পর্যন্ত তিনি হাল ছেড়ে দিতে চাননি ব'লে। লক্ষণীয় এই যে, তখনকার কংগ্রেস থেকেও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা-হরণে ইংরেজ শাসনের

শোচনীয় প্রতিশ্রুতি-ভঙ্গ হচ্ছে ব'লে দুঃখ জানানো হয়েছিল, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মত রাজা-প্রজা-সম্পর্কের মূল ধ'রে ব্যাপারটি বোঝানো হয়নি। আরও লক্ষণীয়, উক্ত প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ যা বিস্তৃত ক'রে বললেন, কয়েকমাস পূর্বে সিডিশন আইন বিলরূপে প্রস্তাবিত হওয়ার সময়ে লেখা 'গান্ধারীর আবেদন' কাব্য-নাট্যে দুর্যোধন-ধৃতরাষ্ট্র সংলাপের মধ্য দিয়ে সংক্ষেপে তা বিবৃত করেছেন—দুর্যোধনকে তিনি দাম্ভিক শক্তিমদমত্ত ও কতকটা সাম্রাজ্যলিপ্সু শাসক-গোষ্ঠীর প্রতিনিধিস্থানীয় ক'রে অঙ্কন করেছেন। ধৃতরাষ্ট্র যখন বললেন যে দুর্যোধন কৌশলে রাজ্য করায়ত্ত করায় প্রজারা নিন্দা করছে, তখন দুর্যোধন বললেন—

নিন্দারে করিব ধ্বংস কণ্ঠরুদ্ধ করি।
নিস্তব্ধ করিয়া দিব মুখরা নগরী
স্পর্ধিত রসনা তার দৃঢ় বলে চাপি
মোর পাদপীঠতলে।

এই অংশের প্রথম উক্তিতে সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ এবং দ্বিতীয় অংশে গোরা-সৈন্য দিয়ে সন্ত্রাস সৃষ্টি ক'রে বোম্বাই ও পুনার আন্দোলন দমন করার কাহিনী আভাসিত হয়েছে ব'লে মনে করা হয়। তা ছাড়া ধৃতরাষ্ট্রের 'নিন্দারে রসনা হতে দিলে নির্বাসন' প্রভৃতি উক্তির মর্মগত উপদেশ-বাক্যই 'কণ্ঠরোধ' প্রবন্ধে বিস্তৃত হয়েছে। এবং দুর্যোধন কর্তৃক প্রতাপসম্বল রাজশক্তির নিম্নোক্ত মহিমাগান প্রকারান্তরে শাসক ইংরেজের মনোভাবই ব্যক্ত করেছে—

অব্যক্ত নিন্দায়
কোনো ক্ষতি নাহি করে রাজমর্যাদায়,
ভ্রূক্ষেপ না করি তাহে। প্রীতি নাহি পাই
তাহে খেদ নাহি, কিন্তু স্পর্ধা নাহি চাই,
মহারাজ। * * আমি চাহি ভয়,
সেই মোর রাজপ্রাপ্য * * *

কবির কাব্যের সঙ্গে রাজনীতি-পর্যালোচকের চিন্তাধারার সংগতি লক্ষ্য করা গেল। এই প্রথমপর্বের ইংরেজ শাসনের খুঁটিনাটি নিয়ে তাঁর আলোচনা ভালো ক'রে লক্ষ্য করলে অন্ততঃ এটুকু বোঝা যায় যে রবীন্দ্রনাথ শাসন-সংবিধান বিষয়ে একালে অন্ততঃ প্রজাতন্ত্রের পক্ষপাতী।

রবীন্দ্রনাথ 'ভারতী'র সম্পাদকত্ব গ্রহণ করার প্রথম বৎসরের মধ্যেই (১৮৯৮) অসার রাজনীতিকদের এবং রাজসমাদরলোভী জমিদারদের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হন। এতদিনে রবীন্দ্রনাথ জমিদার ও জমিদারির আভ্যন্তরীণ ব্যাপার ভালোভাবে আয়ত্ত ক'রে

নিয়েছেন। স্থতরাং জমিদাব-সম্প্রদায় সম্বন্ধে তাঁর এখনকাব মন্তব্য মূল্যবান্ এবং তা আবও পবে লেখা 'বায়তের কথা'র আলোচনাব সঙ্গে মিলিয়ে দেখাব যোগ্য। জমিদাব বাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় 'পায়োনিয়ার' পত্রিকায দাবী করেছিলেন যে জমিদারেবাই দেশেব স্বাভাবসিদ্ধ নেতা এবং সেই নেতৃত্ব অনুযায়ী তাঁবাই সবকারেব কাছে দেশেব মানুষেব হয়ে আবেদন-নিবেদনেব প্রকৃত অধিকাবী। রবীন্দ্রনাথ তাঁব প্রবন্ধে বুঝিয়ে দিলেন যে এখনকাব জমিদারেরা সবকাবি খাজনা আদায়ের কর্মচারী মাত্র। তাঁরা একান্তভাবেই সবকারের খযের-খাঁ, দেশেব কিছুই না। কাবণ, তাঁরা পূর্বে-কাব জমিদাবদেব মত প্রজাদেব মঙ্গলেব জন্য পুষ্কবিণী-খনন, পথ-নির্মাণ, শিক্ষার ব্যবস্থা প্রভৃতি কিছুই কবেন না, সমাজের সঙ্গে তাঁদেব যোগই নাই। তাঁবা চান জমিদাবিটুকু বজায বাখাব জন্য সবকাবি কৃপা এবং খেতাবের মর্যাদা। "ইহাবা নিজ গৌরবেও উচ্চ নহেন, সর্বসাধাবণেব সহিত ঐক্যেব দ্বাবাও বলিষ্ঠ নহেন। ইহারা বিলাতের লর্ডদেব ন্যায স্বতন্ত্র নহেন, বিলাতেব জননাযকদেব ন্যায প্রবলও নহেন। ইহাবা বনস্পতিব ন্যায বিচ্ছিন্ন বৃহৎ নহেন, ওষধিব মতো ব্যাপ্ত বিস্তৃতও নহেন, ইহাবা কুষ্মাণ্ডলতাব ন্যায একমাত্র গবর্নমেণ্টেব আশ্রয়যষ্টি বাহিয়া উন্নতিব পথে চলিতে চাহেন"। স্থতবাং জমিদাবদেব নেতৃত্বেব কথা উঠতেই পাবে না। কিন্তু তাই ব'লে ববীন্দ্রনাথ কেবল সভাসমিতিতে বক্তৃতা দিযে পোলিটিক্যাল এজিটেশন কবছেন এমন বাজনীতিকদেরও নেতা ব'লে স্বীকাব কবলেন না। কাবণ, তাঁদেব ভাষা ইংবেজি, শিক্ষা ইংবেজিতে। তাঁবা অশিক্ষিত দেশবাসী থেকে ভিন্ন শ্রেণীব—"ইংবেজ-কবতালিব এলাকাব বাহিবে যাঁহাদেব কর্তব্যবুদ্ধি পদনিক্ষেপ কবে না" "ইংরেজ বাহু কর্তৃক জমিদারদেব যদি অর্ধগ্রাস হইযা থাকে, ইহাদেব একেবাবে পূর্ণগ্রাস"। 'আলট্রা কন্সার্ভেটিভ' প্রবন্ধে তিনি দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়েব উপব প্রাধান্যেব বায়নাদাব, পার্মানেণ্ট সেট্‌লমেণ্টেব খুঁটোয বাঁধা, নিশ্চিন্তে রোমন্থনশীল জমিদাবদেব ইংরেজ-তোষণ নীতিকে বিদ্রূপে জর্জবিত কবেছেন। আমবা পবে দেখব রবীন্দ্রনাথ সাময়িক নানা কারণে জমিদাবি প্রথাব ঠিক উচ্ছেদ চান না, জমিদারদেব সমাজ-শাসনেব অন্তর্ভুক্ত দেখতে চান।

ববীন্দ্র-চিত্তেব এই প্রথম পর্বেব প্রকাশেব মধ্যে তাঁব অতিপ্রবল স্বাদেশিকতার সঙ্গে সহজেই আর একটি প্রবৃত্তি এসে সংযুক্ত হযেছিল, তা হ'ল কবির প্রাচীন জীবনধর্ম ও প্রাচ্য জাতীয়তাবোধেব প্রতি অনুরাগ। তিনি ইং ১৯০১ খ্রীঃ নবপর্যায বঙ্গদর্শনেব সম্পাদকত্ব গ্রহণ ক'বেই এর পৃষ্ঠাগুলি ঐ প্রাচীন-অনুগত জাতীয়ভাবে পূর্ণ ক'বে তুলতে লাগলেন। ঐ সময়ে শান্তিনিকেতনে 'ব্রহ্মবিদ্যালয়ে'রও প্রবর্তন। আর সাবা ভাবতে স্বামী বিবেকানন্দের ধর্মমূলক জাতীয়তাব চিন্তার প্রভাব, যা থেকে ববীন্দ্রনাথও বিচ্ছিন্ন থাকতে পাবেন নি। যাই হোক, হিন্দুধর্ম-সম্পর্কে কবির বিশিষ্ট

মনোভাব (যা মধ্যযুগ থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত প্রবাহিত সংস্কার ও প্রথায় সমাচ্ছন্ন সংকীর্ণ হিন্দুতা থেকে পৃথক্) এই জাতীযতাবোধকে ভিন্নদিকে আবও প্রগাঢ় ক'বে তোলে। কেবল সমাজনীতিক বাজনীতিক প্রবন্ধেই নয, কবিতা এবং গানেও এই নোতুন ভাবুকতার প্রকাশ। এই ভাবুকতার ব্যাপ্তি অন্ততঃ ১৯১০-১১ পর্যন্ত এবং আমাদেব অধ্যয়নে এই জাতীয়তা বা প্রাচীন হিন্দু সামাজিকতাব ভূমিতে সঞ্চবণেব সূত্রেই তাঁর সর্বাধুনিক সমাজদর্শন—'স্বদেশী সমাজ' সংগঠনেব পবিকল্পনার জন্ম। ১৯০৪ এব ভাবী বঙ্গচ্ছেদের জল্পনা হয়ত তাঁকে নোতুন ক'বে এই সমাজ-চিন্তায় প্রবর্তিত কবেছিল, কিন্তু এর সূত্র খুঁজতে হবে তাঁব চিত্তে নবজাগ্রত প্রাচীনজীবনধর্ম-বোধে। তাঁব আধুনিক স্বদেশী সমাজে তাঁব প্রাচীন সমাজবোধেব প্রভাব যথেষ্ট। মনে বাখতে হবে রবীন্দ্রনাথেব এক অংশ সামাজিক এবং কর্মী হলেও অন্য অংশ, হয়তো বা বৃহত্তব অংশ বিশুদ্ধ সাহিত্যিক। সেজন্য একালে সাহিত্যে এই প্রবল জাতীয়তা-বোধেব সঞ্চারেব মধ্যেও 'ক্ষণিকা' কাব্যেব মত বিশুদ্ধ সাহিত্যিক লিবিক, 'চিবকুমাব-সভা'ব মতো বিশুদ্ধ হাস্যবস এবং 'চোখেব বালি'ব মত প্রণয়পবীক্ষামূলক উপন্যাস প্রভৃতি বচনা সম্ভব হযেছে। বলা বাহুল্য, পূর্বাপবও এবকমই হযেছে। আমবা এই পুস্তিকায প্রযোজনবশে সাহিত্যেব সেই সব অংশ নিযেই আলোচনা কবছি যেগুলি নানাবীতিতে তাঁব সমাজ-ভাবুকতাব সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পবোক্ষে সংসক্ত।

কবিব ধর্মচেতনা-মিশ্র জাতীয়ভাব যা ১৯০১ সালেব কাছাকাছি স্পষ্ট মূর্তি গ্রহণ কবেছে ব্রহ্মবিদ্যালয স্থাপনে, 'নৈবেদ্য' বচনায ও 'স্বদেশ' বা 'প্রাচীন সাহিত্যে'ব প্রবন্ধমালায, তাব ভূমিকা বয়েছে পূর্বেকাব কাব্যপ্রেরণাব মধ্যেই—'চৈতালি'তে, 'কল্পনা'য়, 'কথা' ও 'কাহিনী'তে। এর থেকে এই প্রমাণ হয় যে তাঁর প্রাচীন-অনুবর্তিতা কাব্যকল্পনাব সঙ্গেই মৌলভাবে সংযুক্ত, প্রাবন্ধিক বিচাব-বিশ্লেষণেব মধ্যে এবই বিস্তাব-রূপ পবে পাওয়া যাচ্ছে। 'চৈতালি' কাব্যে (১৮৯৫-৯৬) কবি যখন কালিদাস এবং তপোবন-আদর্শেব মহিমা প্রকাশ কবছেন এবং 'কল্পনা' প্রভৃতিতে প্রাচীনেব জীবন ও সৌন্দর্য সম্বন্ধে বিস্ময় প্রকাশ করছেন তখন তিনি 'ভারতী' 'প্রদীপ' প্রভৃতি পত্রিকায শিক্ষিতদেব ইংবেজ সম্পর্কেব বীতি, ইংরেজের শাসনব্যবস্থা বিচারব্যবস্থাব সমালোচনাতেই মুখ্যতঃ নিবত। কাব্যকল্পনায় বা আদর্শভাবুক চিত্তে প্রথম যে প্রেরণা পেলেন তাকে মননেব বশীভূত ক'বে প্রবন্ধ বচনায সমগ্রভাবে দেখলেন আরও কিছু পবে, ১৯০১-২ থেকে আবম্ভ ক'বে। চৈতালি ও কল্পনা কাব্যেব জাতীয়তাবাদী অথচ প্রাচীনভাবমূলক ধর্মমিশ্র কবিতাগুলি এই : সভ্যতাব প্রতি, বন, তপোবন, প্রাচীন ভাবত, বঙ্গমাতা, দুই উপমা, অভিমান, পরবেশ (চৈতালি), বঙ্গলক্ষ্মী, শবৎ, মাতাব আহ্বান, 'ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ, হতভাগ্যেব গান, সে আমার জননী

রে, ভারতলক্ষ্মী, উন্নতি-লক্ষণ, জন্মদিনের গান (কল্পনা)। এর মধ্যে পরবেশ, ভিক্ষায়াং নৈব নৈব প্রভৃতির কাব্যার্থের সঙ্গে যদিচ পূর্বে আলোচিত প্রবন্ধসমূহেব বক্তব্যেব সংগতি সর্বত্র, তবু—তপোবন, প্রাচীন ভাবত, সভ্যতাব প্রতি প্রভৃতি কবিতাব সঙ্গে পরবর্তী ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদী প্রবন্ধসমূহেব ভাবসামঞ্জস্য বেশি। কথা-কাব্যেও ইতিহাস অর্ধ-ইতিবৃত্ত নিযে ঐতিহ্য-আশ্রিত জাতীয়তাব প্রকাশ। সে যাই হোক, ব্রহ্মবিদ্যালয প্রারম্ভের সময থেকে ধর্ম নিয়ে সমাজ নিযে ইতিহাস নিযে প্রাচীন সহ আধুনিক ভাবতেব মিলরেখে একটা সামগ্রিক জাতীযতাব গঠনপর্ব একালেব। আবাব একালেই তাঁব নবসমাজভাবুকতা—গ্রামকেন্দ্রিক স্বায়ত্তশাসনেব মধ্য দিয়ে প্রকৃত স্বাধীনতা অর্জনেব উদ্যোগ।

এই জাতীযতাব কাব্যেব মধ্যে লক্ষণীয প্রকাশ হ'ল 'নৈবেদ্য'। নৈবেদ্যে কবিব কল্পিত প্রভু বা ঈশ্বরকেও এই জাতীযতাব সঙ্গী কবা হযেছে। একটু লক্ষ্য করলে সাধাবণ পাঠকও বুঝবেন যে মানুষেব দৈনন্দিন কর্মব্যস্ততা, জাতিব পতন-উত্থান, বাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি—যাবতীয জীবন-কোলাহলেব সঙ্গে এই ঈশ্বব একাত্ম। সমস্ত সৃষ্টি—নিসর্গ এবং মানুষ নিয়ে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তাঁবই আসন। সুতরাং তিনি ভালোমন্দ পাপপুণ্য মিলন-বিদ্বেষ সব কিছুব সঙ্গে ব্যাপ্ত মিশ্রিত—এবই মাঝে তাঁব নীবব আসন। এ থেকে পৃথক ক'বে কবি তাঁকে দেখেন না। যেমন—

মধ্যাহ্নে নগবমাঝে পথ হতে পথে
কর্মবন্যা ধায যবে উচ্ছলিত স্রোতে
শত শাখা-প্রশাখায়, নগবের নাড়ী
উঠে স্ফীত তপ্ত হয়ে, নাচে সে আছাড়ি
পাষাণ ভিত্তির 'পবে—চৌদিকে আকুলি
ধায পান্থ, ছুটে বথ, উড়ে শুষ্ক ধূলি—
তখন সহসা হেবি মুদিয়া নযন
মহাজনারণ্য-মাঝে অনন্ত নির্জন
তোমাব আসনখানি—কোলাহল-মাঝে
তোমাব নিঃশব্দ সভা নিস্তব্ধে বিবাজে।
সব দুঃখে, সব সুখে, সব ঘবে ঘবে,
সবচিত্তে সব চিন্তা সব চেষ্টা 'পবে
যতদূব দৃষ্টি যায় শুধু যায দেখা
হে সঙ্গবিহীন দেব, তুমি বসি একা!

রবীন্দ্রনাথের এই ঈশ্বর একটি 'আইডিয়া' মাত্র, ভারতের পক্ষে ইতিহাস-পথচারী শক্তি, ভারতভাগ্যবিধাতা। এই জন্য রবীন্দ্র-ঈশ্বর ও নৈবেদ্যের জাতীয়তা-বোধ একত্র মিলিত হয়ে পড়েছে। আমরা বলি, কবি তাঁর নব-আবির্ভূত প্রাচীন ভারতপ্রীতি এবং ধর্মনীতিক জাতীয়তাবোধের দ্বারা উদ্দীপিত হয়েই আনুষঙ্গিকভাবে ঐ Absolute Idea বা Absolute Spirit বিষয়ে অনুমান করেছেন। ঈশ্বরকে আগে নিরীক্ষণ ক'রে পশ্চাৎ তদনুযায়ী ভাবতীয়তা গঠন করেন নি। কবি-মনস্তত্ত্বে এরকম হওয়াই সমীচীন এবং তাঁর ঈশ্বর তাঁর বিশিষ্ট জীবনবোধ এবং জাতীয়তাবোধের অধীন। সুতরাং 'নৈবেদ্য' রচনার প্রেরণা হ'ল বিশিষ্ট জীবনবোধ, ঈশ্বরভাবুকতা নয়। এই জন্য নৈবেদ্যের কবিতানিচয়ের মধ্যে জীবনের আদর্শের পরিচয় এত বেশি ফুটেছে। তা ছাড়া দেখতে হবে, খেয়া-গীতাঞ্জলির মত নৈবেদ্যের কয়েকটি কবিতায়ও কবি নিসর্গ-অনুভবের বিস্ময় থেকেই তাঁর বিশিষ্ট ঈশ্বর অনুভবে এসেছেন।* ফলে কোনো রচনাকে ভক্তিভাবমূলক যে-অর্থে আমরা ব'লে থাকি, নৈবেদ্য প্রভৃতি সম্পর্কে সেরকম অর্থ করা যায় না। তবু উল্লিখিত আইডিয়াতে আবিষ্ট কবির পরে ঐ আইডিয়া সম্পর্কে উপাস্য-উপাসক মনোভাব সৃষ্টি হওয়া বিচিত্র নয়।

নৈবেদ্যের এই প্রাচীন ও ধর্মীয় জীবনাদর্শের সঙ্গে কবির লেখা আত্মশক্তি, সমূহ, রাজা-প্রজা এবং স্বদেশ পুস্তকের বহু প্রবন্ধের ঘনিষ্ঠ যোগ লক্ষণীয়। এখন রবীন্দ্রনাথ রাজনীতির সঙ্গে ধর্ম মিশিয়েছেন এবং কতকটা প্রাচীনের বর্ণাশ্রম ধর্মেরও পক্ষপাতী হয়ে উঠেছেন যেন। এই ধর্মীয়তা এবং প্রাচীন সমাজব্যবস্থার প্রতি পক্ষপাত 'স্বদেশ'-এর 'নববর্ষ' 'ব্রাহ্মণ' 'সমাজভেদ' প্রভৃতি প্রবন্ধে বিশেষভাবে লক্ষণীয়। কিন্তু এর স্পর্শে 'সফলতার সদুপায়' 'ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ' 'রাজভক্তি' প্রভৃতি আধুনিক রাজ-নীতি-সমাজনীতি বিষয়ক প্রবন্ধও প্রাচীন ভাবে অনুরঞ্জিত হয়েছে। এমন কি বিস্ময় লাগে যে 'পথ ও পাথেয়'-এর মত হিংসাত্মক বিপ্লবী রাজনীতির অসমর্থনমূলক প্রবন্ধে বা হিন্দু-মুসলিম বিরোধ বিষয়ে পথনির্দেশমূলক 'সমস্যা' প্রবন্ধেও ধর্মবোধকে তিনি অন্যতম সাক্ষ্যরূপে হাজির করেছেন। এসব বিষয়ে তিনি পরবর্তী কালেও বেশ কিছু প্রবন্ধ ও ভাষণ রচনা করেছেন, কিন্তু সেসব ক্ষেত্রে ('কালান্তর' দ্রষ্টব্য) বাস্তব প্রতিকারের সঙ্গে ধর্মীয় প্রতিকার মিশিয়ে ফেলেন নি। বস্তুতই একালে তাঁর মন জুড়ে বসেছিল তাঁরই বিশিষ্ট অধ্যয়নের প্রাচীন ভারতের সমাজধর্ম। তাঁর একালকার সাহিত্যবিষয়ক সমালোচনাতেও তাই প্রাচীনের সমাজধর্মের প্রভাব অনিবার্যভাবে পড়েছে ('প্রাচীন সাহিত্য' দ্রষ্টব্য)। আমরা পূর্বেই বলেছি যে সংস্কৃত সাহিত্য তাঁকে প্রথম প্রাচীন ভারতীয় জীবনের ও সমাজের মধ্যে প্রবেশ করায়, আর ঠিক এই সময়

* এসব বিষয় নিয়ে পূর্বেকার বহু আলোচনায় আমরা সাধ্যমত বাক্যব্যয় করেছি।

তিনি উপনিষদ্‌গুলি ভালো ক'রে অধিগত ক'রে নেন। 'ব্রহ্মমন্ত্র' এবং 'ঔপনিষদ ব্রহ্ম' রচনা থেকেই তা বোঝা যায়। তার উপর এই সময়েই স্বামী বিবেকানন্দের ধর্মভাব-মূলক জাতীয়তার প্রভাবও তাঁকে স্পর্শ করে। ফলে একটানা দশ-বারো বৎসর ধ'রে জাতীয়তার দিক দিয়ে সামগ্রিক এবং অতিমাত্রায় স্বাদেশিক হয়ে কিছুটা রক্ষণশীল মনোভাবের পরিচয়ও তাঁকে দিতে হয়েছে। 'বিরোধমূলক আদর্শ' প্রবন্ধে য়ুরোপের রাষ্ট্রস্বার্থের সঙ্গে জড়িত জাতিবিদ্বেষের আলোচনা-প্রসঙ্গে ভারতীয় ধর্মনীতির প্রসঙ্গ লেখক তুলেছেন এবং সম্ভবতঃ ব্যক্তিগত ধর্মাচরণের উপদেশকে দেশগত মহিমা দিতে চেয়েছেন, যেমন—

> "আত্মরক্ষাই মানুষের অথবা লোকসম্প্রদায়ের সর্বোচ্চ ধর্ম নহে। ধর্মে যদি নাশ করে তবে তাহাতেই মাথা পাতিয়া দিতে হইবে।····· কেবলমাত্র প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যভিচারেই যে ধ্রুব মৃত্যু তাহা নহে, ধর্মনিয়মের ব্যভিচারেও ধ্রুব বিনাশ। ধর্মনীতিক নিয়মের অমোঘত্বে য়ুরোপ শ্রদ্ধা হারাইতেছে দেখিয়া আমরাও যেন না হারাইয়া বসি।··আগে আমার নেশন, তার পরে বাকি আর সমস্ত কিছু, এই স্পর্ধা সমস্ত বিশ্ববিধানের প্রতি ভ্রূকুটিকুটিল কটাক্ষ নিক্ষেপ করিতেছে। তাহার প্রলয় পরিণাম যদি-বা বিলম্বে আসে, তথাপি তাহা যে কিরূপ নিঃসন্দেহ, কিরূপ সুনিশ্চিত, তাহা আর্যঋষি দৃঢ়কণ্ঠে বলিয়া গিয়াছেন—"

স্বল্প-সময়ের ব্যবধানে লেখা 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা' প্রবন্ধেও য়ুরোপের রাষ্ট্র-স্বার্থের তুলনায় ভারতের ঐহিকতা-বিমুখ জীবননীতিকেই কাম্য ব'লে বিবেচনা করা হয়েছে—

> "রিপুর বন্ধনই প্রধান বন্ধন—তাহা ছেদন করিতে পারিলে রাজা-মহারাজার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পদ লাভ করি। আমাদের গৃহস্থের কর্তব্যের মধ্যে সমস্ত জগতের প্রতি কর্তব্য জড়িত রহিয়াছে। আমরা গৃহের মধ্যেই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড ও ব্রহ্মাণ্ডপতির প্রতিষ্ঠা করিয়াছি। আমাদের সর্বপ্রধান কর্তব্যের আদর্শ একটি মন্ত্রেই রহিয়াছে—
>
> ব্রহ্মনিষ্ঠো গৃহস্থঃ স্যাৎ তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণঃ।
> যদ্‌যৎ কর্ম প্রকুর্বীত তদ্‌ ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ॥"

য়ুরোপের যে উগ্র জাতীয় স্বার্থবাদ বা ন্যাশ্‌ন্যালিজম্‌ নিয়ে রবীন্দ্রনাথ পরে ভাষণে ও প্রবন্ধে অজস্র বাক্যব্যয় করেছেন (মহাযুদ্ধের মধ্যে জাপান ও আমেরিকা ভ্রমণের সময়), তার সূত্র এই সময়েই, জাতীয় আদর্শ ও য়ুরোপের আদর্শের তুলনার মধ্যে। যেমন—

"য়ুবোপীয় সভ্যতাকে দেশে দেশে খণ্ডিত কবিয়া দেখিলে অন্য সকল বিষয়েই তাহাব স্বাতন্ত্র্য ও বৈচিত্র্য দেখা যায, কেবল একটা বিষয়ে তাহাব ঐক্য দেখিতে পাই। তাহা রাষ্ট্রীয় স্বার্থ।····· জাতিবক্ষা আমাদেব যেমন একটা গভীব সংস্কাবেব মতো হইযা গেছে, বাষ্ট্রীয় স্বার্থবক্ষা য়ুবোপের সর্বসাধাবণেব তেমনি একটি অন্তর্নিহিত সংস্কাব। ···স্বার্থেব প্রকৃতিই বিবোধ। য়ুবোপীয সভ্যতাব সীমায় সীমায সেই বিবোধ উত্তবোত্তব কণ্টকিত হইয়া উঠিতেছে। পৃথিবী লইযা ঠেলাঠেলি কাডাকাডি পডিবে তাহার পূর্বস্থচনা দেখা যাইতেছে। ইহাও দেখিতেছি, য়ুবোপেব এই বাষ্ট্রীয স্বার্থপবতা ধর্মকে প্রকাশ্যভাবে অবজ্ঞা কবিতে আবম্ভ কবিয়াছে। 'জোব যাব মুলুক তাব' এ নীতি স্বীকাব কবিতে আব লজ্জা বোধ কবিতেছে না।

নেশন্ শব্দ আমাদেব ভাষায নাই, আমাদেব দেশে ছিল না। সম্প্রতি য়ুবোপীয শিক্ষাগুণে ন্যাশনাল মহত্ত্বকে আমবা অত্যধিক আদর দিতে শিখিয়াছি। অথচ তাহাব আদর্শ আমাদেব অন্তঃকবণেব মধ্যে নাই। আমাদেব ইতিহাস, আমাদেব ধর্ম, আমাদেব সমাজ, আমাদেব গৃহ, কিছুই নেশন্ গঠনেব প্রাধান্য স্বীকাব কবে না।"

ঠিক এই সময়েই লেখা 'নেশন' প্রবন্ধ রচনাব অবকাশেই বোধ হয ('আত্মশক্তি' দ্রষ্টব্য) রবীন্দ্রনাথ য়ুবোপীয বাষ্ট্রগুলিব নিতান্ত স্বার্থপব কলহ-স্বভাবেব বিষযে প্রথম বিচাবে নিবত হন। এব পূর্বেকাব অনুভবে ছিল উপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ। এখন যেন ঐ সাম্রাজ্যবাদেব মূল অনুসন্ধানেব প্রযাস, অবশ্য নীতিব দিক থেকে। এ বিষয়ে কবিব চেতনা স্ফুবিত হয ভাবতীয ভাবাদর্শেব উপব অনুবাগ জন্মানোব ফলে। ভাবতবর্ষীয সমাজকে দেখতে গিযে তিনি এব বিপবীতেব দিকে স্বভাবতই দৃষ্টি নিক্ষেপ কবলেন। দেখা যায, দক্ষিণ আফ্রিকাব বুয়ব যুদ্ধের প্রাবম্ভেই কবি সাম্রাজ্য-লিপ্সাব সঙ্গে বিজডিত উগ্র বাষ্ট্রস্বার্থেব ব্যাপাবটি প্রত্যক্ষ অনুভব কবেছেন—

"স্বার্থে স্বার্থে বেধেছে সংঘাত, লোভে লোভে
ঘটেছে সংগ্রাম—প্রলযমন্থনক্ষোভে
ভদ্রবেশী বর্ববতা উঠিযাছে জাগি
পঙ্কশয্যা হতে। লজ্জা-শবম তেয়াগি
জাতিপ্রেম নাম ধরি' প্রচণ্ড অন্যায
ধর্মেবে ভাসাতে চাহে বলেব বন্যায়।

কবিব এখনকাব দৃষ্টিতে সমাজ এবং ধর্ম হ'ল ভাবতীয় ভাব, য়ুবোপে এব বিপরীত। য়ুরোপীয় রাষ্ট্রিকতাব চেয়ে ভাবতীয় সামাজিকতা বরণীয়। তাঁর এই দৃষ্টিকোণ

যুদ্ধোত্তর ন্যাশ্‌নালিজম্ সম্বন্ধে ভাষণে প্রসাবিত হয়েছে, যেহেতু তাঁর আশা ছিল, মহাযুদ্ধ থেকে য়ুরোপ শিক্ষা পেয়ে প্রাচ্যের ধর্মভাবেব অভিমুখী কতকটা হতেও পাবে। তিনি যুবোপেব জাতীযতা বা বাষ্ট্রীয়তাকে সামগ্রিক ভাব নিযে প্রত্যক্ষ কবেছিলেন, এব সূক্ষ্মবিচাবে অর্থাৎ বাজনীতি-অর্থনীতিব বিশ্লেষণে তেমন প্রবৃত্ত হননি। সে হযত বা তাঁব স্বভাব ও ক্ষমতাব বাইবে ছিল। তবু এই সমগ্রদৃষ্টিতে উপনিবেশ-সাম্রাজ্যবাদ, রাষ্ট্রস্বার্থ-যান্ত্রিকতাব যে-ছবি তিনি দেখেছিলেন তা আব কোনো ভাবতীয তখন দেখেন নি। এবং মোটের উপব ধর্ম নিযে কথা বললেও বাস্তবতা ববীন্দ্রনাথ একেবাবে বর্জন কবেন নি। যেমন 'ধর্মেব সবল আদর্শ' (১৯০১—'ধর্ম' পুস্তিকা) প্রবন্ধে—

> "জগতেব মধ্যে অদ্য দারুণ দুর্যোগেব দুর্দিন উপস্থিত হইযাছে, চারিদিকে যুদ্ধভেবী বাজিযা উঠিয়াছে, বাণিজ্যবথ দুর্বলকে ধূলিব সহিত দলন কবিযা ঘর্ঘরশব্দে চাবিদিকে ধাবিত হইতেছে, স্বার্থেব ঝঞ্ঝাবাযু প্রলযগর্জনে চাবিদিকে পাক খাইয়া ফিবিতেছে—হে বিধাতঃ, পৃথিবীর লোক আজ তোমাব সিংহাসন শূন্য মনে কবিতেছে···একদিন নানা দুঃখ ও আঘাতে বৃহৎ শ্মশানেব মধ্যে এই দুর্যোগেব নিবৃত্তি হইবে—তখন যদি মানবসমাজ এই কথা বলে যে, শক্তিব পূজা, ক্ষমতাব মত্ততা, স্বার্থেব দারুণ দুশ্চেষ্টা যখন প্রবলতম, মোহান্ধকাব যখন ঘনীভূত এবং দলবদ্ধ ক্ষুধিত আত্মম্ভবিতা যখন পূর্বে-পশ্চিমে উত্তরে-দক্ষিণে গর্জন কবিযা ফিবিতেছিল, তখনও ভাবতবর্ষ আপন ধর্ম হাবায নাই···।"

ভাবত ও যুবোপেব ভাব-পার্থক্যেব ধাবণা কবিকে নোতুন ক'বে ভাবতবর্ষেব ইতিহাস জিজ্ঞাসায প্রবৃত্ত কবেছে। 'ভাবতবর্ষেব ইতিহাস' তাঁব একালেব একটি মূল্যবান্ প্রবন্ধ। এব মধ্যে তিনি যুবোপীয ধাঁচেব বাষ্ট্রনীতিক ইতিহাসকে ইতিহাসেব মর্যাদা দেননি, সমাজজীবন এবং ধর্মানুগত মানসিক সম্পদেব পবিবর্তনধাবাকেই ইতিহাস ব'লে অভিহিত কবেছেন। তাঁর মতে ভারতবর্ষেব এই ইতিহাসধাবা যেমন পবিস্ফুট, তেমনি গৌববের। যুরোপেব ইতিহাস রাষ্ট্রিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার, ভারতের সামাজিক মিলনের। বাজাদের উত্থান-পতনেব ইতিবৃত্ত ভাবতের ইতিহাস নয, যুরোপেব হতে পাবে, ভারতে রাজশক্তির সঙ্গে প্রজাশক্তিব সম্পর্ক সেবকম নিবিড নয়। ভাবতেব এই সমাজ-জীবনের ইতিহাস ছড়িয়ে রযেছে রামায়ণ, মহাভাবত, পুবাণ, সাহিত্যে ও মহাপুরুষদেব জীবনে। আর্য-অনার্য, হিন্দু-মুসলমান, নানান্ জাতি ও ভাষাভাষীদেব মধ্যে ঐক্যমূলক মিলনপ্রয়াসের মধ্যে। যুরোপেব মিলন রাষ্ট্রনীতি-গত, সেখানে মতে না মিললে এক দল অন্যদলেব সঙ্গে চিবন্তন বিবোধে লিপ্ত হয়, রাষ্ট্রিক স্বার্থবক্ষাব

প্রয়োজনে এক রাষ্ট্রের প্রজার সঙ্গে ভিন্ন রাষ্ট্রের প্রজার কলহের ইতিহাসই য়ুরোপের ইতিহাস। ভারতের সমাজচিন্তায় মানব-সংঘাত এবং সামঞ্জস্য কিভাবে ভারতের প্রকৃত ইতিহাসরূপে অবস্থান করছে তার বিশ্লেষণ আরও বিস্তৃতভাবে তিনি পর পর প্রবন্ধে এবং আলোচনায় কিছুকাল ধ'রে দিয়েই চলেছেন। উৎসুক পাঠক এর বিবরণ নিশ্চয়ই দেখেছেন তাঁর ইতিহাস এবং বিশেষভাবে পরিচয় পুস্তিকায়। ভারতবর্ষ আর্য-অনার্য শকহুন-মোগলপাঠানের সম্মিলিত ঐক্যমূলক ভাবের দেশ এই কথাটিই তিনি নানাভাবে প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন এবং তখনকার দিনে এটি নিতান্ত নূতন কথাই। কিন্তু তিনি ভাবের কথাটিকে কেবল ভাবের দ্বারাই, যেমন 'ভারত-তীর্থ' কবিতার সাহায্যেই প্রতিপন্ন ক'রে ক্ষান্ত হন নি। প্রাচীন ও মধ্যযুগের ইতিহাস বিশ্লেষণ করেছেন, আর্য-অনার্য ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ-বৌদ্ধের দ্বান্দ্বিকতার একটি চিত্র নিজ উপলব্ধিমতে তুলে ধরেছেন। এইভাবে ভারত-ইতিহাসের সারকথা তুলে ধরার প্রবৃত্তি পরিস্ফুট হয়েছে "ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা" প্রবন্ধে। এর মধ্যে তিনি রামায়ণ ও মহাভারতে বর্ণিত কয়েকটি ব্যাপারের যে ব্যাখ্যা সন্নিবেশ করেছেন, পাঠক তার সঙ্গে সর্বত্র একমত না হতে পারলেও ব্রাহ্মণ্য-বাহিত আর্যসংস্কৃতি যে অনার্য-সভ্যতার অনেক কিছুই স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে বা আত্মসাৎ ক'রেই নিজকে রক্ষা করেছে এবিষয়ে আজ আর নিশ্চয়ই বিতর্ক অনুভব করেন না। রবীন্দ্রনাথের মতে ব্রাহ্মণ্য-যুগ এবং বৌদ্ধযুগের সমাজবিপ্লবকে হিন্দুধর্ম স্বীকার ক'রে নিয়েই আত্মরক্ষা করেছে, যদিও বৌদ্ধ-পরবর্তী আত্মরক্ষা আত্মসংকোচনে এবং জাতিবর্ণবিদ্বেষে পরিণত হয়েছে। হিন্দুধর্ম বা ভারতধর্মের এই পরবর্তী অধ্যায়টিই কলঙ্কের, কারণ এই পর্বেই উদারতা ও গতিশীলতার তিরোধান, রীতিনীতির বিধি-বিধানের কঠোরতা, জাতিবর্ণ-বিভাগের আবর্জনা পুঞ্জীভূত হবার সময়। মন্বাদি শাস্ত্র প্রবর্তনের পর থেকে বিভেদ-কেন্দ্রিক প্রথা ও আচারের অন্ধ দাসত্বের যে ধর্মতন্ত্র ভারতে চলল তাকে হিন্দুধর্ম বলতে রবীন্দ্রনাথ নারাজ। বৈদিক যুগ থেকে আরম্ভ ক'রে রামায়ণ-মহাভারত পার হয়ে বৌদ্ধযুগ পর্যন্ত বিচিত্র সংঘাতের মধ্য দিয়ে আর্য-অনার্য, ব্রাহ্মণ-শূদ্রের মিলন-মিশ্রণের প্রয়াস যে সামাজিক জীবনধর্ম সম্ভব করেছিল তা-ই আর্যধর্ম, ভারতধর্ম এবং প্রকৃত হিন্দুধর্ম। হিন্দুধর্ম যে নিতান্ত আচারসর্বস্ব বিকৃত এবং দুর্বল হয়ে পড়েছিল তার প্রমাণ স্বরূপ তিনি দেখিয়েছেন যে ইসলাম ধর্মের ভারতে অনুপ্রবেশ এবং নিশ্চিত প্রতিষ্ঠার পর তাকে নিজের মধ্যে স্থান ক'রে দেওয়ার কোনো প্রয়াস আত্ম-সংকুচিত ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রকারদের থেকে আসেনি। এসেছিল কবীর নানক চৈতন্য প্রভৃতি ভাবসাধকদের কাছ থেকে। আর আধুনিক যুগে রামমোহন এর পথিকৃৎ। এ থেকে রবীন্দ্রনাথ অনুমান করেছেন যে এই মহাজাতির গতিশীলতা কালক্রমে অবরুদ্ধ হয়ে

পড়েছিল মাত্র, এবং আশা প্রকাশ করেছেন যে প্রাচীনের আর্য-অনার্য ব্রাহ্মণ-শূদ্রের মিশ্রণের মত হিন্দু-মুসলমানের মিশ্রণও আধুনিক ভারতে সুনিশ্চিত। 'ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা' প্রবন্ধের কিছু পূর্বে লেখা 'ভারততীর্থ' কবিতার মধ্যে কবির যে স্বপ্ন ব্যক্ত হয়েছে তার মূলে কবির এই ইতিহাস-দর্শনই কাজ করেছে। আশাবাদী কবি তাঁর প্রবন্ধে বলছেন—"সেই মধ্যযুগে পরে পরে বারবার সেইরূপ গুরুরই অভ্যুদয় ঘটিয়াছে—তাঁহাদের একমাত্র চেষ্টা এই ছিল, যাহা বোঝা হইয়া উঠিয়াছে তাহাকেই সোজা করিয়া তোলা। ইঁহারাই লোকাচার, শাস্ত্রবিধি ও সমস্ত চিরাভ্যাসের রুদ্ধ দ্বারে করাঘাত করিয়া সত্য ভারতকে তাহার বাহ্য বেষ্টনের অন্তঃপুরে জাগাইয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন। সেই যুগের এখনও অবসান হয় নাই, সেই চেষ্টা এখনও চলিতেছে। এই চেষ্টাকে কেহ রোধ করিতে পারিবে না।…"

১৯০১ থেকে রবীন্দ্রনাথের ভাবনায় ধর্মের অনুপ্রবেশ এবং প্রভাবের অধ্যায় সম্পর্কে আমরা বলছিলাম। শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মবিদ্যালয় প্রবর্তন এবং ব্রাহ্মণ-শূদ্রের পঙ্‌ক্তিভেদ রক্ষা করা প্রভৃতি ব্যাপার থেকে রবীন্দ্রনাথকে মারাত্মকভাবে রক্ষণশীল ব'লেই মনে হবে। প্রবল স্বাদেশিকতার বশে তিনি যে সাময়িকভাবে কিছুটা রক্ষণশীল হয়ে পড়েছিলেন এ স্বীকার ক'রেও তাঁর সমর্থনে বলা যেতে পারে যে, শিলাইদহ-জীবনে স্বাদেশিকতার দুটি ভাবরূপ তাঁকে আবিষ্ট করেছিল, এক—মাটি, কৃষক ও গ্রামীণ সমাজের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য, আর—বিদেশি শিক্ষাব্যবস্থার প্রতিঘাত হিসেবে জাতীয় শিক্ষাধারার উপর আস্থা। কিন্তু জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার মনোমত কোনো রূপই তিনি বাস্তবে পাননি। ফলে তাঁকে অনিবার্যভাবে আশ্রয় নিতে হ'ল উপনিষদ, রামায়ণ, কালিদাস-ভবভূতির চিত্রিত প্রাচীন ভারতের শিক্ষাব্যবস্থার উপর। অবশ্য ঐ সময়ে স্বামী বিবেকানন্দ কর্তৃক বহুভাষিত প্রাচ্য জীবনরীতির মধ্যে পশ্চিমের শিক্ষানীতির মিশ্রণ, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় প্রবর্তিত হেতুয়ার নিকটবর্তী ব্রহ্মচর্যাশ্রম এবং স্বামী শ্রদ্ধানন্দ প্রবর্তিত গুরুকুলের অস্তিত্ব দেখা যায়। তবু রবীন্দ্রনাথ অপটু হাতে নিজ মতেই কাজ আরম্ভ ক'রে দিয়েছিলেন। ঠিক পথ এবং আধুনিক জীবনের মধ্যে প্রাচীনের প্রতিষ্ঠার সীমা কী হবে এ সম্বন্ধে স্পষ্ট কোনো অভিজ্ঞতা না থাকায় তাঁর ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়কে পুনঃ পুনঃ পরিবর্তনের মধ্য দিয়েই চলতে হয়েছে। 'রবীন্দ্র-জীবনী' গ্রন্থ থেকে জানতে পারি, শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মবিদ্যালয়-স্থাপনের প্ল্যান বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের। তিনি গুরুকুল থেকে এর প্রেরণা পেয়েছিলেন। বলেন্দ্রনাথের অকালমৃত্যুতে এই পরিকল্পনা স্থগিত থাকে। পরে প্রয়োজনের তাগিদে রবীন্দ্রনাথ ব্যাপারটিকে নিজের হাতে নেন। সেই সময় শিলাইদহ থেকে পরিবারবর্গকে স্থানান্তরিত করার ফলে এবং নিজ পুত্রকন্যাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করার জন্য তিনি এই নোতুন

বিদ্যালয়ের কাজে হাত দেন। এ হ'ল ১৯০১ এর কথা। এর পূর্বে তিনি 'নৈবেদ্যে'র কবিতা রচনায় হাত দিয়েছেন, ব্রহ্মমন্ত্রও রচনা করেছেন। প্রাচীন ভারতের গুরুগৃহবাস সহ ব্রহ্মচর্য, উপাসনা প্রভৃতি কঠোর নিয়মানুবর্তিতা এবং উপকরণের দাসত্ব থেকে মুক্তি অর্থাৎ দারিদ্র্যের মধ্য দিয়ে কবি তাঁর স্বকীয় স্বাদেশিকতার স্বপ্নকে মূর্ত ক'রে তুলতে চাইলেন। এমনভাবে যে, উপনয়ন, দীক্ষা, শৌচ, বর্ণাশ্রমভেদ প্রভৃতি কিছুই বাদ গেল না। এই সময় থেকেই নবপর্যায় বঙ্গদর্শন পত্রিকায় তাঁর স্বদেশ ও জাতীয়তা বিষয়ক প্রবন্ধপরম্পরা। সুতরাং সন্দেহ নেই যে ধর্মীয়তা ও হিন্দু-ভারতীয়তার উজ্জীবনের একটা ইউটোপিয়া কবিকে একালে পেয়ে বসেছিল। কিন্তু কবির এই প্রাচীনপ্রীতিকে হিন্দুয়ানি বা প্রতিক্রিয়াশীল মনোভাবের পরিচয় বললে ভুল করা হবে। বরং এ হিন্দুয়ানি থেকে পরিত্রাণের জন্য প্রাচীনের আশ্রয় গ্রহণ অর্থাৎ এস্‌কেপিজম্‌ এমন মনে করাই উচিত। উপনিষদের যুগের আর্য হিন্দুত্বকে তিনি যথার্থ হিন্দুত্ব ব'লে মনে করেছেন। তাঁর মতে এই উদার হিন্দুত্বের মধ্যেই গ্রীক-শক-হুন-অনার্য জাতির একীকরণ। এরই পাশাপাশি আচারনিষ্ঠ যে সংকীর্ণ হিন্দুয়ানি গড়ে উঠেছিল, যা ক্রমশঃ বিভেদবুদ্ধিকেই পাকা ক'রে তুলেছিল, চার বর্ণকে ছত্রিশ জাতে বিভক্ত করেছিল এবং ইসলাম ধর্মের উপাসকদের সঙ্গে আত্যন্তিক বিরোধে লিপ্ত হয়েছিল সে হিন্দুত্বকে রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করেন নি, এ আমরা পূর্বেই দেখেছি। পরবর্তী যে-সব প্রবন্ধে কবি হিন্দু-মুসলিম সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেছেন, তাতে এই ভেদবুদ্ধিসম্বল উন্নাসিক হিন্দুয়ানি তাঁর আক্রমণের লক্ষ্য হয়েছে।

হিন্দুয়ানি থেকে হিন্দুধর্মকে পৃথক ক'রে দেখেই রবীন্দ্রনাথ হিন্দুধর্মের মধ্যে, ব্রাহ্ম তো বটেই, মুসলমান, খ্রীস্টানের স্থানও স্বচ্ছন্দে নির্দেশ করেছেন। তাঁর অভিমতে বহিরঙ্গ কুসংস্কারের দ্বারা সমাচ্ছন্ন হলেও হিন্দুধর্মের মধ্যে একটি নিত্যতা আছে, সেই নিত্যতার জোরেই এ ধর্ম নোতুন অভিমতের বিপ্লবকে ক্রমশঃ বরণ করতে বাধ্য হয়েছে। "হিন্দু সমাজের ইতিহাসেও ধর্মবিশ্বাসের অচলতা আমরা দেখি নাই।" 'পরিচয়' পুস্তিকায় গ্রথিত 'আত্মপরিচয়' প্রবন্ধে হিন্দুত্বের বৃহৎ ভূমিকার দিকে লেখক সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। হিন্দুর কাছাকাছি যেসব ধর্ম ও সমাজ আছে, যেগুলির সঙ্গে আপাততঃ নানা বিষয়ে এর বিরোধও রয়েছে, সেগুলিও তাঁর বিবেচনায় এর অঙ্গ, এর সম্প্রদায়বিশেষ মাত্র। ঐ প্রবন্ধে জাতিবর্ণভেদকে হিন্দুধর্মের নিত্যবস্তু ব'লে লেখক স্বীকার করেন নি। এরকম মনোভাবের ফলে তিনি 'হিন্দুধর্ম' কথাটি ব্যবহার না ক'রে 'হিন্দু সমাজ' এই বর্ণনামূলক বিশেষত্বপূর্ণ শব্দটি ব্যবহার করায় আগ্রহী। এই সমাজের কোনো কোনো লোক মুসলমান, খ্রীস্টানদের পর মনে করলেও

তাতে কিছু যায় আসে না। তাদের মত সমস্ত হিন্দুসমাজের মত নয়। তিনি স্পষ্ট ক'রেই বলছেন—

"তবে কি মুসলমান অথবা খ্রীস্টান সম্প্রদায়ে যোগ দিলেও তুমি হিন্দু থাকিতে পার। নিশ্চয়ই পারি। ইহার মধ্যে পারাপারির তর্কমাত্রই নাই। হিন্দুসমাজের লোকেরা কী বলে সে কথায় কান দিতে আমরা বাধ্য নই, কিন্তু ইহা সত্য যে কালীচরণ বাঁড়ুজ্জে মশায় হিন্দু-খ্রীস্টান ছিলেন, তাহার পূর্বে জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর হিন্দু খ্রীস্টান ছিলেন, তাঁহারও পূর্বে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় হিন্দু-খ্রীস্টান ছিলেন। অর্থাৎ তাঁহারা জাতিতে হিন্দু, ধর্মে খ্রীস্টান। খ্রীস্টান তাঁহাদের রং, হিন্দুই তাঁহাদের বস্তু। বাংলাদেশে হাজার হাজার মুসলমান আছে, হিন্দুরা অহর্নিশি তাহাদের হিন্দু নও, হিন্দু নও বলিয়াছে এবং তাহারাও নিজেদেরকে হিন্দু নই, হিন্দু নই শুনাইয়া আসিয়াছে, কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাহারা প্রকৃতই হিন্দু-মুসলমান। কোনো হিন্দু পরিবারে এক ভাই খ্রীস্টান এক ভাই মুসলমান ও এক ভাই বৈষ্ণব এক পিতামাতার স্নেহে একত্র বাস করিতেছে এই কথা কল্পনা করা কখনোই দুঃসাধ্য নহে, বরঞ্চ ইহাই কল্পনা করা সহজ—কারণ, ইহাই যথার্থ সত্য, সুতরাং মঙ্গল এবং সুন্দর। এখন যে অবস্থা আছে তাহা সত্য নহে, তাহা সত্যের বাধা—তাহাকেই আমি সমাজের দুঃস্বপ্ন বলিয়া মনে করি—এই কারণে তাহাই জটিল, তাহাই অদ্ভুত অসংগত, তাহাই মানবধর্মের বিরুদ্ধ।"

এই মনোভাব-প্রকাশের পর রবীন্দ্রনাথের কোনো উদ্যমকে কোনো অংশেই সাম্প্রদায়িকতাচিহ্নিত ব'লে মনে করা অসমীচীন হবে। দেখতে হবে, বর্ণাশ্রমসহ তপোবন-বিদ্যালয় প্রবর্তনের প্রাথমিক উচ্ছ্বাসের পর্যায় কবিচিত্তে ক্ষীণ হয়ে আসতেও খুব বিলম্ব হয়নি। ছ' সাত বৎসরের মধ্যে লেখা 'গোরা' উপন্যাসে উগ্র জাতীয়তার গৌরব দেখিয়ে মানবিকতার কাছে তাকে ধিক্কৃত করা হয়েছে। কিন্তু একালেও রবীন্দ্রনাথ যে বর্ণাশ্রমধর্মী হয়ে পড়েন নি তার পরিস্ফুট প্রমাণ তাঁর সামাজিক ও রাষ্ট্রনীতিক প্রবন্ধনিচয়,—'স্বদেশী সমাজ' (১৯০৪ খ্রীঃ) থেকে যে-মনোভাবের প্রকাশ। বিশ শতকের এই প্রথম দশকটিতে ধর্মপ্রবণতা ও প্রাচীনানুরাগ আত্যন্তিক মনে করা গেলেও, সামগ্রিক মনে করা যাবে না, কারণ একালেই ভিন্নতর ভাবুকতায় এর খানিকটা প্রতিবাদও দেখা গিয়েছিল।

'স্বদেশী সমাজ'ই কবির যাবতীয় স্বদেশ-ভাবনার প্রধানতম বস্তু, স্বাদেশিকতায় তাঁর মৌলিক অবদান এবং তাঁর অন্তরের একটি স্থায়ী ভাব, যা নানারূপে শেষ পর্যন্ত অক্ষুণ্ন ছিল। তাঁর রাষ্ট্রচিন্তা-বিষয়ক অন্যান্য প্রবন্ধ বা ভাষণ এর তুলনায় সাময়িক,

প্রাসঙ্গিক, অর্থাৎ রাজা-প্রজা, সমূহ, স্বদেশ পুস্তিকার এমন কি 'কালান্তরে'রও কয়েকটি প্রবন্ধ কালিক প্রয়োজনেই ভাবিত, অন্যপক্ষে স্বদেশী সমাজের প্রস্তাবিত বিষয় আত্মশক্তি ও সমূহের প্রবন্ধগুলি থেকে আরম্ভ ক'রে 'কালান্তর' 'সমবায়নীতি' 'রাশিয়ার চিঠি' এবং শ্রীনিকেতনের গ্রামসংগঠন পর্যায় পর্যন্ত প্রসারিত। কবির এই গ্রামসংগঠনের উদ্যোগ যে বর্ণাশ্রমের ও 'দাও ফিরে সে অরণ্য, লও এ নগর' মনোভাবের মত কেবল আদর্শস্বপ্নেরই পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছিল না, বাস্তব কার্যক্রমে গ্রথিত হয়ে সার্থকও হয়েছিল তারও প্রমাণ যথেষ্ট। শান্তিনিকেতনে প্রবর্তিত বর্ণাশ্রম ব্রহ্মচর্য টেঁকেনি, যেটুকু কালজয়ী হয়েছিল তা এই আদর্শের সঙ্গী নিসর্গ-সম্পর্ক। এই উদ্‌যোগের মধ্যে যে প্রচুর পরিমাণে কাব্যিকতা ছিল, তার বিষয় আমরা ভূমিকায় পূর্বেই বলেছি। অথচ এই স্বদেশী সমাজ সংগঠনের মধ্যে আদর্শের বড় বহুল পরিমাণেই অবিদ্যমান ছিল, এই এর বৈশিষ্ট্য। এই সমাজের প্ল্যান কিছু পরিমাণে চিরাচরিত গ্রামীণ সমাজব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল হলেও সেই প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থা থেকে এটি মৌলিকভাবে পৃথক্‌ও বটে। পূর্ব-পরিচিত সমাজ-ব্যবস্থা জাতিবর্ণের আচার পালন ব্যবস্থার দ্বারা বহুল পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত ছিল, এমন কি কোনো কোনো ক্ষেত্রে তা-ই পল্লী-সমাজের সর্বস্ব ছিল। এই সমাজে ঐ বিষয়টি নিঃশেষে উপেক্ষিত। অধিকন্তু এ সমাজে হিন্দুর মত মুসলমানেরও সমান অংশ। এ সমাজের কাজ কৌলীন্যরক্ষা ও জাতিচ্যুত করা নয়, সামূহিক কল্যাণ। এর কর্ম-উদ্‌যোগ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অন্নবস্ত্র, বিচার প্রভৃতির মধ্যে সীমিত। জাতিবর্ণনির্বিশেষে সামূহিক ঐক্যের উপর এর প্রতিষ্ঠা। মধ্যযুগের সমাজ থেকে যে অংশটুকু এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল তা হ'ল ধনী-ব্যক্তির বা জমিদারবর্গের প্রজাকল্যাণ ব্যবস্থা। পুরাতন জমিদারি ব্যবস্থার কিছু কিছু বিষয় তিনি একালের জমিদারি ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করতে চেয়েছিলেন। শস্যভাণ্ডার স্থাপন, সমবায় প্রথায় ব্যবসায় ও চাষ প্রভৃতির পরিকল্পনা সম্পূর্ণ একালকার। পূর্বতন সমাজব্যবস্থা থেকে আরও একটি বিষয় রবীন্দ্রনাথ তাঁর আধুনিক সমাজের অন্তর্ভুক্ত করতে চেয়েছিলেন। তা হ'ল এই সমাজের একজন নেতা বা মণ্ডলস্থানীয় ব্যক্তির প্রয়োজনীয়তা। ঐ নেতার অধ্যক্ষতায় কর্মপরিষদ (Council of Action) প্রবর্তন, গণতান্ত্রিক নির্বাচন প্রভৃতির ব্যবস্থাও একালের।

রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী সমাজের সংকল্প বাঙলায় রীতিমত পোলিটিক্যাল আন্দোলন প্রারব্ধ হওয়ার পূর্ববর্তী। যে Thesis Anti-thesis-এর ফলে এর উদ্ভব তা হ'ল বিদেশি শাসনের পটভূমিতে স্বাদেশিকদের পদাধিকার ভিক্ষা ও জনকল্যাণমূলক কাজের জন্য পরদেশীর কাছে আবেদন নিবেদন। এরকম ভিক্ষাবৃত্তির মধ্যে অসাফল্যের

সঙ্গে যে নিদারুণ আত্ম-অমর্যাদা প্রকাশ পাচ্ছিল তা-ই কবিকে বিশেষভাবে পীড়িত ক'রে এই নোতুন প্রতিকার-ভাবনায় প্রবৃত্ত করে। পরবর্তী রাজনীতিক আন্দোলনের ব্যর্থতার মুখেও এরকম গঠন-মূলক স্বদেশীর উপযোগিতা প্রমাণিত হয়। 'স্বদেশী সমাজ' লেখার পূর্বে ভিক্ষাবৃত্ত আন্দোলনের শোচনীয় দুর্বলতা এবং পরিহাসের দিকটি রবীন্দ্রনাথ তাঁর বহু পূর্বে লেখা (ভারতী পত্রিকায়) 'হাতে-কলমে' ও 'ন্যাশ্‌নাল ফণ্ড্‌' প্রবন্ধে প্রথম ব্যক্ত করেন। পরে 'ইংরেজ ও ভারতবাসী' প্রবন্ধে আমাদের সম্বন্ধে ইংরেজের অবজ্ঞা ও ঔদাসীন্যের বিষয় এবং আমাদের ইংরেজ-অনুগ্রহে গৌরবলাভের লজ্জাকর দিক আলোচনা ক'রে পরিশেষে ইংরেজ সংস্পর্শ থেকে দূরে স্বাদেশিক কর্মে আত্মনিয়োগের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। 'প্রসঙ্গ-কথা'য় ('সমূহ' দ্রঃ) অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয়ের কংগ্রেস-কার্য-সংগঠনের আলোচনাপ্রসঙ্গেও (১৮৯৮) ভিক্ষাবৃত্তি ত্যাগ ক'রে আত্মশক্তির উপর নির্ভর করার প্রেরণা দেওয়া হয়েছিল। এ ছাড়া দিল্লী-দরবার উপলক্ষ্যে ভাষিত 'অত্যুক্তি' প্রবন্ধের উপসংহারেও ভিক্ষাবৃত্তির বিরোধিতা এবং আত্মদান ও আত্মত্যাগের দ্বারা কর্মের উপর নির্ভরশীল হওয়ার কথা বলা হয়েছে। 'স্বদেশী সমাজ' এই সব বিচ্ছিন্ন পূর্বচিন্তার কালোপযোগী সুসংগ্রথিত রূপও বটে। বঙ্গচ্ছেদ-রূপ কর্তার নিরঙ্কুশ ইচ্ছাপ্রকাশই যদ্যপি এই প্রবন্ধটি রচনার উপলক্ষ্য ('বঙ্গবিভাগ' আলোচনা দ্রঃ—'সমূহ'), তবু সমকালীন আরও দুটি ঘটনা এই প্রবন্ধ-ভাষণে কবিকে দ্রুতবেগে চালিত করেছিল এমন মনে করা যেতে পারে। এর একটি লর্ড কর্জনের য়ুনিভার্সিটি-বিল আনা, যাতে বিশ্ববিদ্যালয়কে পশ্চিমী ছাঁচে ঢেলে-সাজার আগ্রহে বস্তুতঃ দরিদ্রের পক্ষে উচ্চশিক্ষাকে দুর্লভ ক'রে তোলার প্রস্তাব করা হয়েছিল, আর একটি উপলক্ষ্য হ'ল সখারাম গণেশ দেউস্কর লিখিত 'দেশের কথা' পুস্তিকার প্রকাশ। এ পুস্তিকার আলোচনাও রবীন্দ্রনাথ করেছিলেন। ঐ আলোচনায় নিষ্ফল আন্দোলনের পথ প্রত্যাহার ক'রে 'ঘরে ফেরা'র অর্থাৎ আত্মশক্তি সম্বল ক'রে দেশের গঠনমূলক কাজে উৎসাহিত হওয়ার দিকে সংকেত জানানো হয়েছে। আর আমরা পূর্বেই বলেছি যে কৈশোরে কবিদৃষ্ট 'হিন্দুমেলা'র জাতীয়তার আদর্শও তাঁর চিত্তে স্বাবলম্বন ও গঠনমূলক স্বাদেশিকতার প্রতি আগ্রহের সঞ্চার করেছিল।

'স্বদেশী সমাজে' প্রস্তাবিত গঠনমূলক স্বাদেশিকতা বা সমাজ-সংগঠনের বিষয়টি পরবর্তী যে-সব প্রবন্ধে বা ভাষণে প্রত্যক্ষ- বা পরোক্ষভাবে উল্লিখিত হয়েছে সেগুলি এই : অবস্থা ও ব্যবস্থা (আত্মশক্তি), দেশনায়ক, পাবনা প্রাদেশিক সম্মিলনীতে ভাষণ, সদুপায়, ব্যাধি ও প্রতিকার, যজ্ঞভঙ্গ, দেশহিত প্রভৃতি (সমূহ), পথ ও পাথেয়, সমস্যা (রাজা-প্রজা); বিজয়া-সম্মিলন (স্বদেশ); সমবায়নীতি এবং 'কালান্তর' 'রাশিয়ার চিঠি' ও 'পল্লীপ্রকৃতি' পুস্তকের বহু প্রবন্ধ। গ্রামীণ-সমাজ-সংগঠনের মধ্য

দিয়েই যে অর্জিত স্বাধীনতা আসবে এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ শেষ পর্যন্ত আস্থা প্রকাশ করেছেন। তাঁর জীবনের প্রায় শেষের দিকের একটি মন্তব্য দেখা যাক—"আমি নিজের সম্বন্ধে একথা স্বীকার করব যে, মহাত্মাজীর সঙ্গে সকল বিষয়ে আমার মতের ঐক্য নেই। অর্থাৎ, আমি যদি তাঁর মতো চারিত্র্যপ্রভাব-সম্পন্ন মানুষ হতেম তা হলে অন্যরকম প্রণালীতে কাজ কবতুম। কী সে প্রণালী, আমার অনেক পুরাতন লেখায় তার বিবরণ দিয়েছি।" নূতনতর রাষ্ট্রগঠন নয়, সমাজগঠনই যে এদেশকে দুর্বিপাকেব হাত থেকে পরিত্রাণ করবে এবিষয়ে রবীন্দ্রনাথ শতাব্দের প্রারম্ভ থেকে শেষ পর্যন্ত দৃঢ়মত পোষণ করতেন। ঐ প্রবন্ধেই (অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তীকে লেখা তখনকাব কংগ্রেসেব মত ও পথ বিষয়ে পত্র) তিনি লিখছেন—"আমি জানি বাষ্ট্র-ব্যাপাব সমাজেব অন্তর্গত ; কোনো দেশেরই ইতিহাসে তার অন্যথা হয়নি, সামাজিক ভিত্তিব কথাটা বাদ দিয়ে রাষ্ট্রিক ইমাবতের কল্পনায় মুগ্ধ হযে কোনো লাভ নেই। সমুদ্রেব ওপাবে দেখা যাচ্ছে নানা আকাবের—নানা আযতনেব জয়তোরণের চূডা, কিন্তু তাদেব কোনোটারই ভিত গাডা হযনি বালিব উপরে। যখন লুব্ধ মনে তাদের উপরতলার অনুকরণে প্ল্যান আঁকব তখন দেশের সামাজিক চিত্তেব মধ্যে নিহিত ভিত্তির বহস্যটা যেন বিচাব কবি।" রবীন্দ্রনাথের অভিমতে সমাজের জীবনধাবাব বৈশিষ্ট্য, সমাজেব বিশিষ্ট অভিলাষই তদনুযাযী রাষ্ট্র গঠন কববে। যুবোপে সেই বকমই হযেছে। কিন্তু যেহেতু ভারতেব সামাজিক অভিলাষ যুরোপ থেকে স্বতন্ত্র, সেইহেতু ভাবতীয বাষ্ট্রেব কাঠামো যুরোপের অনুকবণে গঠিত হতেই পারে না। সুতবাং অনুমান কবা যায়, স্বদেশী-সমাজেব পরিকল্পনার সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক বাষ্ট্র-বিষয়ে একটি সাধারণ ধাবণাও রবীন্দ্র-চিত্তে আভাসিত হচ্ছিল। 'স্বদেশী সমাজ' রবীন্দ্রনাথের মৌলিক স্বাদেশিকতাব পরিচায়ক। একালেব কল্পনামূলক প্রাচীনধর্মী জাতীয়তাব উদ্বোধনেব সঙ্গে এবকম বাস্তবজীবনের প্রেবণাব ঐক্য ঐ স্বাদেশিকতার মধ্যেই। এখন স্বদেশী সমাজেব প্রতিপাদ্য কী তা দেখা যেতে পারে।

এই গঠনমূলক স্বাদেশিকতায গ্রামাঞ্চলকে কর্মকেন্দ্র করতে হবে। এজন্য কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় শাখা কর্মপবিষদ্ গঠন ক'রে সেই পরিষদের উপব গ্রামেব মানুষের শিক্ষা, স্বাস্থ্যবক্ষা, বিচার এবং অন্যান্য জনকল্যাণমূলক কাজ, যেমন, রাস্তাঘাট-নির্মাণ, কূপ-পুষ্করিণী-খনন প্রভৃতির দায়িত্ব ন্যস্ত করতে হবে। এই কর্মপরিষদের উদ্যোগে কৃষির উন্নতি, গো-রক্ষণ, চাষীদের মধ্যে নিজশক্তিতে আর্থিক উন্নতিবিধান, অত্যাচারী জমিদার ও মহাজনেব হাত থেকে দবিদ্র কৃষকেব আত্মরক্ষা, সমবায়-নীতিতে আস্থা, শস্যভাণ্ডার-স্থাপন, অবসরকালে কুটিরশিল্পে আত্মনিয়োগ প্রভৃতির উপায় ও ব্যবস্থা করতে হবে। গ্রামের বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানও এই পরিষদকে বিভিন্ন উন্নয়ন-

পবিকল্পনার মধ্যস্থতায় করতে হবে। "সংশয়ী বলিবেন, শিক্ষার ভার যেন আমরা লইলাম, কিন্তু কর্ম দিবে কে? কর্মও আমাদিগকে দিতে হইবে (সফলতার সদুপায়)।" এ ছাড়া গ্রামীণ সাহিত্য-সংস্কৃতির রক্ষণ-বর্ধন এবং আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থাও এই সমিতিগুলিকে করতে হবে। এর শাসন-পালন-কার্য সামাজিক ও গণতান্ত্রিক হবে। মূল পবিষদ্ ও শাখা-পবিষদগুলির এক-একজন চরিত্রবান্ নির্বাচিত সভাপতি থাকবেন যাঁর বশ্যতা সকলকে স্বীকার কবতে হবে। "দেশেব কর্মশক্তিকে একটি বিশেষ কর্তৃসভাব মধ্যে বদ্ধ করিতে হইবে। অন্তত একজন হিন্দু ও একজন মুসলমানকে আমরা এই সভাব অধিনায়ক করিব।" এবং "অধিনায়কের সহায়তাব জন্য একটি মন্ত্রিসভা থাকিবে" (অবস্থা ও ব্যবস্থা)। এরকম স্বদেশী সংসদের পরিচালনার আর্থিক প্রযোজন নির্বাহ বিষয়ে ববীন্দ্রনাথের ধাবণা এইরকম: "প্রতিদিন প্রত্যেকে স্বদেশকে স্মবণ কবিয়া একপযসা বা তদপেক্ষা অল্প—একমুষ্টি বা অর্ধমুষ্টি তণ্ডুলও স্বদেশবলি স্বরূপে উৎসর্গ কবিতে পারিবেন না?······তা ছাড়া, প্রত্যেক গৃহে বিবাহাদি শুভকর্মে গ্রামভাটি প্রভৃতিব ন্যায় এই স্বদেশী সমাজেব একটি প্রাপ্য আদায দুরূহ বলিযা মনে কবি না।" ঐ স্বদেশী সমাজেব সংবিধানে বযেছে—'সমাজবর্তী প্রত্যেককেই নিজ আযেব নির্দিষ্ট অংশ কবস্বরূপ সমাজকে দিতে হইবে। ত্রিশ টাকা পর্যন্ত দুই আনা, পঞ্চাশ টাকায় চার আনা, একশ' টাকা হইতে হাজার টাকা পর্যন্ত শতকবা এক টাকা ও তদূর্ধ্বে শতকবা দেড টাকা কব দিতে হইবে।' অন্যত্র দেখি, 'পল্লীসমাজের কার্য স্বেচ্ছাদান ও ঈশ্বরবৃত্তি দ্বাবা চলিবে।' স্বদেশী সমাজের সংবিধানে অথবা প্রবন্ধাবলীতে অর্থসমস্যাব সমাধানেব জন্য তখনকার বিত্তবান্দেব অর্থাৎ জমিদাব ও মুষ্টিমেয় ধনী ব্যবসায়ীদেব শবণাপন্ন হওয়াব অথবা তাঁদের বাধ্য-বাধকতার মধ্যে আনার কোনো প্রস্তাব যুক্তিসংগত ব'লে রবীন্দ্রনাথ মনে করেন নি। শুধু দেখা যায় যে বিদ্যাদান জলদানকে জমিদাবেব চিরাচবিত নৈতিক কর্তব্য ব'লে তিনি পুনঃপুনঃ উল্লেখ কবেছেন। এবং একটি ভাষণে (পাবনা প্রাদেশিক সম্মিলনী, ১৯০৮) তিনি জমিদাবদের সতর্ক ক'রেও দিয়েছেন, যেমন—

> "পল্লী সচেতন হইযা নিজেব শক্তি নিজে অনুভব কবিতে থাকিলে জমিদাবের কর্তৃত্ব এবং স্বার্থ খর্ব হইবে বলিয়া আপাতত আশঙ্কা হইতে পারে। কিন্তু এক পক্ষকে দুর্বল করিয়া নিজেব স্বেচ্ছাচারের শক্তিকে কেবলই বাধাহীন করিতে থাকা আর ডাইনামাইট বুকের পকেটে লইয়া বেড়ানো একই কথা—একদিন প্রলয়েব অস্ত্র বিমুখ হইয়া অস্ত্রীকেই বধ করে। রায়তদিগকে এমনভাবে সবল ও শিক্ষিত কবিবা রাখা উচিত যে ইচ্ছা কবিলেও তাহাদের প্রতি অন্যায় করিবার প্রলোভনমাত্র জমিদারের মনে না

উঠিতে পারে। জমিদার কি বণিকের মত কেবল দীনভাবে আদায় করিবার পথগুলিই সর্বপ্রকারে মুক্ত রাখিবেন।"

এরকম বক্তব্যে রবীন্দ্রনাথ হয়ত খ্যাতচরিত্র জমিদারদের উদারতা এবং সাধুবুদ্ধির উপর খুব বেশি প্রত্যাশাই করেছেন। যেমন করেছেন ধনী ব্যবসায়ীদের উপর মহাত্মা গান্ধী, কিন্তু মনে হয় যে তিনি নিশ্চয়ই একথা মনে রেখেছিলেন যে, কর্তৃত্ব স্বদেশী সমাজের উপব বর্তালে জমিদাব ক্রমশঃ দুর্বল ও সামাজিক শাসনের বশবর্তী হয়ে পড়বে। নতুবা শিক্ষাসত্র, জলসত্র, পূর্তকার্য প্রভৃতি জমিদাররাও কবতে থাকবেন এবং স্বদেশীরাও করে যাবেন এমন দ্বৈত দায়িত্ব সমাজ-প্রশাসনের পক্ষে নিশ্চয়ই বাস্তব হ'ত না। বস্তুতপক্ষে স্বদেশী সমাজের পরিকল্পনায় রবীন্দ্রনাথ একদিকে যেমন প্রায় পাণ্টা সবকারের আদর্শ বাস্তবায়িত কবতে চেয়েছিলেন, তেমনি একই সঙ্গে জমিদারদের দুর্নীতি ও প্রতাপ খর্ব কবতেও চেয়েছিলেন মনে হয। এ বিষয়ে তিনি তাঁর 'রাশিয়ার চিঠি'ব উপসংহারে খানিকটা মুখ খুলেছিলেন—ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, ব্যক্তিগত সম্পত্তির উৎসাদন না ঘটিয়েও তাকে সমাজেব অধীন করতে চেয়েছিলেন, যেমন—

"একদিন ভাবতেব সমাজটাই ছিল প্রধানত পল্লীসমাজ। এই বকম ঘনিষ্ঠ পল্লীসমাজে ব্যক্তিগত সম্পত্তির সঙ্গে সমাজগত সম্পত্তির সামঞ্জস্য ছিল। লোকমতের প্রভাব ছিল এমন যে, ধনী আপনাব ধন সম্পূর্ণ আপন ভোগে লাগাতে অগৌবব বোধ কবত। সমাজ তার কাছে আনুকূল্য স্বীকার করেছে ব'লেই তাকে কৃতার্থ কবেছে, অর্থাৎ ইংবেজি ভাষায় যাকে চ্যারিটি বলে এর মধ্যে তা ছিল না। ধনীব স্থান ছিল সেখানেই, যেখানে ছিল নির্ধন। সেই সমাজে আপন স্থানমর্যাদা রক্ষা করতে গেলে ধনীকে নানা পরোক্ষ আকারে বড়ো অঙ্কের খাজনা দিতে হত। গ্রামে বিশুদ্ধ জল, বৈদ্য, পণ্ডিত, দেবালয়, যাত্রা, গান, কথা, পথঘাট সমস্তই রক্ষিত হত গ্রামেব ব্যক্তিগত অর্থের সমাজমুখীন প্রবাহ থেকে, রাজকর থেকে নয়। এব মধ্যে স্বেচ্ছা ও সমাজের ইচ্ছা দুইই মিলতে পেরেছে।……সব চেয়ে বড়ো কথাটা হচ্ছে এই যে, তখন সমাজে ধনের ব্যবহার একমাত্র দাতার স্বেচ্ছার উপর নির্ভর করত না, তার উপরে ছিল সামাজিক ইচ্ছার প্রবল প্রভাব।"

এই পরিকল্পনায় আর্থিক দিক সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের ধারণা—"অর্থের অভাব হইবে না।" পরিশেষে বলা যায় যে গ্রামসংগঠনে গণসংযোগ ও লোকশিক্ষার প্রয়োজন নির্বাহ কল্পে রবীন্দ্রনাথ 'মেলা'র ব্যবস্থার পরামর্শ দিয়েছেন।

'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধ পাঠের পর ১৯০৫ অব্দে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ

কায়মনোবাক্যে যোগ দিয়েছিলেন, এমন কি বিদেশি পণ্য বয়কট বিষয়েও তখনই অসম্মতি জানান নি। কিন্তু আন্দোলনের দু'তিন বৎসরেব মধ্যে স্বাদেশিকদের বাক্য-মাত্রসার উপলব্ধি ক'বে নিজেই তাঁর জমিদাবিতে, নদীয়া পাবনা ও রাজশাহী জেলায় কয়েকটি স্থানে সমাজসংগঠনে এবং কৃষি ও কৃষকেব উন্নতিবিধানে আত্মনিয়োগ করেন। বেশি ফসল ফলানোর জন্য সমবায প্রথায় চাষ, একই জমিতে একাধিক ফসল-ফলানোর ব্যবস্থা, মহাজনের ঋণ থেকে কৃষকদের মুক্তিব জন্য সমবায় ব্যাঙ্ক, অবসব-সময়ে কৃষকদের শিল্পে আত্মনিযোগেব ব্যবস্থা, বিদ্যালয-স্থাপন, বাস্তাঘাটেব উন্নতিতে কৃষকদের উৎসাহ ও প্রেবণা এবং পবগণাগুলিকে মণ্ডলে বিভক্ত ক'বে স্থানীয় সভা ও কেন্দ্রীয সভাব উপবে গ্রামশাসনেব ভাব অর্পণ এবং হিন্দু-মুসলমানেব মধ্যে সমমানসিকতা গঠনেব প্রয়াস—এইগুলি তাঁব স্বকীয সংগঠনেব উল্লেখ্য বিষয। কৃষক ও কৃষিব উন্নতিতে তিনি এতদূব কৃতসংকল্প ছিলেন যে পুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বন্ধুপুত্র সন্তোষ মজুমদাব এবং জামাতা নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে তিনি কৃষিশিক্ষণেব জন্য আমেবিকায পাঠান। তাঁবা ফিবে এসে কাজেও লেগে যান। এরকম স্বকীয় উদ্‌যোগে স্বদেশী সমাজ ও গ্রাম-উন্নযনেব প্রযাসেব বিষয তিনি তাঁব চিঠিপত্রে এবং ভাষণে আমাদের জানিযেছেন, কিন্তু এব পূর্ণাঙ্গ পবিচয় দিচ্ছেন বথীন্দ্রনাথ। বলা বাহুল্য, কবিব এই প্রশংসনীয় উদ্‌যোগ শিলাইদহ-শাজাদপুব-পতিসবে নানা কাবণে অসম্পূর্ণই থেকে যায়, কিন্তু এই উদ্‌যোগকে পুনবায শ্রীনিকেতনে সার্থক ক'বে তোলাব যে প্রযাস তিনি করেন তা সর্বজনবিদিত। এখন বথীন্দ্রনাথেব বিববণ-অনুসারে রবীন্দ্রনাথের গ্রাম-সংগঠনের ধাবা লক্ষ্য করা যেতে পাবে ঃ

"বাবা বললেন, তিনি যখন জমিদাবিব কাজ দেখতে আবম্ভ কবেন, প্রথমেই প্রজাদেব মধ্যে সালিশী বিচাবের ব্যবস্থা প্রবর্তন কবেন। বিবাহিমপুব (=শিলাইদহ) ও কালীগ্রাম এই দুই পরগণাব কযেকটি গ্রাম নিয়ে একটি ক'বে বিচাবসভা স্থাপন কবেন। প্রজাদের পরস্পবেব মধ্যে কোনো বিবাদ ঘটলেই উভয়পক্ষকে এই বিচার-সভায় উপস্থিত হতে হবে এই নিয়ম হল।......প্রজাদের সম্মতিক্রমে সমস্ত পরগণার জন্য পাঁচজন সভ্য নিয়ে একটি আপীল সভা নির্বাচিত হ'ল। এই পাঁচজনকে পঞ্চপ্রধান বলা হ'ত। পঞ্চপ্রধানের বিচাবে সন্তুষ্ট না হলে শেষ আপীল ছিল স্বয়ং জমিদারের কাছে।...আমাদের জমিদারির মধ্যে কোনো বিবাদ নিয়ে প্রজারা আদালতে কখনো যেত না।

...কালীগ্রাম পবগণাকে কাজের সুবিধাব জন্য তিনটি ভাগে বিভক্ত করা হ'ল। পল্লীসংগঠনের কাজ একটি সাধারণ সভার উপর ন্যস্ত করা হ'ল। প্রজারা স্বেচ্ছায় কর

দিতে রাজি হ'ল। প্রতি টাকায় এক আনা করে সকল প্রজাই দিত, সেই টাকা সাধারণ ফাণ্ডে জমা হ'ত। এই উপায়ে ফাণ্ডের যা আয় হ'ত, সাধারণ সভা বাজেট স্থির করত সেই টাকা কিভাবে খরচ করা হবে। একে একে প্রত্যেক গ্রামে অবৈতনিক পাঠশালা খোলা হ'ল, আর পতিসরে স্থাপিত হ'ল একটি মাইনর ইস্কুল—পরে সেটা হাই স্কুলে পরিণত হয়। চিকিৎসার ব্যবস্থা ব্যাপকভাবে করা ব্যয়সাপেক্ষ ব'লে পতিসরেই কেবল চিকিৎসালয় স্থাপন সম্ভব হ'ল। পরে তিন বিভাগে তিন জন ডাক্তার বসানো হয়েছিল। গ্রামের রাস্তাঘাটের উন্নতি হতে থাকল। পানীয়জলের ব্যবস্থা হ'ল, বয়নশিল্প শেখানোর জন্য শ্রীরামপুর থেকে একজন ভালো তাঁতিকে নিয়ে যাওয়া হ'ল। প্রজাদের উৎসাহ যেমন বাড়ল, এই সব কাজেরও দ্রুত উন্নতি হতে লাগল। কিছুদিন পরে বাবা দেখলেন প্রজাদের সাধারণ সভা একটি কাজ করতে অসমর্থ—সে হচ্ছে মহাজনদের ঋণ থেকে তাদের মুক্ত করা। ঋণমুক্ত না হলে তারা কোনো বিষয়েই উন্নতি করতে পারবে না। কৃষির বা শিল্পের জন্য যেটুকু মূলধন দরকার তা তাদের হাতে কখনো থাকবে না। এইজন্য বাবা নিজেই পতিসরে একটি ব্যাঙ্ক খুললেন। কয়েকজনের কাছ থেকে টাকা ধার নিয়ে ব্যাঙ্কের কাজ আরম্ভ হ'ল। পরে বাবা যখন নোবেল প্রাইজ পেলেন একলাখের উপর সব টাকাটাই এই কৃষিব্যাঙ্কের কাজে দিলেন। ব্যাঙ্ক যা সুদ দিত বহু বছর ধরে সেটা শান্তিনিকেতন ইস্কুলের একটা প্রধান আয় ছিল। কৃষিব্যাঙ্ক হয়ে প্রজাদের খুব উপকার হ'ল—কয়েক বছরের মধ্যেই তারা মহাজনদের দেনা সম্পূর্ণ শোধ ক'রে দিতে পেরেছিল। কালীগ্রাম এলাকা থেকে মহাজনরা তাদের ব্যবসা গুটিয়ে নিয়ে অন্যত্র যেতে বাধ্য হয়েছিল।……পতিসরে বাবা পল্লী-সংগঠনের যে পরীক্ষা করলেন এবং কয়েক বছরের মধ্যে তার যে আশাতীত ফল পেলেন দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের দেশের লোকের সেদিকে কোনো দৃষ্টি গেল না। ১৯০৬ সালে তিনি এ কাজে হাত দিয়েছিলেন। ১৯১০ সালে আমি যখন আমেরিকা থেকে ফিরে আসি তখন কালীগ্রামের সাধারণ সভার কাজ পুরোদমে চলছে দেখলুম।" ("পিতৃস্মৃতি")

এর পর রবীন্দ্রনাথের পরামর্শে রথীন্দ্রনাথের ট্রাক্টর দিয়ে চাষ আরম্ভ এবং যান্ত্রিক চাষে কৃষকদের আগ্রহ। কিন্তু এবিষয়ে রবীন্দ্রনাথের পুনঃপুনঃ উচ্চারিত বক্তব্যেরও একটি জায়গা দেখা যাক :

"দেশের সমস্ত গ্রামকে নিজের সর্বপ্রকার প্রয়োজনসাধনক্ষম করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে। কতকগুলি পল্লী লইয়া এক-একটি মণ্ডলী স্থাপিত হইবে। সেই মণ্ডলীর প্রধানগণ যদি গ্রামের সমস্ত কর্মের এবং অভাবমোচনের ব্যবস্থা করিয়া মণ্ডলীকে নিজের মধ্যে পর্যাপ্ত করিয়া তুলিতে পারে তবেই স্বায়ত্তশাসনের চর্চা দেশের সর্বত্র সত্য হইয়া

উঠিবে। নিজের পাঠশালা, শিল্পশিক্ষালয়, ধর্মগোলা, সমবেত পণ্যভাণ্ডার ও ব্যাঙ্ক স্থাপনের জন্য ইহাদিগকে শিক্ষা, সাহায্য ও উৎসাহ দান করিতে হইবে। প্রত্যেক মণ্ডলীর একটি করিয়া সাধারণ মণ্ডপ থাকিবে, সেখানে কর্মে ও আমোদে সকলে একত্র হইবার স্থান পাইবে এবং সেইখানে ভারপ্রাপ্ত প্রধানেরা মিলিয়া সালিশের দ্বারা গ্রামের বিবাদ ও মামলা মিটাইয়া দিবে।

জোতদার ও চাষা রায়ত যতদিন প্রত্যেকে স্বতন্ত্র থাকিয়া চাষবাস করিবে ততদিন তাহাদের অসচ্ছল অবস্থা কিছুতেই ঘুচিবে না……

য়ুরোপ আমেরিকায় কৃষির নানাপ্রকার মিতশ্রমিক যন্ত্র বাহির হইয়াছে—নিতান্ত দারিদ্র্যবশত সে-সমস্ত আমাদের কোনো কাজেই লাগিতেছে না—অল্প জমি ও অল্প শক্তি লইয়া সে-সমস্ত যন্ত্রের ব্যবহার সম্ভব নহে। যদি এক-একটি মণ্ডলী অথবা এক-একটি গ্রামের সকলে সমবেত হইয়া নিজেদের সমস্ত জমি একত্র মিলাইয়া দিয়া কৃষিকার্যে প্রবৃত্ত হয় তবে আধুনিক যন্ত্রাদির সাহায্যে অনেক খরচ বাঁচিয়া ও কাজের সুবিধা হইয়া তাহারা লাভবান হইতে পারে। যদি গ্রামের উৎপন্ন সমস্ত ইক্ষু তাহারা এক কলে মাড়াই করিয়া লয় তবে দামি কল কিনিয়া লইলে তাহাদের লাভ বৈ লোকসান হয় না। পাটের ক্ষেত সমস্ত এক করিয়া লইলে প্রেসের সাহায্যে তাহারা নিজেরাই পাট বাঁধাই করিয়া লইতে পারে। গোয়ালারা একত্র জোট করিলে গো-পালন ও মাখন ঘৃত প্রভৃতি প্রস্তুত করা সস্তায় ও ভালোমতে সম্পন্ন হয়।……

অতএব পল্লীবাসীরাই একত্রে মিলিলে যে-সকল যন্ত্রের ব্যবহার সম্ভবপর হয়, তাহারই সাহায্যে স্বস্থানেই কর্মের উন্নতি করিতে পারিলে সকল দিক রক্ষা পাইতে পারে। শুধু তাই নয়, দেশের জনসাধারণকে ঐক্যনীতিতে দীক্ষিত করিবার এই একটি উপায়। প্রাদেশিক সভা উপদেশ ও দৃষ্টান্ত দ্বারা একটি মণ্ডলীকেও যদি এইরূপে গড়িয়া তুলিতে পারেন তবে এই দৃষ্টান্তের সফলতা দেখিতে দেখিতে চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িবে।

এমনি করিয়া ভারতবর্ষের প্রদেশগুলি আত্মনির্ভরশীল ও ব্যূহবদ্ধ হইয়া উঠিলে ভারতবর্ষের দেশগুলির মধ্যে তাহার কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা সার্থক হইয়া উঠিবে এবং সেই দৈশিক কেন্দ্রগুলি একটি মহাদৈশিক কেন্দ্রচূড়ায় পরিণত হইবে।"

(পাবনা সম্মিলনীতে ভাষণ)

স্বপ্নে ও বাস্তবে মেশামেশি, একালে অতিমাত্রায় স্বাদেশিক ও পল্লীর কৃষকের জন্য ব্যথিত রবীন্দ্রনাথের এই প্রত্যাশা অবশ্য তাঁর জমিদারির মধ্যেই শেষ পর্যন্ত প্রত্যাশিত সার্থক হয়ে ওঠেনি। এর প্রধান কারণ বোধ হয় দেশহিতে আত্মোৎসর্গ করতে পারেন এমন কর্মীর অভাব। অবান্তর কারণ, হিন্দুতে হিন্দুতে এবং হিন্দু-মুসলমানে

সমঝোতার অভাব, ব্যাঙ্ক অচল হয়ে যাওয়া প্রভৃতি। অর্থনীতিবিদ্ ডঃ ভবতোষ দত্ত রবীন্দ্রনাথের সংগঠন সমবায় প্রভৃতি আদর্শের বাস্তব মূল্য স্বীকার ক'রে অসাফল্য বিষয়ে ঐ কথাই বলতে চেয়েছেন—'করবে কে ? লোক কই ?' ('আর্থিক উন্নতি ও রবীন্দ্রনাথ' —রবীন্দ্রায়ণ দ্রঃ)। বস্তুতঃ রবীন্দ্রনাথ তখনকার ইংরেজকৃপাভিক্ষু অথচ আন্দোলনসর্বস্ব শিক্ষিত নরমপন্থী বা চরমপন্থী স্বাদেশিকদের কাছেই তাঁর এই পবিকল্পনা রেখেছিলেন এবং প্রত্যাশা করেছিলেন তাঁরা না-ধর্মী অসার আন্দোলনের পথ ত্যাগ ক'বে গঠনমূলক স্বাদেশিকতাই গ্রহণ করবেন, কিন্তু শহর ছেড়ে এই দুরূহ কাজে ব্রতী হতে তাঁবা কেউই চাইলেন না। বোলপুর থেকে ১৯০৮ সালে লেখা চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ বলছেন, "আমাদের জমিদাবির মধ্যে একটা কাজ পত্তন ক'বে এসেছি। বিরাহিমপুব পরগণাটাকে পাঁচটা মণ্ডলে ভাগ কবে প্রত্যেক মণ্ডলে একজন অধ্যক্ষ বসিয়ে এসেছি ('কালীমোহন ঘোষ, ভূপেশচন্দ্র রায়, অনঙ্গমোহন চক্রবর্তী, প্যারীমোহন সেনগুপ্ত, অক্ষয়চন্দ্র সেন—এই পাঁচজন যুবক মণ্ডল-অধ্যক্ষ হন।'—ববীন্দ্র-জীবনী)। এই অধ্যক্ষেবা সেখানে পল্লী-সমাজ স্থাপনে নিযুক্ত। যাতে গ্রামের লোকে নিজেদেব হিতসাধনে সচেষ্ট হয়ে ওঠে—পথ-ঘাট সংস্কাব করে, শালিসের বিচারে বিবাদ নিষ্পত্তি কবে, বিদ্যালয় স্থাপন করে, জঙ্গল পবিষ্কাব করে, দুর্ভিক্ষেব জন্য ধর্মগোলা বসায় ইত্যাদি সর্বপ্রকাবে গ্রাম্য-সমাজেব হিতে নিজের চেষ্টা নিয়োগ কবতে উৎসাহিত হয় তাবই ব্যবস্থা করা গিয়েছে। আমাব প্রজাদের মধ্যে যাবা মুসলমান তাদের মধ্যে বেশ কাজ অগ্রসব হচ্ছে—হিন্দু পল্লীতে বাধাব অন্ত নেই। হিন্দুধর্ম হিন্দু-সমাজের মূলেই এমন একটা গভীব ব্যাঘাত বয়েছে যাতে ক'রে সমবেত লোকের হিতচেষ্টা অন্তব থেকে বাধা পেতে থাকে। এই সমস্ত প্রত্যক্ষ দেখে হিন্দুসমাজ প্রভৃতি সম্বন্ধে idealize ক'বে কোনো আত্মঘাতী শ্রুতিমধুর মিথ্যাকে প্রশ্রয় দিতে আর আমার ইচ্ছাই হয় না।"

প্রেরিত অধ্যক্ষদের নিযে সংগঠনের কাজ শিলাইদহে কিছু দিন চলে মাত্র, কিন্তু স্থানীয় ব্যক্তিদেব নিয়ে কালীগ্রামে যে তিনটি মণ্ডলী গঠিত হয় তার কাজ আরও বেশ কয়েক বৎসব চলে। কালীগ্রামে ও শিলাইদহে মণ্ডলীর কাজ ও সাধারণ ফণ্ডে অর্থদানের ব্যাপার যে ১৯১৫ খ্রীস্টাব্দেও সচল ছিল তার পরিচয় পাওয়া যায় ঐ সময়ে লেখা প্রমথ চৌধুরীকে একটি চিঠিতে (রবীন্দ্র-জীবনী ২য়, পৃঃ ৪৩২)। ঐ সময়েই কবি গ্রামের কাজের জন্য আর একদল যুবককেও তাঁর জমিদারিতে পাঠান। সম্ভবতঃ ১৯১৮-১৯এ জমিদারি পার্টিশন হবার পর সংগঠনের উৎসাহও স্তিমিত হয়ে আসে। এর পরের পালা স্থরুলে শ্রীনিকেতনে। লক্ষণীয় এই যে, যৌবনে মাটি ও মাটির কাছের মানুষের সঙ্গে কবির যে সুগভীর মমত্ব গড়ে উঠেছিল, সাহিত্যিক ও আন্তর্জাতিক

খ্যাতির সর্বোচ্চ সীমায় অবস্থান করেও এবং শান্তিনিকেতনে ক্রমবর্ধিত সারস্বত কোলাহলের মধ্যবর্তী হয়েও সেই বস্ত্রখণ্ডসম্বল অর্ধাশিত অশিক্ষিত মানুষের কথা এবং তাঁর ঐ পল্লীসংগঠনের আদর্শ তিনি বিস্মৃত হননি। পল্লীসংগঠনের অর্থ সহ দায়িত্ব নিয়ে এলম্‌হার্স্ট সাহেব স্বরুলে আসার পর ১৯২২ নাগাদ শ্রীনিকেতনের কাজ আরম্ভ হ'ল। কৃষিব উন্নতি-বিষয়ে দায়িত্ব নিলেন কৃষিবিৎ সন্তোষবিহারী বসু। শ্রীনিকেতনে পল্লী-সংগঠন বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত অত্যন্ত সজাগ ছিলেন এবং এ নিযে কী পবিমাণ ব্যগ্রতা ও উৎকণ্ঠা বহন কবতেন তাব পরিচয় রয়েছে 'রাশিয়াব চিঠি'র স্থানে স্থানে এবং একালে প্রদত্ত কয়েকটি ভাষণে ও আলাপে। এগুলি 'পল্লীপ্রকৃতি' পুস্তিকায সংগৃহীত হযেছে। 'রাশিয়াব চিঠি'তে দেখা যায, সংক্ষিপ্ত বাশিয়া-পরিদর্শনের মধ্যে তাঁব স্বদেশের কথাই বেশি ক'বে মনে পড়েছে, তিনি জাব-শাসিত রাশিয়াব অবস্থার সঙ্গে ভাবতবর্ষেব অবস্থাব সাদৃশ্য অনুভব কবেছেন এবং ব্যাপক পল্লী-সংগঠনেব মধ্য দিয়েই অশিক্ষা, দাবিদ্র্য, হিন্দু-মুসলিম বিবোধ এবং অবর্ণ-বর্ণ হিন্দুব অসাম্য দূব হওযাব সঙ্গে স্বাযত্তশাসন এবং পশ্চাৎ স্বাধীনতা কবায়ত্ত হতে পারে, বলশেভিক উদ্‌যোগ দৃষ্টে ঐ ধারণায তাঁব সুদৃঢ় প্রত্যযও জন্মেছে। সমাজতান্ত্রিক রাশিয়া দেখে এবং বিবরণ শুনে তিনি কপালে কবাঘাত কবেছেন এই ভেবে যে আমাদেব স্বাদেশিকেবা সমাজসংগঠনের দাযিত্ব নিলে এতদিনে দেশেব সামগ্রিক দুর্গতি-মোচনের পথ খুলে যেত। বহুপূর্ব থেকেই তাঁর ধাবণা, ইংরেজ আবেদনে-আন্দোলনে কাতব ও হয়বান হয়ে আমাদের স্বাধীনতা দিয়ে দিলেও তাতে প্রার্থিত জাতীয় সমুন্নতি ও সংহতি ঘটবে না, সাধারণ মানুষ স্বাধীনতার স্বাদে বঞ্চিতই থাকবে, যেমন—"কিন্তু এমন যদি হয় যে, একদিন ভাবত-ইতিহাসের পরিচ্ছেদ-পরিবর্তন-কালে প্রস্থানেব বেলায় ইংবেজ তাব সুশাসনেব ভগ্নাবশেষের উপব রাখিয়া গেল আত্মনির্ভরে অনভ্যস্ত, আত্মবক্ষায় অক্ষম, আত্মকল্যাণসাধনে অসিদ্ধ, আত্মশক্তিতে নষ্টবিশ্বাস বহুকোটি নবনাবীকে—রাখিয়া গেল এমন ক্ষেত্রে যেখানে প্রতিবেশী নব উদ্যমে জাগ্রত, নবশিক্ষায় অপবিমিত শক্তি-শালী—তবে আমাদের সেই চিরদৈন্যপীড়িত অন্তহীন দুর্ভাগ্যের জন্য কাহাকে আমরা দায়ী করিব?" ('ছোটো ও বড়ো'—কালান্তব)। সোভিয়েট দেশ পবিদর্শনে এই দুর্ভাগ্যের চিন্তাই বড়ো হয়ে তাঁকে দেশের জন্য অধিকতর উৎকণ্ঠিত ক'রে তুলেছে। স্বাদেশিক কবিব এই উৎকণ্ঠা ও বিলাপের পরিচয় 'বাশিয়াব চিঠি'তে নিম্নলিখিতভাবে প্রকাশিত হয়েছে। আমরা পূর্বেই বলেছি আত্মসমালোচনামূলক 'কালান্তরে'র প্রবন্ধাবলী থেকে 'পল্লী-প্রকৃতি'র ভাষণ পর্যন্ত সময়ে দেশকালে যথেষ্ট পরিবর্তন এলেও এবং রাষ্ট্রনীতি- ও সমাজ-বিষয়ে রবীন্দ্রচিত্তের ভাবনা কালানুযায়ী প্রতিধ্বনিত হলেও গ্রামকেন্দ্রিক স্বায়ত্তশাসনের এই ধ্রুবাদর্শ তাঁর চিন্তায় সেই

১৯০৪ খ্রীঃ থেকে অবিকৃতই রয়ে গেছে :

"আমরা শ্রীনিকেতনে যা করতে চেয়েছি, এরা সমস্ত দেশ জুড়ে প্রকৃষ্টভাবে তাই করছে। আমাদের কর্মীরা যদি কিছুদিন এখানে এসে শিক্ষা ক'রে যেতে পারত তাহ'লে ভারী উপকার হ'ত। প্রতিদিনই আমি ভারতবর্ষের সঙ্গে এখানকার তুলনা ক'বে দেখি আর ভাবি কী হয়েছে আর কী হতে পারত। আমার আমেরিকান সঙ্গী ডাক্তার হ্যারি টিম্বর্স এখানকার স্বাস্থ্যবিধানের ব্যবস্থা আলোচনা করছে—তার প্রকৃষ্টতা দেখলে চমক লাগে—আব কোথায় পড়ে আছে রোগতপ্ত অভুক্ত হতভাগ্য নিরুপায় ভারতবর্ষ। কয়েক বৎসব পূর্বে ভাবতবর্ষেব অবস্থাব সঙ্গে এদের জনসাধারণের অবস্থাব সম্পূর্ণ সাদৃশ্য ছিল—এই অল্পকালের মধ্যে দ্রুতবেগে বদলে গেছে—আমবা পড়ে আছি জড়তাব পাঁকেব মধ্যে আকণ্ঠ নিমগ্ন।" (রাশিয়াব চিঠি—১)

"কিন্তু এবারে বাশিয়া ঘুবে এসে সেই সৌন্দর্যেব ছবি আমাব মন থেকে মুছে গেছে। কেবলই ভাবছি আমাদেব দেশ-জোড়া চাষীদেব দুঃখেব কথা।...তখন চাষীদেব সঙ্গে আমাব প্রত্যহ ছিল দেখাশোনা—ওদেব সব নালিশ উঠেছে আমাব কানে। আমি জানি ওদেব মতো নিঃসহায় জীব অল্পই আছে, ওবা সমাজেব যে তলায় তলিয়ে সেখানে জ্ঞানেব আলো অল্পই পৌঁছায়, প্রাণেব হাওয়া বয় না বললেই হয়।.......

আমাব মনে আছে, পাবনা কনফাবেন্সেব সময আমি তখনকাব খুব বড়ো একজন বাষ্ট্রনেতাকে বলেছিলুম, আমাদেব দেশের রাষ্ট্রীয উন্নতিকে যদি আমবা সত্য কবতে চাই তা হ'লে সব আগে আমাদেব এই তলাব লোকদেব মানুষ কবতে হবে। তিনি সে কথাটাকে এতই তুচ্ছ বলে উড়িয়ে দিলেন যে আমি স্পষ্ট বুঝতে পারলুম আমাদেব দেশাত্মবোধীবা দেশ ব'লে একটা তত্ত্বকে বিদেশেব পাঠশালা থেকে সংগ্রহ ক'বে এনেছেন, দেশেব মানুষকে তাঁবা অন্তবেব মধ্যে উপলব্ধি করেন না।

চাষীকে আত্মশক্তিতে দৃঢ় ক'বে তুলতে হবে, এই ছিল আমার অভিপ্রায়। এসম্বন্ধে দুটো কথা সর্বদাই আমার মনে আন্দোলিত হযেছে—জমির স্বত্ব ন্যায়ত জমিদারেব নয়, সে চাষীব; দ্বিতীয়ত, সমবাযনীতি-অনুসারে চাষের ক্ষেত্র একত্র ক'বে চাষ না কবতে পাবলে কৃষিব উন্নতি হতেই পারে না। মান্ধাতার আমলেব হাল লাঙল নিয়ে আল-বাঁধা টুকরো জমিতে ফসল ফলানো আব ফুটো কলসীতে জল আনা একই কথা।..

কিন্তু এই দুটো পন্থাই দুরূহ। প্রথমত, চাষীকে জমির স্বত্ব দিলেই সে স্বত্ব পরমুহূর্তেই মহাজনেব হাতে গিয়ে পড়বে, তার দুঃখভার বাড়বে বই কমবে না।...

চাষীদের ডেকে যখন সমস্ত জমি একত্র ক'রে কলের লাঙলে চাষ করার সুবিধের কথা বুঝিয়ে বললুম, তারা তখনই সমস্ত মেনে নিলে। কিন্তু বললে, আমরা নির্বোধ, এত বড়ো ব্যাপার করে তুলতে পারব কী করে? আমি যদি বলতে পারতুম 'এ ভার আমিই নেব' তাহ'লে তখনই মিটে যেতে পারত। কিন্তু আমার সাধ্য কী?··

নিজের দেশের চাষী মজুরদের মনে পড়ল। মনে হ'ল আরব্য উপন্যাসের জাদুকীর্তি। বছর দশেক আগে এরা ঠিক আমাদের দেশের জনমজুরদের মতোই নিরক্ষর নিঃসহায় নিরন্ন ছিল, তাদেরই মতো অন্ধ সংস্কার এবং মূঢ় ধার্মিকতা। দুঃখে বিপদে এরা দেবতার দ্বারে মাথা খুঁড়েছে, পরলোকের ভয়ে পাণ্ডা পুরুষদের হাতে এদের বুদ্ধি ছিল বাঁধা, আর ইহলোকের ভয়ে রাজপুরুষ মহাজন ও জমিদারদের হাতে, যারা এদের জুতোপেটা করত তাদের সেই জুতো সাফ করা এদের কাজ ছিল। হাজার বছর থেকে এদের প্রথাপদ্ধতির বদল হয়নি, যানবাহন চরকাঘানি সমস্ত প্রপিতামহের আমলের, হালের হাতিয়ারে হাত লাগাতে বললে বেঁকে বসত। কটা বছরের মধ্যে এই মূঢ়তার অক্ষমতার পাহাড় নড়িয়ে দিলে যে কী ক'রে সে কথা এই হতভাগ্য ভারতবাসীকে যেমন একান্ত বিস্মিত করেছে এমন আর কাকে করবে বলো।"

'রাশিয়ার চিঠি' সম্বন্ধে আমরা এই পরিচ্ছেদের তৃতীয় অংশে আলোচনা করব। এখানে ঐ উদ্ধৃতি দেওয়ার মর্মার্থ হ'ল, রাশিয়ার উন্নতির পন্থা এবং গঠনমূলক স্বাদেশিকতার মাধ্যমে ভারতের উন্নতির পন্থার সাদৃশ্য পূর্বেই রবীন্দ্র-চিন্তায় কিভাবে উপলব্ধ হয়েছিল তার পরিচয় দেওয়া। রবীন্দ্রনাথের বাস্তব ও প্রগাঢ় মানবিকতা ও স্বাদেশিকতার মৌলরূপটি ঐ স্বদেশী সমাজের কাল থেকে শেষ পর্যন্ত কতদূর অপরিবর্তিত ছিল তা দেখানোও আমাদের উদ্দেশ্য। অবহেলিত নিরক্ষর মানুষের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার, সমবায় ও যন্ত্রের সাহায্যে কৃষির উন্নতি, কৃষকের জীবনধারণের মানের উন্নতি এবং এইভাবে অবহেলিত মানুষের মধ্যে শক্তির উদ্‌বোধনেই যথার্থ স্বাধীনতা—এই ধারণায় রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস অবিচল ছিল ব'লেই স্বদেশীর প্রথম অধ্যায়ে বয়কট ও গুপ্ত বিপ্লবের আন্দোলনের সঙ্গে, দ্বিতীয় অধ্যায়ে অসহযোগ চরকা ও বয়কটের সঙ্গে এবং তৃতীয় অধ্যায়ে ভাগ-বাঁটোয়ারা নিয়ে গোলটেবিল বৈঠক প্রভৃতির সঙ্গে তাঁর আদর্শের মিল তিনি পাননি। ফলে তিনি নিজেও যেমন স্বদেশী আন্দোলনের সমালোচনা করেছেন সর্বস্তরেই, তেমনি তাঁর জাতীয়তা ও মানবিকতার দিকটি স্বাদেশিকদের কাছে অস্পষ্ট ছিল ব'লে তিনিও সমালোচিত হয়েছেন অনেকেরই লেখনীতে। স্বদেশ- ও জাতীয়তা-সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের আন্তরিকতা প্রবল ছিল না এমন সন্দেহও সেকালে স্বাদেশিকদের মধ্যে ব্যাপক হয়ে উঠেছিল। সুতরাং রবীন্দ্রনাথ

তাঁর বিশেষ ধবনের স্বাদেশিকতায় অর্থাৎ গ্রামকেন্দ্রিক স্বায়ত্তশাসনের তত্ত্বে কতদূর আন্তরিক ও প্রত্যয়বান্ ছিলেন তার পরিচয় দিয়ে সমাজবাদী ও স্বাদেশিক রবীন্দ্রনাথ বিষযে আমাদের বিববণের সমাপ্তির দিকে আসছি। ১৯২৬ খ্রীঃ ময়মনসিংহে প্রদত্ত ভাষণের উপসংহারে মনীষী কবি বলছেন—

> "আমি আজ যা বলছি তা আমার প্রাণ দিয়ে, আয়ুক্ষয় ক'রে। আমার যে স্বল্পাবশিষ্ট আয়ু তাই আমি দিচ্ছি আমার প্রতি নিশ্বাসে। এব পবিবর্তে আমি চাই সত্যকার কর্মী। পল্লীপ্রাণের বিচিত্র অভাব দূব করবার জন্যে যারা ব্রতী তাদের পাশে আমি আপনাদের আহ্বান কবছি। তাদেব আপনারা একলা ফেলে রাখবেন না,—অসহায় ক'বে রাখবেন না, তাদেব আনুকূল্য করুন। কেবল বাক্যবচনায় আপনাদের শক্তি নিঃশেষিত হলে, আমাকে যতই প্রশংসা করুন, ববমাল্য দিন, তাতে উপযুক্ত প্রত্যর্পণ হবে না। আমি দেশের জন্যে আপনাদেব কাছে ভিক্ষা চাই। শুধু মুখের কথায আমাকে ফিরিযে দেবেন না। আমি চাই ত্যাগেব ভিক্ষা, তা যদি না দিতে পাবেন তবে জীবন ব্যর্থ হবে, দেশ সার্থকতা লাভ কবতে পারবে না, আপনাদেব উত্তেজনা যতই বড়ো হোক-না কেন। আমাব স্বল্পাবশিষ্ট নিঃশ্বাস ব্যয করে একথা বলছি—আপনাদের মনোরঞ্জনের জন্যে, স্তুতিলাভের জন্যে কিছু বলছি না—দেশের জন্যে আমার ভিক্ষাপাত্র ভরে দিন ত্যাগ দিয়ে, কর্মশক্তি দিয়ে।"

কবির এরকম কাতরোক্তির পিছনে কেবল তাঁর মানবদরদী অন্তরই কাজ কবে নি, স্বাদেশিক আন্দোলনের উপর তিনি যে কিছুমাত্রও আস্থা রাখেন নি এবকম উক্তি তারও প্রমাণ। এবই পাশাপাশি দেখা যাক শান্তিনিকেতনে সমবেত শিক্ষিত সাহিত্যব্যবসায়ী ও ধনী মধ্যবিত্তদের প্রতি প্রযুক্ত অভিযোগ :

> "আমি এখানে কবি নই। এ কবির ক্ষেত্র নয়। সাহিত্য নিয়ে আমি এখানে কারবার করি নে।……আজ আপনারা সাহিত্যিকরা এখানে এসেছেন, আপনাদের সহজে ছাডছি নে—আপনাদের দেখে যেতে হবে আমাদেব এই অনুষ্ঠান। দেখে যেতে হবে দেশের উপেক্ষিত এই গ্রাম, বাপ-মায়ের তাডানো সন্তানের মতো এই গ্রামবাসীদের, এই উপেক্ষিত হতভাগারা কেমন কবে ছিন্ন বস্ত্র নিয়ে অর্ধাশনে দিন কাটায়। আপনাদের নিজের চোখে দেখতে হবে, কত বড়ো কর্তব্যের গুরুভার আমাদের ও আপনাদের উপর রয়েছে। এদের দাবি পূর্ণ করবার শক্তি নেই—আমাদের এর চেয়ে লজ্জা ও অপমানের কথা আর কী আছে! কোথায় আমাদের

দেশের প্রাণ, সত্যিকার অভাব-অভিযোগ কোথায়, তা আপনাদের দেখে যেতে হবে। আবার সত্যিকার কাজ কোথায় তাও আপনারা দেখে যান। আমি আমার জীবনে অনেক নিন্দা সয়েছি, অনেক নিন্দা এখনও আমার ভাগ্যে আছে। আমি ধনীসন্তান, দরিদ্রের অভাব জানি না, বুঝতে পারি না—এ অভিযোগ যে কত বড়ো মিথ্যা তা আপনারা আজ উপলব্ধি করুন। দরিদ্রনারায়ণের সেবা তাঁরাই করেন যাঁরা খবরের কাগজে নাম প্রকাশ করেন।......”

সমাজবাদী কবির সংগঠকরূপের পরিচয় দেখা গেল। আধুনিক অর্থনীতিক ও সমাজ-নীতিক তত্ত্বের দৃষ্টিতে এই পরিকল্পনার মধ্যে অবশ্যই কিছু কিছু অভাব থেকে গেছে, যদিচ সমবায় পদ্ধতিতে যন্ত্রসহায়ে কৃষি এবং ক্ষুদ্রশিল্প গঠনের দ্বারা দরিদ্র দেশে জনকল্যাণ, এবিষয়ে দ্বিমত থাকতে পারে না। কিন্তু জমিদারদের এ-ব্যাপারে সমর্থন এবং জোতদারদের কৃষিতে ও মহাজনদের ক্ষুদ্রশিল্পে পণ্যভাণ্ডারে ও ব্যাঙ্কে সহযোগিতার বিষয়টি তাঁর চিন্তা ও কর্মপ্রণালীর মধ্যে উপেক্ষিতই থেকে গেছে। রবীন্দ্রনাথ জানেন যে ‘চুনোপুঁটির ঝাঁক নিয়েই রায়ত’ কিন্তু সেই চুনোপুঁটির খণ্ড খণ্ড জমি একত্র ক’রে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত সমবায়ে তাদের কোনো লাভ হয় কিনা সন্দেহ। বস্তুত তা হয়ওনি। কৃষি সমবায়ও কতকগুলি শর্তের উপর নির্ভর করে। জমিদারি প্রথার বিলোপ, ভূমিসংস্কার প্রভৃতি সেই শর্ত। ভারতের বর্তমান স্বাধীন সরকার সে পথে পদক্ষেপ ক’রেও যেভাবে ধীর গতিতে চলতে বাধ্য হচ্ছেন তাতে বিদেশী সরকারের অধীনে এরকম সংস্কার অকল্পনীয়। বিশেষতঃ অনুগত জমিদারশ্রেণীর সংরক্ষণ ইংরেজ ঔপনিবেশিক শাসনের স্থায়ী নীতি। রবীন্দ্রনাথ জমিদারশ্রেণীকে আত্মোৎসর্গে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন এবং বোধ হয় ভেবেছিলেন যে নূতন সমাজ সংগঠিত হয়ে গেলে পর এর চাপে জমিদার মহাজন শ্রেণী সেই সমাজের আনুগত্য স্বীকার করবে। কিন্তু বৈদেশিক সহায়তায় স্বার্থে ও স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত জমিদারদের দেশব্রতী ব’নে যাওয়ার প্রত্যাশা খুব বেশি প্রত্যাশাই ছিল। তা ছাড়া রবীন্দ্রনাথের স্বদেশীসমাজ গঠন হয়ত বা পুরাতন সমাজেরই নবীকরণ মাত্র। এই পুরাতন সমাজের কতকগুলি সুবিধার কথা রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন। মণ্ডলপতি বা পঞ্চপ্রধানের নির্ধারিত ব্যবস্থা না মানলে ‘একঘরে’ ক’রে রাখার ব্যবস্থা হয়ত এই নবীন সমাজেরও একটি নীতি। জাতিবর্ণ বা হিন্দু-মুসলমান ভেদবুদ্ধির কার্যকর বিলোপ রবীন্দ্রনাথের সমাজ-সংবিধানের অঙ্গীভূত ছিল না। রবীন্দ্রনাথ যদিও কায়মনোবাক্যে ভেদবুদ্ধির অন্ধতার অপসারণই চেয়েছিলেন এবং এটি তাঁর সংগ্রামের অন্যতম বিরুদ্ধ পক্ষ, তবু এই নিতান্ত কোমল ক্ষতস্থানটিতে হাত দিতে তিনি চান নি, বোধ হয় তাঁর ধারণা ছিল যে সংগঠনের পথে শিক্ষা-বিস্তারের

সঙ্গে সঙ্গে এবং মিলে মিশে কাজ করতে করতে ব্যাধি দূর হয়ে যাবে। কিন্তু ব্যাপক শিক্ষার এবং যথার্থ শিক্ষার বিস্তারও অত্যন্ত দুরূহ ব্রতই বলতে হবে। প্রথম স্বদেশী আন্দোলনে শহর ক'লকাতায় এবং অন্যত্র যে ক'টি জাতীয় বিদ্যালয় গড়ে উঠেছিল তা-ই অচল হয়ে গেল, আর আজ পঁচিশ বৎসরের স্বাধীনতার পর শিক্ষিতের সংখ্যা, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা এবং শিক্ষার স্বরূপ ও মান অনুধাবন ক'রে দেখলে তখনকার উদ্যোগের ফলাফল বিষয়ে তেমন কোনো আশা অনুভব করা যায় না। আমরা ধরে নিচ্ছি দেশশুদ্ধ স্বার্থত্যাগী যুবকেরা কাজে নামলে অর্থের অভাব হ'ত না, অর্থাৎ বিদেশী শাসকদেব প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর দিয়েও, জলেব দবে চা, পাট বিক্রি ক'রেও 'হিতৈষী সভা'র অনুরূপ প্রতিষ্ঠানে গ্রামবাসীরা কর দিত, কিন্তু স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বিচার, নিযোগ, কৃষিব উন্নতি, বাণিজ্য, সংস্কৃতি প্রভৃতি গডে তুলতে অক্লান্ত অধ্যবসায়ী স্বল্পবেতনভুক্ কর্মী মিলত কি? রবীন্দ্রনাথের শিলাইদহ-অভিজ্ঞতায় মেলেনি। শ্রীনিকেতনে ভাগ্যক্রমেই এলম্‌হার্স্ট, শ্রীমতী গ্রীন্‌, সন্তোষবিহারী প্রভৃতিব মতো কয়েকজন স্বার্থত্যাগী কর্মীকে পাওয়া গিযেছিল। সর্বশেষ প্রশ্ন, এই পাণ্টা সরকাবেব মত স্বায়ত্তশাসনগঠনে সাম্রাজ্যবাদীদেব ব্যবসা-বাণিজ্যে বাধা পডলে অবশ্যম্ভাবী ঘাত-প্রতিঘাত ডেকে আনত না কি? বস্তুত এই পরিকল্পনায ববীন্দ্রনাথ সাম্রাজ্য-বাদীদের সদিচ্ছা এবং নিষ্ক্রিয় আনুকূল্যের উপবেও অলিখিতভাবে বেশ কিছুটা নির্ভব করেছিলেন।

সোভিয়েট দেশ পরিদর্শনে রবীন্দ্রনাথ বলশেভিকদের আট-দশ বছবের কার্য-কাবিতায় পরিবর্তনের পরিমাণ দেখে বিস্ময় প্রকাশ কবেছেন, কিন্তু একথা ভেবে দেখেন নি যে সশস্ত্র বিপ্লবের সাহায্যে পুবাতনকে বিচূর্ণ ক'রে রাষ্ট্রক্ষমতা আয়ত্ত কবাতেই এবকম পবিবর্তন আনার সুযোগ পাওয়া গিয়েছিল। ভারতবর্ষে সাম্রাজ্যবাদী শোষণ বজায় থাকতেই রবীন্দ্রনাথ সোভিয়েটদের অনুরূপ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষিতে পরিবর্তন কিভাবে প্রত্যাশা করেন তা বোঝা যায় না।

'রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী সমাজ ঠিক বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পরিচয় বহন করে না। সমাজতন্ত্রের গোড়ার কথা হ'ল উৎপাদন-ব্যবস্থাগুলির সাধারণীকরণ। তখনকার কৃষি-উৎপাদন জমিদার-জোতদারদের হাতে এবং পণ্য-উৎপাদন প্রধানভাবে বিদেশীয়। এগুলির স্বাধিকারে হস্তক্ষেপের কোনো উদ্যোগ তাঁর সমাজ সংবিধানে ছিল না। রবীন্দ্রনাথ শেষ পর্যন্ত, এমন কি রাশিয়া-পরিদর্শনের পরও, ধনসম্পত্তির ব্যক্তিগত অধিকার বিলোপ না করার পক্ষেই মত প্রকাশ করেছেন। কারণ, তাঁর ধারণায় সম্পত্তির ব্যক্তিগত অধিকারের বিলোপে ব্যক্তিত্বের স্বাধীন বিকাশে বাধা পড়লে সমাজে জ্ঞানবিদ্যাকলাশিল্পের উৎকর্ষ বিঘ্নিত হবে। ধনসম্পদের বৈষম্যকে

তিনি সমবায়ের দ্বারা শোধন করতে চেয়েছিলেন, অথবা সমবায়-শক্তির সাহায্যে দরিদ্রের ব্যক্তিগত অশক্তি নিবারণ করতে চেয়েছিলেন। জোতদার-মহাজনদের স্বাধিকার ও শক্তি আপাততঃ খর্ব করার কোনো পদ্ধতি তিনি উপস্থাপিত করেননি। জমিদাবদের কাছে তিনি শুধু অনুনয় করেছেন, আর বিদেশী পণ্য বর্জনে উৎসাহ দিয়েছেন এদেশী পণ্য প্রস্তুত করার পব। বয়কট-আন্দোলনের মধ্যে যে জববদস্তি দেখা গিয়েছিল তা তিনি সমর্থন কবেন নি, কাবণ, এতে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টি হচ্ছিল। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে যে একটি বাস্তব অনৈক্য রয়েছে এ বোধ ববীন্দ্রনাথের বহুপূর্বেকাব হলেও বঙ্গভঙ্গ- এবং বয়কট-আন্দোলনের পর বিষয়টি নিয়ে তিনি কার্যকব ভাবে ভাবতে আরম্ভ করেন। কারণ, বিলাতি বস্ত্র দামে সস্তা হওয়ায এবং মুসলমান সম্প্রদায়ের কতিপয ধনী ব্যক্তি রাজসবকারে প্রতিপত্তিলাভেব আকাঙ্ক্ষায় বয়কট-আন্দোলনেব বিরুদ্ধে প্রচাব করায সাধাবণভাবে মুসলমানেবা এ আন্দোলনে যোগ দেন নি। কিন্তু এ কারণও বহিরঙ্গ। ববীন্দ্রনাথ দেখেছিলেন হিন্দু-মুসলমানে যথার্থ অনৈক্য রয়েছে এবং তারও কারণ বিশেষভাবে হিন্দুব মধ্যেই। এ-কে তিনি আভ্যন্তবীণ পাপ ব'লে অভিহিত করলেন এবং 'ব্যাধি ও প্রতিকার' প্রবন্ধে প্রথম কার্যকবভাবে হিন্দু-মুসলিম সামাজিক ঐক্যের প্রয়োজনীযতা-বিষযে নিজেব মত প্রকাশ কবলেন। এর পরেই 'সমস্যা', 'সদুপায়' প্রবন্ধে এবং পাবনা সম্মিলনীতে ভাষণে বিষযটিব উপব জোব দিয়ে বললেন। এ বিষযে শেষ পর্যন্ত ববীন্দ্রনাথের ধাবণা হ'ল হিন্দু-মুসলমান না মিললে 'স্বায়ত্তশাসন হবে ফুটো কলসীতে জল ভরা'।

ববীন্দ্রনাথের নব সমাজগঠনের পরিকল্পনা আদর্শে-বাস্তবে প্রাচীন-নবীনে মেশামেশি হলেও এবং খাঁটি সমাজতান্ত্রিক সংগঠন না হলেও বা স্বার্থত্যাগী কর্মীর অভাবে কার্যকর না হলেও এর কয়েকটি সম্ভাব্য প্রগতিমূলক উপকাবিতার দিক স্বীকার না ক'রে উপায় নেই। এব প্রথম হ'ল বিভিন্নতার মধ্যে ঐক্য সংগঠন, জাতীযচেতনার প্রসারের সঙ্গে জাতীয়তাবাদের উদ্বোধন, শিক্ষার বিস্তার এবং শিক্ষিত-অশিক্ষিতের শ্রেণীভেদের বিলোপ আর সমবায় সাহায্যে কৃষকদের আর্থিক অবস্থার যথাসাধ্য উন্নতি। স্বদেশী আন্দোলনে কোনোকালেই এরকম পল্লীসংগঠনকে কার্যক্রমের মধ্যে আনা হয়নি। মহাত্মা গান্ধী কংগ্রেস ত্যাগ করার সংকল্প নিয়ে আংশিক ভাবে এরকম উদ্‌যোগ গ্রহণ করেন, সেও ১৯৩৪ খ্রীঃ এর আগে নয়। এবও কিছু আগে সুভাষচন্দ্র মতবৈষম্যমূলক গতানুগতিক রাজনীতিতে ক্লান্ত হয়ে একবার পল্লীসংগঠনেব কর্মসূচী উপস্থাপিত করেছিলেন। যাই হোক, স্বাধীনতার পববর্তী স্বায়ত্তশাসনের অধ্যায়ে এমন কি আজ পর্যন্তও একথা প্রমাণিত সত্য যে কংগ্রেসের অসহযোগ

আন্দোলনের পাশাপাশি পল্লীসংগঠনের নীতি সামগ্রিক ও কার্যকর ভাবে অনুসৃত হলে হয়ত-বা লোককল্যাণের পথ এত দুর্গম হত না। মানুষে মানুষে এত বিভেদ এবং জাতীয় চরিত্রেব এত ঘোরতর অবনতি ঘটত না এবং বিভক্ত ভারত গ্রহণ করতে বাধ্য হতে হত না। সক্রিয় সংগঠনের মধ্য দিয়ে হিন্দু-মুসলমান যে এক জাতি হতে পারে, তা সুভাষচন্দ্র প্রমাণ করেছেন। এবং হিসেব-নিকেশের কথা বাদ দিয়ে একটি ভাবুকতার সূত্রে হিন্দু-মুসলমানকে একত্র করা এদেশেও অসম্ভব ছিল না, যেহেতু পূর্বে পূর্বে কবীর, নানক, শ্রীচৈতন্য প্রবর্তিত ধর্মের সূত্রে সে ঐক্য একদা গড়ে উঠেছিল। সেক্ষেত্রে অবশ্য বলা যায় যে ইংরেজরূপ তৃতীয় পক্ষেব ইন্ধন ছিল না। একথা কোনো কোনো ইতিহাসে স্বীকৃত যে ইংরেজ শাসকের ইচ্ছামত ভেদনীতি হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের তথা দ্রুত স্বাধীনতা-লাভেব পরিপন্থী হয়েছে। এমন ধাবণা তখনকার হিন্দু স্বাদেশিক নেতারাও পোষণ কবতেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বিষয়টিকে ঐভাবে দেখেন নি। হিন্দু-মুসলিম সামাজিক বিভিন্নতাকেই তিনি মৌলিক পাপ ব'লে মনে করেছেন। এইভাবে স্বদেশী আন্দোলন কেবল শিক্ষিত ব্যক্তিব মধ্যে ও শহর অঞ্চলে সীমিত না হলে স্বাধীনতা হয়ত ত্বরান্বিত ও সার্থক হতে পারত। পল্লীব শিক্ষা ও অর্থনীতিক অবস্থাও ইতিমধ্যে স্থাযী পদ্ধতিব মধ্য দিয়ে, খানিকটা এগিয়ে যেতে পারত। আজকেব স্বাধীন ভাবতে পঞ্চাযেৎ, ব্লক-উন্নযন, জেলা পরিষদ্ প্রভৃতির মধ্য দিয়ে পল্লী-উন্নযনেব যে প্ল্যান ও পদ্ধতি বযেছে তার অসম্পূর্ণতা দৃষ্টে ববীন্দ্র-উদ্ভাবিত পন্থাব সার্বিক উপযোগিতা স্বীকাব কবতেই হবে। বস্তুতঃ সাম্প্রতিক সবকাবি প্রয়াসেব মধ্যে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাস্তাঘাট, পানীয় জল, সেচব্যবস্থা প্রভৃতি কর্মের উদ্‌যোগ থাকলেও সব মিলিয়ে সাম্য একতায় বলিষ্ঠ মহৎ জাতিগঠনের পূর্ণাঙ্গ উদ্‌যোগ এই কর্মপ্রয়াসেব মধ্যে লক্ষ্য করা যাচ্ছে না।

রবীন্দ্রনাথেব এই স্বাদেশিক কর্মচিন্তাব কোনো ভাবরূপ তাঁব কাব্যে কবিতায় প্রকাশ পেয়েছিল কিনা দেখতে হবে। এবিষয়ে উল্লেখযোগ্য হল ১৯০৯ খ্রীঃ এর গোড়ার দিকে লেখা 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকের ধনঞ্জয় বৈরাগী ও প্রজাদের ভূমিকা। ধনঞ্জয় বৈরাগীর চরিত্রে আফ্রিকায় সত্যাগ্রহী গান্ধীজীর কার্যক্রমের কিছুটা আভাস আছে। কিন্তু একটি বিষয়ে গুরুতর পার্থক্যও রয়েছে। গান্ধীজী সরকার বা জমিদারের বিধিনির্দিষ্ট কর বন্ধ করার আন্দোলনকে তাঁর অহিংস নীতির বিরোধী ব'লে মনে করতেন, এমনকি ভাবতে সত্যাগ্রহ-আন্দোলনের প্রথম উচ্ছ্বাসে ১৯২১-২২ এ যখন জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে আইন অমান্য প্রভৃতির সঙ্গে খাজনা বন্ধের আন্দোলনও শুরু করে, তখন এই সংবাদে গান্ধীজী বিক্ষুব্ধ হন। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সভায় কর-বন্ধের আন্দোলন প্রত্যাহার করতে নির্দেশ দেওয়া হয়। অথচ দেখা যায়

'প্রায়শ্চিত্তে'র ধনঞ্জয় বৈরাগী খাজনা না দেওয়ার প্রবল সমর্থন করছেন। এইজন্য অনুমান হয়, 'স্বদেশী সমাজে'র প্রাথমিক পরিকল্পনায় রায়তদের খাজনা দেওয়া-না-দেওয়া বিষয়ে কোনো বিতর্ক রবীন্দ্রনাথের চিত্তে উদিত না হলেও এবং তাঁর নিজ পরগণায় কালীগ্রাম ও বিরাহিমপুরে প্রজাদের প্রদেয় খাজনার অতিরিক্ত উন্নয়নমূলক চাঁদা আদায় করার ব্যবস্থা থাকলেও, রূঢ় বাস্তব অবস্থার দাবি যেখানে নেই এমন সাহিত্যসৃষ্টিতে আদর্শ ব্যবস্থাকেই তিনি বরণ ক'রে নিয়েছেন। মনে হয় "গ্রামে গ্রামে যথার্থ স্বরাজ" প্রতিষ্ঠার স্বপ্নে ব্যাকুল কবি তাঁর পরবর্তী চিন্তায় শেষ পর্যন্ত করবন্ধের অনিবার্যতায় উপনীত হয়েছিলেন। তিনি জমিদারি ব্যবস্থা তুলে দেওয়ার সমর্থন যে করেন নি সেও প্রবল সাময়িক প্রয়োজনে, আর, কিঞ্চিৎ সারচার্জ সহ নিজ এলাকায় যে কর-আদায়ের ব্যবস্থা করেছিলেন সেও বাস্তব অবস্থা বিবেচনা ক'রে। তা ছাড়া জমিদারির তিনি অংশীদার ও পরিচালক মাত্র ছিলেন। সাহিত্যের চিত্রে শুদ্ধ নীতিকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে তাঁকে করবোধের দিকটিই তুলে ধরতে হয়েছে। তাঁর কার্যকরী স্বদেশীয় প্ল্যান দেশের রাজনীতিক নেতারা গ্রহণ করলেন না। শুধু বয়কট ও সভা নিয়েই রইলেন, এতে রবীন্দ্রনাথ দুঃখবোধ করেছিলেন এবং তাঁর পক্ষে প্রায় অসাধ্য হলেও যতদূর সম্ভব সময় শক্তি ও অর্থ ব্যয় ক'রে পল্লীসংগঠনে আত্মনিয়োগ করেছিলেন ব'লে তিনি পরবর্তীকালে শ্রীনিকেতনে প্রদত্ত ভাষণে কয়েকবার উল্লেখ করেছেন। গ্রামীণ মানুষ বা কৃষকপ্রজার দুর্গতির জীবনই তাঁকে এই দুঃসহ কর্মে প্রবৃত্ত করিয়েছিল। এবিষয়ে তাঁর দুঃখবোধ ও উদ্দীপনাবোধের আত্মপরিচয় ১৯০৭ খ্রীঃ প্রথমের দিকে লেখা 'সুপ্রভাত' কবিতায় পরিস্ফুট হয়েছে ব'লে মনে করি। কবিতাটি প্রথম হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার অবসরে লেখা। ঐ কবিতাটির প্রারম্ভে রয়েছে "বক্ষে বেজেছে বিদ্যুৎবাণ স্বপ্নের জাল ছেদিয়া" এবং "ভাবিতে-ছিলাম উঠি কি না উঠি" প্রভৃতি উদ্দীপনা ও সংশয়-বিতর্কের পরিচয়। কবিতাটির মধ্যবর্তী অংশে রয়েছে 'চলমান শ্মশান' স্বদেশের শিক্ষাহীন অন্নহীন শুধু নামে-মানুষ কৃষকদের জীবনযাত্রার বর্ণনা—"তোমার শ্মশানকিংকর-দল দীর্ঘ নিশায় ভুখারি" প্রভৃতি। স্বল্প পরে প্রদত্ত পাবনা-সম্মিলনীতে ভাষণের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ জমিদারদের কাছে কাতরকণ্ঠে যে আবেদন করেছেন তার চিত্র ফুটেছে—"অতিথি তারা যে আমাদের ঘরে" প্রভৃতির মধ্যে। আর শিক্ষিত-অশিক্ষিত, হিন্দু-মুসলমানের দুস্তর সামাজিক বিভেদ বিপ্লবের মধ্য দিয়ে বিচূর্ণ হবে এই প্রত্যাশা নিয়ে কাব্য শেষ করা হয়েছে এবং এর মধ্যে প্রথম হিন্দু-মুসলিম সংঘাতরূপ বিপরীত প্রতিক্রিয়ার চেতনাকে অভিনন্দিতও করা হয়েছে, যেমন—"ভালোই হয়েছে ঝঞ্ঝার বায়ে, প্রলয়ের জটা পড়েছে ছড়ায়ে······মিলনযজ্ঞে অগ্নি জ্বালাবে বজ্রশিখার দাহনে" প্রভৃতির

মধ্যে। এই সমসকাব স্বদেশী আন্দোলনে বিলাতি বস্ত্র ও লবণ বযকটকে কবি শেষ পর্যন্ত সমাদব কবতে না পাবলেও (কারণ, এর ফলেই হিন্দু-মুসলমান বিরোধ প্রকট হয়ে উঠেছিল) শ্রীঅববিন্দের চাবিত্র্য ও কার্যক্রমেব উপর তাঁব গভীব আস্থা যে ছিল তার পবিচয 'অববিন্দ, ববীন্দ্রের লহো নমস্কার' কবিতায় স্পষ্টাক্ষবে লিখিত বযেছে। বস্তুতঃ বঙ্গভঙ্গের সময়কার স্বদেশীতে কবি প্রথমেব দিকে যেভাবে মনপ্রাণ দিয়ে আত্মনিয়োগ কবেছিলেন, গান্ধীজীর আন্দোলনেব কোনো পর্যায়েই তা পাবেন নি। অসহযোগেব মধ্যবর্তী নৈযুজ্যবাদকে বহু পবে তিনি মাত্র আংশিকভাবে সমর্থন করেছিলেন। কবেন নি এই জন্য যে এব মধ্যে আত্মসংগঠন ও প্রযোজনীয় দুরূহ তপস্যা নেই, নেই অর্থনীতিক ও সামাজিক পেষণে জর্জরিত সংখ্যাগবিষ্ঠ মানুষেব স্বাধীনতার কার্যকব আশ্বাস। সেই পর্যাযের আলোচনায এখন আমরা আসছি।

ববীন্দ্রনাথ কবি এবং ভাবুক হিসেবে যেমন চঞ্চলস্বভাবেব, চিন্তাশীল এবং কর্মী হিসেবে হযত তেমন নন। অন্ততঃ বাষ্ট্র ও সমাজ বিষযে তাঁব চিন্তাধারাব মূল দৃষ্টিকোণ খ্রীঃ ১৯০৪ থেকে ১৯৪০ পর্যন্ত গুরুতব কোনো পবিবর্তনেব অভিমুখীন হয়নি, দেশকাল ও অভিজ্ঞতা হিসেবে বৈচিত্র্যেব বাহক হযেছে মাত্র। মোটামুটি এই বৈচিত্র্য ধরেই আমাদের পর্যাযবিভাগ। নতুবা ১৯০৪ এব পূর্বেকাব যুবোপীয বাষ্ট্রগুলিব সাম্রাজ্যবাদেব ও বাষ্ট্রস্বার্থেব সমালোচনা থেকে ১৯৪১-এব 'সভ্যতাব সংকটে'ব ইংবেজশাসন-সম্পর্কে হতাশাব পবিচয একই সূত্রে গাঁথা। আবাব ১৯০৪ খ্রীঃ উচ্চাবিত গ্রামীণ স্ববাজ সংগঠনেব আদর্শ ও পতিসব-শিলাইদহেব কর্মধাবা শ্রীনিকেতন পর্যন্ত প্রসাবিত। কিন্তু এবই মধ্যেকাব ১৯০১ খ্রীঃ উপলক্ষ তীব্র স্বাদেশিকতাব উচ্ছ্বাসে প্রাচীন জীবনধাবাব অনুবর্তন, ১৯১২ খ্রীঃ পব থেকে ইংলণ্ডেব ও য়ুবোপেব মনীষীদেব সংস্পর্শে আসায যুবোপেব জীবনধাবাব মহিমা উপলব্ধি, মহাযুদ্ধেব পব যুবোপেব উগ্র বাষ্ট্রস্বার্থ বা জাতীযতাবাদেব প্রতি তীব্র আক্রমণ এবং সেই সঙ্গে অধিকতব মানবমুখী হয়ে ব্রহ্মচর্যাশ্রম-প্রতিষ্ঠাব সমসকাব স্বকীয উগ্র জাতীযতার অনুসবণে শৈথিল্য ও বিশ্বভাবতীব কল্পনা, ১৯২০-২১এব পব নিজ গঠনমূলক স্বাদেশিকতাব নিবিখে গান্ধীজী-প্রবর্তিত চবকা ও বযকটেব সমালোচনা, শ্রীনিকেতনে পল্লীসংগঠনেব স্থাযী আদর্শ প্রবর্তন এবং ১৯২৫ খ্রীঃ-এর পব থেকে বাস্তব মানবিকতায প্রবুদ্ধ এবং ভাবী শ্রেণী-সংঘাতেব আভাসে উৎকণ্ঠিত কবিব গ্রামসংগঠনের আদর্শে কার্যকরভাবে আত্মনিয়োগ—এই বৈচিত্র্যগুলিকে "প্রাধান্যেন ব্যপদেশঃ" এই ন্যায়ে মোটামুটি তিনটি পর্বে ভাগ ক'রে আমরা বিবেচনা কবছি। এগুলিব মধ্যে প্রথম পর্যায়েব অন্তর্গত প্রাচীনধর্মী জাতীয়তাবাদেব অধ্যাযটি খুবই পবিস্ফুট প্রকাশযুক্ত, এবং কাব্যকথায ভাষণে কর্মে নিতান্ত ঘনসন্নিবদ্ধ হলেও এই অভিভূত অবস্থাব আয়ু খুবই সীমিত, আট-দশ বৎসবের

বেশি নয়, এবং এরই মধ্যে এই সীমা-লঙ্ঘনের প্রয়াসও লক্ষণীয়। কাব্যের মধ্যে কল্পনা ও নৈবেদ্য, বঙ্গদর্শন পত্রিকাব মধ্যস্থতায় প্রকাশিত 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা' 'সমাজভেদ' 'ব্রাহ্মণ' 'নববর্ষ' 'ভাবতবর্ষের ইতিহাস' প্রভৃতি ও প্রাচীন সাহিত্যের আলোচনামূলক প্রবন্ধ এবং শিক্ষাবিষয়ক 'শিক্ষাসমস্যা' 'জাতীয় বিদ্যালয়' 'তপোবন' প্রভৃতি প্রবন্ধ একালের প্রাচীনধর্মী মানসিকতার দান। এর মধ্যে রবীন্দ্রনাথের স্বকীয অনুভবে গৃহীত তপোবনেব আদর্শ শান্তিনিকেতনের শিক্ষার ক্ষেত্রে বেশ কিছুকাল অনুসৃত হযে পবে পাশ্চাত্ত্য আদর্শের মিলন-মিশ্রণে বিশ্বভারতীব গঠনে নূতন ভাবরূপে পর্যবসিত হযেছে। এই দ্বিতীয় পর্যায়টি কবির একান্ত মানবনিষ্ঠা এবং অমানবীযতাব বিরুদ্ধে বিদ্রোহ-বিপ্লবেব সংকেতে চিহ্নিত।

॥ দ্বিতীয় পর্ব ॥

প্রবল স্বাদেশিকতা বা জাতীযতাবাদেব অভিভব মুহূর্তে প্রাচীনতাব মোহ কিছু যদিও কবিচিত্তকে স্পর্শ ক'বে থাকে, সে মোহ ভাঙতেও বিলম্ব হযনি। ব্রহ্মচর্য, শৌচ, দীক্ষা, প্রার্থনা, পাদুকাবিহীন উত্তবীয়বহুল দেহসজ্জা এবং শূদ্র-ব্রাহ্মণ জাতিভেদ প্রভৃতি বিষযে প্রতিক্রিয়া তাঁব অন্তবেই সঞ্চিত হচ্ছিল, যদিও একথা ঠিক যে শিক্ষায তপোবন-পবিবেশ বচনা তাঁব স্বভাবেব একটি স্থাযী বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠেছিল। এই প্রতিক্রিয়াব বশেই ১৯০৮ খ্রীঃ 'পূর্ব ও পশ্চিম' ভাষণে তিনি ভাবতবর্ষেব ইতিহাস বলতে আর্য বা হিন্দুব ইতিহাস বোঝালেন না, স্পষ্টাক্ষবে নির্দেশ দিলেন এদেশ প্রথমে আর্য-অনার্যেব, পবে হিন্দু-মুসলমানের এবং ভাবিকালে 'হিন্দু-মুসলমান-ইংবেজের। অর্থাৎ ভাবতবর্ষের ইতিহাস বিশেষ কোনো জাতির ও বিশেষ কোনো ধর্মেব মানুষেব নয, তা সমস্ত মানুষেব একত্রিত হওয়াব ইতিহাস এবং তাতেই ভাবতের সার্থকতা। কিছু পবে লেখা 'ভারত-তীর্থ' কবিতা অথবা 'ভাবতবর্ষে ইতিহাসেব ধারা' প্রবন্ধে যা বলেছেন তাবই পূর্বাভাস ফুটেছে এই ভাষণে। তাঁর বক্তব্য হ'ল—

> "বর্ণেব যে শুভ্রতা লইয়া একদিন আর্যবা গৌরব বোধ করিয়াছিলেন সে শুভ্রতা মলিন হইয়াছে, এবং আর্যগণ শূদ্রদেব সহিত মিশ্রিত হইয়া তাহাদের বিবিধ আচাব ও ধর্ম, দেবতা ও পূজাপ্রণালী গ্রহণ করিয়া, তাহাদিগকে সমাজেব অন্তর্গত কবিয়া লইয়া হিন্দুসমাজ বলিয়া এক সমাজ বচনা কবিয়াছেন।......বিধাতা কি তাহাকে একথা বলিতে দিযাছেন যে ভারতবর্ষেব ইতিহাস হিন্দুর ইতিহাস। হিন্দুব ভারতবর্ষে যখন বাজপুত রাজাবা পরস্পর মারামারি কাটাকাটি কবিয়া বীবত্বেব আত্মঘাতী অভিমান

প্রচার করিতেছিলেন, সেই সময়ে ভারতবর্ষের সেই বিচ্ছিন্নতার ফাঁক দিয়া মুসলমান এদেশে প্রবেশ করিল, চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল এবং পুরুষানুক্রমে জন্মিয়া ও মরিয়া এদেশের মাটিকে আপন করিয়া লইল।······সম্প্রতি পশ্চিম হইতে ইংরেজ আসিয়া ভারতবর্ষের ইতিহাসের একটি প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে। এই ঘটনা অনাহূত আকস্মিক নহে। পশ্চিমের সংস্রব হইতে বঞ্চিত হইলে ভারতবর্ষ সম্পূর্ণতা হইতে বঞ্চিত হইত। ···যাহারা প্রপিতামহদের মধ্যেই নিজেকে সর্বপ্রকারে সমাপ্ত বলিয়া জানে, এবং সমস্ত বিশ্বাস ও আচারের দ্বারা আধুনিকের সংস্পর্শ হইতে নিজেকে বাঁচাইয়া চলিতে চেষ্টা করে, তাহারা নিজেকে বাঁচাইয়া রাখিবে কোন্ বর্তমানের তাড়নায়, কোন্ ভবিষ্যতের আশ্বাসে। ইংরেজের সঙ্গে আমাদের মিলন সার্থক করিতে হইবে। মহা-ভারতবর্ষ গঠন ব্যাপারে এই ভার আজ আমাদের উপর পড়িয়াছে। বিমুখ হইব, বিচ্ছিন্ন হইব, কিছুই গ্রহণ করিব না, একথা বলিয়া আমরা কালের বিধানকে ঠেকাইতে পারিব না, ভারতের ইতিহাসকে দরিদ্র ও বঞ্চিত করিতে পারিব না।"

একালে লেখা শিক্ষাসমস্যা, জাতীয় বিদ্যালয়, এমন কি 'স্বদেশ' পুস্তকের "ভারতবর্ষের ইতিহাস" ও আরও পূর্বেকার "ইংরেজ ও ভারতবাসী" প্রভৃতি প্রবন্ধের বক্তব্য থেকে এই প্রবন্ধের সুরে কতই না পার্থক্য। তবু এখনও উচ্চমনা য়ুরোপীয়দের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটেনি। এই একই রীতিতে মিলনের সুরে বক্তব্য উপস্থাপন করির একালের শান্তিনিকেতন ভাষণমালাতেও দেখেছি :

"এ কয়দিন আমরা প্রাকৃতিক ক্ষেত্র এবং আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রকে স্বতন্ত্র করে দেখছিলুম।······পুনর্বার এই দুটিকে একের মধ্যে যদি না দেখি তা হ'লে বিপদ ঘটে। এই প্রাকৃতিক এবং আধ্যাত্মিক যেখানে পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য লাভ করেছে সেখান থেকে আমাদের লক্ষ্য যেন একান্ত স্খলিত না হয়। যেখানে সত্যের মধ্যে উভয়ের আত্মীয়তা আছে সেখানে মিথ্যার দ্বারা আত্মবিচ্ছেদ না ঘটাই। কেবলমাত্র ভাষা, কেবল তর্ক, কেবল মোহের দ্বারা প্রাচীর গেঁথে তুলে সেইটেকেই সত্য পদার্থ বলে যেন ভুল না করি। পূর্ব এবং পশ্চিম দিক যেমন একটি অখণ্ড গোলকের মধ্যে বিধৃত হয়ে আছে, প্রাকৃতিক এবং আধ্যাত্মিক তেমনি একটি অখণ্ডতার দ্বারা বিধৃত। এর মধ্যে একটিকে পরিহার করতে গেলেই আমরা সমগ্রতার কাছে অপরাধী হব।" ('সমগ্র' পৌষ, ১৩১৫)

এই সময়েই মাঘোৎসবের ভাষণে রবীন্দ্রনাথ পুনরায় হিন্দু-মুসলমান-খ্রীস্টানের

মিলনের স্বপ্ন দেখেছেন, 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' মন্ত্রেব সূত্রে রামমোহনের আধুনিক আদর্শের সঙ্গে উপনিষদের ভাবনাকে মিলিয়ে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁর আধুনিক মতাদর্শকে প্রাচীনেব সঙ্গে যতই মেলান ১৯০১-২-৩ খ্রীঃ এর ভাবকেন্দ্র থেকে তিনি ক্রমশঃ স'রে যাবেন এমন সম্ভাবনাই তাঁব ইতস্ততঃ ভাষণে প্রকাশ পেয়েছে। ১৯১০ এব প্রথম দিকে পরিসমাপ্ত 'গোরা' উপন্যাসও কবির তীব্র জাতীয়তাবোধের মোহ থেকে মুক্তির অন্যতম একটি দৃষ্টান্ত। এই উপন্যাসের পাঠকও অবশ্য ধরতে পাববেন যে হিন্দু জাতীযতাকে গ্রহণেব মধ্যে হিন্দু কুসংস্কাবকেও বরণের অসংগতি এই মনীষীব চিত্তকে নির্বিচাব জাতীযতা সম্পর্কে সংশয়ান্বিত করেছে। রবীন্দ্রনাথেব প্রাচীন-অনুসবণ এবং ধর্মমূলক জাতীয়তা থেকে অপসবণের মানসিকতার মূলে একটি প্রবল বাস্তব কাবণ ক্রিযাশীল হযেছে ব'লে মনে করি। কালীগ্রাম শিলাইদহে গ্রাম-সংগঠনে ব্রতী হযে তিনি হিন্দুসমাজেব ভিতরকার এবং হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রচলিত মৌলিক অনৈক্যেব স্পষ্টরূপ দেখতে পেলেন এবং সেইসঙ্গে এও বুঝলেন যে ঐ জঘন্য বিমূঢতা থেকে পবিত্রাণ না পেলে স্বাধীনতা আসতে পাবে না। বুঝলেন 'পাপ আমাদেবই ভিতবে'। ইংবেজ যদি সেই পাপেব সুযোগ গ্রহণ ক'রে থাকে তাহ'লে আমাদের অভিযোগ হাস্যকব দুর্বলতা মাত্র প্রকাশ কবে। আমবা চাইব স্বাধীনতা, অথচ উচ্চবর্ণ হযে নিম্নবর্ণকে, শিক্ষিত হযে অশিক্ষিতকে এবং হিন্দু হয়ে মুসলমানকে সামাজিক স্বাধীনতা দিতে চাইব না—এ এক বিচিত্র স্বার্থের প্রহসন, এই অনিচ্ছা ক্ষমাব অযোগ্য। এই কাবণে তাঁর সাম্রাজ্যবাদী এবং শাসক ইংবেজের সমালোচনায় ভাটা পডল এবং উত্তবোত্তব কঠোর আত্ম-সমালোচনায তিনি উদ্দীপিত হলেন। এই কাবণে ১৯০১ খ্রীঃ লেখা 'ভাবতবর্ষেব ইতিহাস' থেকে ১৯০৭-৮এ অধীত ভারতবর্ষেব ইতিহাসেব দৃষ্টিকোণ পৃথক্ হযে পডল। আবাব এই কাবণেই যেমন ইংবেজেব মধ্যস্থতায় সমানীত পশ্চিমা বিজ্ঞান ও সাহিত্যকে তিনি অভিনন্দিত করলেন, তেমনি হযতো বা ইংবেজ শাসনেব চোখে ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল এবং হিন্দু-মুসলমানে সমদৃষ্টি তাঁব শ্রদ্ধাও আকর্ষণ করলে। তাঁব তটস্থ দৃষ্টিতে আত্মবিচারে প্রবৃত্ত হওয়ার মর্মে সদ্য-জাগবিত মুসলিম সমাজেব আত্মসচেনতাব ব্যাপারটিও কাজ করেছে। মিণ্টো-মর্লি সংস্কার, যা ১৯০৯ খ্রীঃ আইনে পবিণাম লাভ কবে, তখনকাব মডারেট দল যার সমর্থন করেন, তাব মধ্যে মুসলমান সম্প্রদাযের জন্য পৃথক্ নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়। এতে তখনকাব হিন্দু স্বাদেশিকদের মধ্যে গুঞ্জন শোনা গেলেও রবীন্দ্রনাথ এই প্রস্তাবে আত্মবিচারের প্রযোজনীয়তাই বোধ করেন এবং 'ব্যাধি ও প্রতিকার' প্রবন্ধে যেমন হিন্দুসমাজেব উন্নাসিকতা ও স্বার্থবুদ্ধির পাপকে তুলে ধবেন, তেমনি পাবনা প্রাদেশিক সম্মিলনীর সভাপতি হিসাবে প্রদত্ত ভাষণে শিক্ষায় ও রাজপদপ্রাপ্তিতে মুসলমান

সম্প্রদায়ের অধিকারকে নৈতিক সমর্থনও জানান। এইভাবে হিন্দুজাতির মজ্জাগত পাপ ও দুর্নীতির দিকে দৃষ্টি পড়ায় কবির প্রাচীনানুগত ধর্মবোধ এবং জাতীয়তাবোধের ভিত্তিও শিথিল হয়ে পড়ে। দেখছি রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমারও ঠিকই লক্ষ্য করেছেন যে—"রবীন্দ্রনাথ এখন ব্যর্থরাজনীতির উচ্ছ্বাসমার্গ ত্যাগ করিয়া সংগঠন-পন্থী, বর্ণাশ্রমের জয়গান না গাহিয়া বৃহত্তর মনুষ্যত্বের বাণীর প্রচারক, স্বাজাত্যের মিথ্যা গৌরব রটনায় লেখনী তাঁহার পরাঙ্মুখ, লৌকিক হিন্দুধর্মকে প্রবন্ধ-নাটকাদির রচনার দ্বারা কঠোরভাবে আক্রমণ করেন, এখন তিনি সংস্কারহীন।" (রঃ জীঃ ২য় খণ্ড)

'গোরা'র সমকালীন রচনা হ'ল গীতাঞ্জলির গান ও কবিতাগুলি। এর মধ্যে সমাজভিত্তিক নিঃশেষমানবপ্রীতিমূলক 'ভারত-তীর্থ' 'হে মোর দুর্ভাগা দেশ' 'যেথায় থাকে সবার অধম দীনের হতে দীন' প্রভৃতি গোরার কিছু পরের রচনা। এর মধ্যে আবার 'হে মোর দুর্ভাগা দেশ' বাস্তবতাভিত্তিক সমাজবাদের পরিচয় পরিস্ফুটভাবে বহন করছে। সর্বহারাদের প্রতি আন্তরিক সহানুভূতিময় এই কবিতাগুলি লক্ষ্য ক'রে এবং গীতাঞ্জলির ঈশ্বরভাবুকতায় ধর্মমূলক জাতীয়তার অভাব লক্ষ্য ক'রে গীতাঞ্জলি থেকেই বা ১৯১০ খ্রীঃ থেকেই কবির নূতন চিন্তা ও ভাবুকতার ভূমিতে পদক্ষেপ ধরা যেতে পারে। তবু আমরা সুপরিস্ফুট প্রকাশের বিষয় বিবেচনা ক'রে প্রথম মহাযুদ্ধারম্ভের সময়ে রচিত ফাল্গুনী-বলাকা এবং সবুজপত্রে রাজনীতি-সমাজ-নীতিক নব চিন্তায় রবীন্দ্রনাথের আত্মপ্রকাশকেই এই পর্যায়ের বিশেষ পরিচায়ক ব'লে গ্রহণ করেছি। এই পর্যায়ে গতানুগতিকতা ও প্রাচীনতার তীব্র বিরোধ, বিপ্লবী মনোভাব এবং উদার ও বাস্তব মানুষ-সর্বস্বতার ধারণায় স্থির কবির সার্বিক মানবীয়তার ভূমিকা রচনার আগ্রহ—এসব বিষয় আমরা পূর্বেই নির্দেশ করেছি। রবীন্দ্রনাথের রচনার অনুরাগী পাঠক নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন যে রবীন্দ্র-চিত্তে নিসর্গের অধিকার ক্রমশঃ মন্দীভূত হয়ে মানুষের অধিকার ব্যাপ্ত হয়েছে। এমনকি পরবর্তীকালের ঋতুপর্যায় নিয়ে লেখা গীতিনাট্যগুলির মধ্যেও স্থানে স্থানে মানবসমাজের পরিবর্তন-সত্য ইঙ্গিতে ব্যক্ত হয়েছে। আরও লক্ষণীয় এই যে, এ পর্যায়ে সাধনা-বঙ্গদর্শনের কালের মত সমাজনীতিক প্রবন্ধের প্রাচুর্য নেই, ডায়ারি ও স্মৃতিচিত্র রচনার দিকে এবং রূপক-সংকেত-বহুল নাট্যরচনার দিকেই প্রবণতা বেশি। একালের রাজনীতিক প্রবন্ধ বা পত্রের প্রতিনিধিত্ব করছে তাঁর উল্লেখ্য সংকলন 'কালান্তর'।

গীতাঞ্জলিতে আমাদের পরিচিত পুরানো ঈশ্বর নেই, আছে রবীন্দ্র-কল্পিত নূতন ঈশ্বর, নিসর্গচারী ও মানব-ইতিহাসের ভাগ্যবিধাতা। অথবা এই সত্তা ঈশ্বরই নয়, কবির মনের ঘনীভূত রসাস্বাদেরই একটা সত্তা-কল্পনা মাত্র। 'খেয়া'তেও নিসর্গের অনুভবের মধ্যে এই সত্তার আভাস ফুটেছে, গীতাঞ্জলিতে প্রবলতর, স্পষ্টতর। কিন্তু

ইনি যে সমাজ-বাষ্ট্রকে উল্টে পাল্টে নোতুন ক'রে নেন সে পবিচয়ও কবি বিশেষভাবেই দিয়েছেন। অচলাযতন, কালেব .যাত্রা এবং নবীন, বসন্ত প্রভৃতি ঋতুপর্যায়েব গীতিনাট্যে সমাজবাষ্ট্রেব পালাবদলেবই ছবি ফুটেছে। ১৯১১ খ্রীঃ লেখা অচলায়তনে সমাজ-বিপ্লবী ববীন্দ্রনাথেব ভূমিকা স্পষ্ট। প্রকৃতপক্ষে ১৯০৭-৮-এ তিনি হিন্দু-সমাজের যে আভ্যন্তবীণ পাপেব দিকে দৃষ্টি ফেবালেন, গীতাঞ্জলিব 'হে মোব দুর্ভাগা দেশ' 'অচলাযতন' সেই পরিবর্তনেবই পবিণত ফল। 'অপমান' কবিতায ইতিহাস-বিধাতাব যে রুদ্রবোষের কথা উল্লেখ কবেছেন, সেই রুদ্রবোষ কিভাবে পুরাতনকে ভেঙে নূতন জীবন নিয়ে আসবে তার ছবি আঁকলেন অচলাযতনে। পবে রচিত 'বথেব বশি' বা 'কালেব যাত্রা'য বিষযটিকে রাষ্ট্রেব দিক থেকে কবি বিবেচনা করেছেন। কিন্তু ঠিক একালে সাম্রাজ্যবাদী বাজনীতি বিষযে রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারা অনেকটা শ্রান্ত হযে এসেছে বলতে হবে। কাবণ, ১৯১১ খ্রীঃ শাসকগোষ্ঠী প্রস্তাবিত আলিগড মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয এবং কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয স্থাপনেব উদ্‌যোগে রবীন্দ্রনাথ তাঁব "হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয" প্রবন্ধে ইংবেজের এই ভেদনীতি বিষয়ে কোনো প্রতিবাদবাক্য তো উচ্চাবণ কবেনই নাই, ববং একে সমর্থন করেছেন। বলা বাহুল্য, মডাবেট ও চবমপন্থীব কলহে এসময়ে স্বদেশী আন্দোলনও স্তিমিত, কিন্তু কবিব সমর্থনে একটি কথা নিশ্চয়ই বলা যেতে পাবে যে, অনুন্নত এবং অবহেলিত মুসলিম সমাজেব উন্নতি এবং হিন্দুব সঙ্গে সামাজিক সমকক্ষতা তাঁব অভিপ্রেত ছিল। আব হিন্দুব বিশ্ববিদ্যা বলতে হিন্দুয়ানিব প্রসাব যে তাঁব কাঙ্ক্ষিত ছিল না তা ঐ প্রবন্ধেব মধ্যেই ব্যক্ত হযেছে। যেমন অন্যত্র তেমন ঐ প্রবন্ধেও কবি তটস্থ সমালোচনায প্রবৃত্ত হযে দেখিয়ে দিলেন যে মুসলিম সম্প্রদাযে শিক্ষাদীক্ষাব অনুন্নত অবস্থাব জন্য হিন্দু সমাজেব স্বার্থ ও সচেতন ভেদবুদ্ধিই দাযী। বর্তমানে যে-কোনো উপাযে তাদেব উন্নতি হয দেশেব স্বার্থে তা-ই কাম্য।

> "আমবা মুসলমানকে যখন আহ্বান কবিযাছি তখন তাহাকে কাজ উদ্ধাবের সহায বলিযা ডাকিয়াছি, আপন বলিযা ডাকি নাই। যদি কখনো দেখি তাহাকে কাজেব জন্য আব দবকাব নাই তবে তাহাকে অনাবশ্যক বলিয়া পিছনে ঠেলিতে আমাদেব বাধিবে না। তাহাকে যথার্থ আমাদেব সঙ্গী বলিযা অনুভব কবি নাই, আনুষঙ্গিক বলিযা মানিযা লইয়াছি।...... মুসলমান এই সন্দেহটি মনে লইযা আমাদেব ডাকে সাডা দেয নাই।...... মুসলমানেব এ কথা বলা অসংগত নহে যে আমি যদি পৃথক থাকিয়াই বডো হইতে পাবি তবেই তাহাতে আমাব লাভ।··· আধুনিককালেব শিক্ষাব প্রতি সময থাকিতে মনোযোগ না কবায ভাবতবর্ষেব মুসলমান হিন্দুব চেয়ে অনেক বিষযে পিছাইয়া পডিয়াছে। সেখানে তাহাকে সমান হইয়া লইতে

> হইবে। এই বৈষম্যটি দূব করিবার জন্য মুসলমান সকল বিষয়েই হিন্দুর চেয়ে বেশি দাবি কবিতে আবম্ভ করিয়াছে। তাহাদেব এই দাবিতে আমাদের আন্তরিক সম্মতি থাকাই উচিত। পদ-মান-শিক্ষায় তাহারা হিন্দুব সমান হইয়া উঠে ইহা হিন্দুবই পক্ষে মঙ্গলকব।" (হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়)

পক্ষপাতশূন্য সমাজদর্শী ববীন্দ্রনাথই এরকম ন্যায়বিচারের কথা বলতে পাবেন। মুসলিমদেব সঙ্গে অনুন্নত শ্রেণীব প্রতিও এরকম ন্যায়বিচারের প্রয়োজন উপলব্ধিতে তিনি শেষ পর্যন্ত অবিচল। কিন্তু তাহ'লেও ধর্মেব বিভেদকে ভিত্তি ক'বে হিন্দু-মুসলমানেব এই মেরুব্যবধান স্বষ্টিতে বিদেশী শাসকদের চক্রান্তেব বিষয়টিও ববীন্দ্রনাথের প্রতিবাদযোগ্য ছিল। তিনি যে তা করেননি তার কাবণ এই মনে হয যে হিন্দু সমাজেব সংকীর্ণতাব জন্য তিনি অন্তবে নিতান্তই বিবক্ত ছিলেন। ফলে ইংবেজদেব বিভেদনীতির আশ্রযে হলেও আধুনিক শিক্ষায় মুসলিম ছাত্রদেব শিক্ষিত হওয়ার সুযোগকে তিনি অভিনন্দিত কবেছেন। এপক্ষে হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয়ে যথার্থভাবে বিশ্ববিদ্যাব অর্থাৎ পশ্চিমেব শিক্ষার সঙ্গে প্রাচ্যেব শিক্ষাব মিলন অথবা তাঁবই ভাষায 'বিদ্যাসমবায' ঘটবে মনে ক'বে তিনি হিন্দু বিশ্ববিদ্যালযেবও অভ্যুদয় কামনা কবেছেন। ইংবেজের সাম্রাজ্যবাদী স্বৰূপেব দিকে তেমন লক্ষ্য না বেখে তাব অন্তর্লোকেব স্পর্শে প্রাচ্যের নবজীবন কামনা কবছেন—এই প্রবৃত্তি তাঁব ভারতীয় সমাজচিন্তাব এই দ্বিতীয় পর্যায়েবই বৈশিষ্ট্য। এবং এখন থেকে প্রাবদ্ধ হয়ে বিশ্বভাবতী প্রতিষ্ঠাব মধ্য দিয়ে এটিও তাঁব মনে একটি স্থায়ী ভাবমূর্তিই গ্রহণ কবেছে। এব প্রমাণ দেখা যেতে পাবে ইং ১৯৩৩এ লেখা 'কালান্তবে'ব ভূমিকায, ঐ প্রবন্ধেব প্রথমার্ধে—

> "ইংবেজের আগমন ভাবতবর্ষেব ইতিহাসে এক বিচিত্র ব্যাপাব। মানুষ হিসাবে তাবা বইল মুসলমানদেব চেযেও আমাদেব কাছ থেকে অনেক দূরে, কিন্তু য়ুবোপের চিত্তদূতরূপে ইংবেজ এত ব্যাপক ও গভীবভাবে আমাদেব কাছে এসেছে যে আব-কোনো বিদেশী জাত কোনোদিন এমন কবে আসতে পাবে নি। যুবোপীয চিত্তেব জঙ্গমশক্তি আমাদেব স্থাবব মনের উপর আঘাত করল ··· একটা প্রবল উদ্যমের বেগে যুবোপের মন ছড়িয়ে পড়েছে সমস্ত পৃথিবীতে।···যেখানেই সে পা বাডিযেছে সেইখানটাই সে অধিকার কবেছে। কিসেব জোবে? সত্যসন্ধানের সততায়। বুদ্ধিব আলস্যে, কল্পনার কুহকে, আপাতপ্রতীয়মান সাদৃশ্যে, প্রাচীন পাণ্ডিত্যের অন্ধ অনুবর্তনায় সে আপনাকে ভোলাতে চায় নি।···যদিও আমাদের চারদিকে আজও পঞ্জিকার প্রাচীব খোলা-আলোর প্রতি সন্দেহ উদ্যত করে আছে, তবু তাব মধ্যে ফাঁক কবে য়ুরোপের চিত্ত আমাদের প্রাঙ্গণে প্রবেশ করেছে, আমাদের সামনে

এনেছে জ্ঞানেব বিশ্বরূপ, মানুষেব বুদ্ধির এমন একটা সর্বব্যাপী ঔৎসুক্য আমাদেব কাছে প্রকাশ কবেছে যা অহৈতুক আগ্রহে নিকটতম-দূরতম অণুতম-বৃহত্তম প্রযোজনীয়-অপ্রয়োজনীয় সমস্তকেই সন্ধান সমস্তকেই অধিকাব কবতে চায়, এইটে দেখিয়েছে যে জ্ঞানের বাজ্যে কোথাও ফাঁক নেই, সকল তথ্যই পরস্পব অচ্ছেদ্য সূত্রে গ্রথিত, চতুরানন বা পঞ্চাননেব কোনো বিশেষ বাক্য বিশ্বেব ক্ষুদ্রতম সাক্ষীব বিরুদ্ধে আপন অপ্রাকৃত প্রামাণিকতা দাবি করতে পাবে না।···· এই কথাটাই দেশেব সাধারণের মনে বাজছে যে, যেটা অন্যায় সেটা প্রথাগত শাস্ত্রগত বা ব্যক্তিগত গায়েব জোবে শ্রেয় হতে পারে না, শংকরাচার্য-উপাধিধাবীর স্বরচিত মার্কা সত্ত্বেও সে শ্রদ্ধেয নয়।”

এই মর্মেই ছোটো ইংরেজের সাম্রাজ্যবাদী হীনতার দিক স্মবণে রেখেও সাধাবণভাবে ইংবেজি-বাহিত যুবোপীয় ভাবসংস্কৃতিব প্রতি কবির পক্ষপাত। এই মর্মেই পূর্ব-পশ্চিমের মিলন ও বিদ্যাসমবাযেব কল্পনা। আমবা পূর্বেই অনুমান কবেছি যে প্রাচীন ধর্মবোধে কবি উদ্দীপিত হলেও হিন্দুব নির্বিচার ও সুবিধাবাদী শাস্ত্রানুগত্য এবং অমানবীয সংকীর্ণতা-সম্পর্কে বোধই কবিকে উন্নত পাশ্চাত্ত্য জীবন ও সংস্কৃতিব দিকে চালিত কবেছে। এখন এ বিষযে কবিব পবিস্ফুট পশ্চিমানুরাগ লক্ষ্য করা যাক।

'পথেব সঞ্চয়' পুস্তকেব 'যাত্রাব পূর্বপত্র'। তৃতীযবাবেব যুরোপ-যাত্রাব প্রাবম্ভে ১৯১২ জুনে লিখিত। স্বাদেশিক সংকীর্ণতায় প্রতিহত, স্বাধীন জীবনেব প্রবক্তা ও মনীষী জীবনেব পবিপূর্ণ প্রকাশেব জন্য আগ্রহবশতই যুবোপেব দিকে ফিবে তাকালেন। যুবোপেব বাষ্ট্র- ও যন্ত্রবাহিত দানবীয শক্তিব দিকে নয, চাবিত্রশক্তিব দিকে, যে শক্তি দুঃখময সংগ্রামের পথবর্তী ক'বে যুবোপীয মানুষকে অধিকাব দিয়েছে জডশক্তিকে জয কবাব, পুবাতনেব মোহে নিলীন না বেখে নিত্য-নূতনেব প্রতি আসক্ত ক'বে যা তাব চিত্তকে সংস্কারমুক্ত নির্মল কবেছে এবং বিজ্ঞানে, সাহিত্যে, সমাজেব উন্নযনে, অহবহ মতসংঘর্ষেব উত্তাপে তাকে সচল ও জীবন্ত ক'বে তুলেছে, তাব প্রতি রবীন্দ্রনাথের আকর্ষণ তাঁব প্রগতিশীল মুক্তমনেরই পবিচয় দিয়েছে। এবিষয়ে তিনি তাঁব সমকালীন স্বাদেশিকদেব থেকে অত্যন্ত পৃথক্। যদিও একথা ঠিক যে যুবোপীয় রাষ্ট্রস্বার্থ এবং বণিকতন্ত্রকে তিনি একালেও প্রবল ধিক্কার দিয়েছেন। আসল কথা এই যে, স্বদেশে মানবিক চাবিত্রগুণের দুর্লভতা তাঁকে যুবোপেব সুলভ চবিত্রমহত্ত্বের দিকে ঠেলে দিয়েছে। তাঁব ধারণায় য়ুরোপেও উদাব চরিত্রবান্ মানুষ সংখ্যাগরিষ্ঠ না হলেও তাঁবাই যুরোপের জীবনীশক্তিব আশ্রয়, তাঁরাই প্রবল দোষ সত্ত্বেও যুবোপকে পতন থেকে রক্ষা ক'রে চলেছেন। এর পূর্বে—বিচিত্রের মধ্যে মিলন-সাধন, ক্ষুদ্রেব মধ্যেও

ভূমাকে দর্শন ও বস্তুজীবনের অগ্রে স্থাপন প্রভৃতি বিষয় বিবেচনা ক'রে প্রাচীন ভারতের মধ্যে যে আধ্যাত্মিক শক্তি তিনি লক্ষ্য করেছিলেন এখন যুরোপের মধ্যেই সেই আধ্যাত্মিক শক্তি লক্ষ্য করেছেন এবং যুরোপ যে বস্তুতান্ত্রিক, এ অভিযোগের প্রতিবাদ করেছেন। এর পূর্বে 'শান্তিনিকেতনে'র দু'একটি ভাষণে, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক হয়ে ব্রাহ্মসমাজের অনুদারতা-বিষয়ক লিখনে, অথবা 'পূর্ব ও পশ্চিম' প্রবন্ধে, যুরোপের, বিশেষতঃ ইংরেজের সঙ্গে ভারতের সাংস্কৃতিক মিলনে ভারত তার বিধিনির্দিষ্ট পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হবে, এমন মনোভাবের পরিচয় দিলেও যুরোপীয় সমাজের অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিক শক্তি-বিষয়ে কবির এরকম সপ্রশংস অনুভবের পরিচয় পাওয়া যায় না। রবীন্দ্রনাথ নোতুন যুক্তি বিন্যাস ক'রে বোঝাচ্ছেন—

> "যুরোপে গিয়া সংস্কারমুক্ত দৃষ্টিতে আমরা সত্যকে প্রত্যক্ষ করিব, এই শ্রদ্ধাটি লইয়া যদি আমরা সেখানে যাত্রা করি তবে ভারতবাসীর পক্ষে এমন তীর্থ পৃথিবীতে কোথায় মিলিবে? · যুরোপীয় সভ্যতা বস্তুগত, তাহার মধ্যে আধ্যাত্মিকতা নাই, এই একটা বুলি চারিদিকে প্রচলিত হইয়াছে। যে কারণেই হউক এইরূপ জনশ্রুতি যখন প্রচার লাভ করিতে আরম্ভ করে তখন তাহার আর সত্য হওয়ার প্রয়োজন থাকে না·· ··যুরোপে যদি আমরা মানুষের কোনো উন্নতি দেখি তবে নিশ্চয়ই জানিতে হইবে, সে উন্নতির মূলে মানুষের আত্মা আছে—কখনোই তাহা জড়ের সৃষ্টি নহে। যুরোপেরও একটা ভিতর আছে, তাহারও একটা আত্মা আছে, এবং সে আত্মা দুর্বল নহে।···· যুরোপে দেশের জন্য, মানুষের জন্য, জ্ঞানের জন্য, প্রেমের জন্য, হৃদয়ের স্বাধীন আবেগে সেই দুঃখকে, সেই মৃত্যুকে আমরা প্রতিদিনই বরণ করিতে দেখিয়াছি।· · ·সত্যকে ভক্তি করিবার এই ক্ষমতা, এবং সত্যের জন্য দুর্গম বাধা লঙ্ঘন করিয়া দিনের পর দিন আপনাকে অকুণ্ঠিতভাবে নিঃশেষে দান করিবার এই শক্তি, এ যে তাঁহাদের জাতীয় সাধনা হইতেই তাঁহারা পাইয়াছিলেন। এই আশ্চর্য শক্তি কি বস্তু-উপাসনার সাধনা হইতে কেহ কোনোদিন লাভ করিতে পারে? ইহা কি যথার্থই আধ্যাত্মিক নহে? এবং জিজ্ঞাসা করি, এই শক্তি কি আমাদের দেশে যথার্থ পরিমাণে দেখিতে পাই?"

লেখক এই প্রবন্ধ-পত্রে প্রসঙ্গক্রমে কয়েকটি স্থানে আমাদের জড়ত্ব এবং অমানবীয় সামাজিক নিষ্ঠুরতার বিষয় উল্লেখও করেছেন এবং তুলনায় বরং যুরোপের শক্তির দম্ভকে সমর্থনই করেছেন। কারণ, এরই মধ্যে তাদের বৈরাগ্যও রয়েছে। বলেছেন, ভারত ত্যাগের মহিমা কীর্তন করতে পারে না, কারণ, মূলে তার সম্বল নেই, ত্যাগ করবে

কী? "শিবের দাবিদ্র্যই ভূষণ, অলক্ষ্মীর দারিদ্র্য কদর্য।" যুরোপের মত সংগ্রাম, মৃত্যু, পতন-উত্থান ও দুঃখবরণের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হলে তবেই আমরা যুরোপীয়দের মত মানুষ হতে পারব। এই প্রবন্ধে লেখক শাসক-ইংরেজের জঘন্য হীনতার বিষয় মনে রেখে বলছেন, আমাদের সঙ্গে বা বিজিত জাতিগুলির সঙ্গে যুরোপীয়দের স্পর্ধিত ও জঘন্য ব্যবহারের মধ্য দিয়েও দুরূহ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হতে হবে যে কোন্ সত্যের বলে তারা মহিমা লাভ করেছে। এই 'পথের সঞ্চয়ে'বই অন্য কয়েকটি পত্রে কবি-মনীষী এমন কয়েকটি মন্তব্য করেছেন যা তাঁর পূর্বেকার ভাবুকতাময় chauvinismএর প্রায় প্রতিবাদ, যেমন—

> "যুরোপ তাহার দেহকে সম্পূর্ণ করিয়া তাহার মধ্যে আত্মাকে প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিতেছে। আমাদের আত্মা দেহ হারাইয়া প্রেতের মতো পৃথিবীতে নিষ্ফল হইয়া ফিরিতেছে। সেই আত্মার বাহ্য প্রতিষ্ঠা কোথায়? তাহার মধ্যে যে ঈশ্বরের সাধর্ম্য আছে, সে আপনার ঐশ্বর্য বিস্তার না করিয়া বাঁচে না। সে যে আপনাকে নানা দিকে প্রকাশ করিতে চায়—রাজ্যে, বাণিজ্যে, সমাজে, শিল্পে, সাহিত্যে, ধর্মে। এখানে সেই প্রকাশের উপকরণ কই? সেই উপকরণের প্রতি তাহার কর্তৃত্ব কোথায়? দেখিতেছি, তাহার কলেবর যদি এক জায়গায় বাঁধে তো আর-এক জায়গায় আলগা হইয়া পড়ে —ক্ষণকালের জন্য যদি তাহা নিবিড় হইয়া দাঁড়ায় তবে পরক্ষণেই বাষ্প হইয়া উড়িয়া যায়। তাই আজ যেমন করিয়াই হোক আমাদিগকে এই দেহতত্ত্ব সাধন করিতে হইবে, যেমন করিয়া হোক, আমাদিগকে এই কথাটা বুঝিতে হইবে যে, কলেবরহীন আত্মা কখনোই সত্য নহে—কেননা, কলেবর আত্মারই একটা দিক। তাহা গতির দিক, শক্তির দিক, মৃত্যুর দিক—কিন্তু তাহারই সংযোগে আত্মার স্থিতি, আনন্দ, অমৃত। এই কলেবরসৃষ্টির অসম্পূর্ণতাতেই আমাদের দেশের শ্রীহীন আত্মা শতাব্দীর পর শতাব্দী হাহাকার করিয়া ফিরিতেছে।"

মনে পড়ে, একথা স্বামীজীর কাছ থেকেও যেন শুনেছি। রবীন্দ্রনাথকে যাঁরা কেবল উপনিষদের ভূমানন্দের ধারক ও বাহক ব'লে বোঝেন ও প্রচার করেন তাঁদের এরকম মন্তব্যগুলি পুনঃপুনঃ চোখের সামনে রাখতে অনুরোধ জানাই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যখন তপোবনাশ্রমের স্বপ্ন দেখছেন, তখনও বোধহয় বস্তুর ব্যবহার-প্রয়োজন বা কায়াসাধনকে ত্যাগ করার কথা বলেন নি।, উপকরণ-বাহুল্য তিনি চাননি এইমাত্র। দেশের শিল্পায়ন, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের বহুল ব্যবহারে দেশের সমৃদ্ধি, মাতৃভাষাকে মধ্যস্থ রেখে ইংরেজি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর প্রগতিশীল উদার মত চিরকালই

ছিল, ক্রমশঃ তা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এদিক থেকে গান্ধীজীর রক্ষণশীলতার সঙ্গে তাঁর আদর্শের বৈপরীত্যও স্মরণীয়। সুতরাং জাতীয়তার প্রভাবের কালেও রবীন্দ্রনাথ যে প্রাচীনকেই সর্বস্ব ব'লে মনে করতেন এমন ধারণায় বাধা আছে। নিম্নলিখিতরূপ উক্তি বোধ হয় কবির নিজেরই ব্রহ্মবিদ্যালয়-আশ্রম উদ্‌যোগের সমালোচনা—" 'জাতীয়' নামের দ্বারা চিহ্নিত করিয়া আমরা কোনো-একটা বিশেষ শিক্ষাবিধিকে উদ্ভাবিত করিয়া তুলিতে পারিনা। যে শিক্ষা স্বজাতির নানা লোকের নানা চেষ্টার দ্বারা নানাভাবে চালিত হইতেছে তাহাকেই জাতীয় বলিতে পারি। স্বজাতীয়ের শাসনেই হোক আর বিজাতীয়ের শাসনেই হোক, যখন কোনো একটা বিশেষ শিক্ষাবিধি সমস্ত দেশকে একটা-কোনো ধ্রুব আদর্শে বাঁধিয়া ফেলিতে চায় তখন তাহাকে জাতীয় বলিতে পারিব না—তাহা সাম্প্রদায়িক, অতএব জাতির পক্ষে তাহা সাংঘাতিক।" প্রপিতামহদের বাসা আঁকড়ে পড়ে থাকা যে মানুষের জীবন নয়, পুরাতনের সঞ্চয় অর্থাৎ আবর্জনাকে ঘৃণাভরে সরিয়ে দিয়ে দুঃখ ও সংগ্রামের পথে গতিশীল নবজীবনের ঐশ্বর্য আবিষ্কার ক'রে চলাই যে যথার্থ মনুষ্যত্ব, সেকথা শান্তিনিকেতনের ভাষণমালার মধ্যেই নানাভাবে পাওয়া যাচ্ছে। এই অর্থেই তিনি ভারতবর্ষের স্বাদেশিক অগ্রগতির ধারা লক্ষ্য করেছেন, পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পন্থার মধ্য দিয়ে জনগণের অবিরাম গতির ধ্বনি শুনেছেন এবং জাতিভেদ ও সাম্প্রদায়িক ধর্মের বিভেদ চূর্ণ ক'রে দু'হাজার বছর পূর্বেকার উদার ও গতিধর্মী যথার্থ হিন্দু সভ্যতার পুনরাবির্ভাব ঘটাতে চেয়েছেন।

এই দ্বিতীয় পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথ যে প্রবলভাবে পরিবর্তন ও নূতনের পক্ষপাতী হয়ে উঠেছেন তার পরিস্ফুট প্রারম্ভ মহাযুদ্ধের প্রারম্ভকালের সমীপবর্তী মনে করা যায়। আমরা ঐ পরিস্ফুটতার পূর্বাভাস এতক্ষণ ব্যক্ত করছিলাম। খ্রীঃ ১৯১২ এবং '১৩র কিছুদিন রবীন্দ্রনাথ লণ্ডন ও আমেরিকায় কাটিয়ে স্বদেশে ফিরলেন। তাঁর এই পশ্চিম-যাত্রার উদ্দেশ্য, মনে হয়, ওখানকার মনীষীদের সঙ্গে শিক্ষা ও সাহিত্য এবং কিছুটা জীবনধারণ ও সংস্কৃতি-বিষয়ে ভাব-বিনিময়, তাঁর কবিতা নাটকের ইংরেজি অনুবাদের প্রচার এবং নিজের চিকিৎসা। বলা বাহুল্য, এই তিন দিক দিয়েই যাত্রা সার্থক। আর সেই সঙ্গে উপরি-লাভ দীনবন্ধু এন্ড্রুসের সঙ্গে পরিচয় ও নোবেল পুরস্কারের সম্মান। ভাবের আদান-প্রদানের দিক থেকে বলা যেতে পারে, ইংল্যাণ্ড তথা য়ুরোপ রবীন্দ্রনাথকে একজন মিস্‌টিক্ সাধুসন্ত্ রূপেই অনুভব করেছিলেন। গীতাঞ্জলির অনুবাদের মধ্যে কেউ কেউ কবির নিসর্গসৌন্দর্যপ্রীতি লক্ষ্য করলেও এবং পরে 'চিত্রাঙ্গদা'র মত প্রেমকাব্যের অনুবাদ প্রকাশিত হলেও, সুগভীর ধর্মভাবের জন্যই রবীন্দ্রকাব্যের মূল্য, এমন ধারণা পশ্চিমে বহুদিন প্রবল ছিল। কিন্তু বিস্ময়ের কথা এই যে, এরই প্রভাবে এদেশেও রবীন্দ্রকাব্যের আধ্যাত্মিক সমালোচনার একটি

ধাবা গ'ডে ওঠে এবং রবীন্দ্রনাথ ঋষি, দার্শনিক, ভক্তকবি প্রভৃতি-রূপে বহুদিন আখ্যাত হতে থাকেন। অথচ রবীন্দ্রকাব্যেব প্রথম রসিক সমালোচক মোহিতচন্দ্র সেনগুপ্ত তাঁর কাব্যগ্রন্থাবলী সম্পাদন করতে গিয়ে যে নিপুণ ভূমিকা যোজনা করেন তাতে পূর্বেই তাঁকে সমুন্নত মানবীয় ও নিসর্গসৌন্দর্যের কবি হিসাবে পরিচিত করেছিলেন এবং তখনকাব শ্রেষ্ঠ মাসিক পত্রিকা 'সাহিত্য'ও বিশুদ্ধ কবিত্বশক্তির বিচাবে তাঁকে আধুনিক শ্রেষ্ঠ কবি ব'লে পুনঃপুনঃ উল্লেখ করেছিল। তা ছাড়া দেখা যায়, ববীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তিব কিছু পবেই অন্ততঃ একজন সমালোচক তাঁব কাব্য, ছোটগল্প এবং উপন্যাসের ধাবাবাহিক যেসব আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন তাতে যুবোপীয আধুনিক সাহিত্যিক প্রবণতাগুলিব সঙ্গে তুলনায় বিচাবে ববীন্দ্রনাথের সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্য নিপুণভাবে বিশ্লেষিত হয়েছিল।* এসবও আমবা ভুলে গেলাম। গড্ডলিকা বীতি এবং প্রচাবধর্মেব এমনিই মহিমা! আরও লক্ষণীয় এই যে, গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-বাজা-ডাকঘবেব পব থেকে ববীন্দ্রনাথ যে মানুষেব মহিমাব দিকে দৃষ্টি ফেবালেন তাতেও গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্যেব তথাকথিত ঈশ্বরাভিনিবেশ-সম্পর্কে আমাদের সংশয় জন্মাল না। বিশুদ্ধ ববীন্দ্রসাহিত্যেব রসবিচাব থেকে আমরা এমনিই দৃষ্টি ফেরালাম যে, গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্যে কবিব অনুভূত সর্বব্যাপী সত্তা যে কবিকল্পিত সৌন্দর্যসত্তা, নিসর্গবমণীয়তাব কল্পিত বিগ্রহ, ইতিহাসপথচাবী, তা আব নজরেই পডল না। কবি-মিষ্টিক (যদি কবিকে মিষ্টিক বলাই যায়) আব সাধক-মিষ্টিক এ দুই যে অত্যন্ত পৃথক্ এই বিচাববোধ ববীন্দ্র-সমালোচকদেব কাছে প্রত্যাশিত ছিল, কাব্যেতব বিষযে অভিভূত থাকায় তা আব পাওয়া সম্ভব হয নি। যুবোপে রবীন্দ্রনাথ যেভাবে গৃহীত হলেন নির্বিচাবে তারই প্রতিধ্বনি এদেশেও শোনা যেতে লাগল কবিব নোবেল পুবস্কাব প্রাপ্তিব পব থেকে। ববীন্দ্র-অনুভবীবা বিচাব ক'বে দেখতেই চাইলেন না যে নৈবেদ্য-গীতাঞ্জলির ধার্মিক এবং ঈশ্ববভাবুক রবীন্দ্রনাথ একালে লিখিত 'ধর্মেব অধিকার' 'ধর্মেব নবযুগ' প্রভৃতি প্রবন্ধে ধর্ম বলতে ঠিক কী অনুভব কবেছেন এবং অচলায়তন-রাজা নাটকে কোন্ ধবনেব ঈশ্বরকে আমাদেব সামনে তুলে ধবেছেন।

লণ্ডন-আমেবিকা প্রবাসে কবি কিছু ভাষণ ও প্রবন্ধ লিখেছিলেন। এগুলি মোটামুটি প্রাচ্যের ভাবুকতা ও প্রতীচ্যেব জীবনবাদ নিয়ে। ববীন্দ্রনাথ স্বতই পশ্চিমে প্রাচ্যভাবধর্মের প্রসার চেয়েছেন। পশ্চিমেব সাম্রাজ্যবাদ বা বাষ্ট্রস্বার্থ নিয়ে এযাত্রা তিনি তেমন কিছু বলেন নি বললেই চলে। জাতিসংঘাত নিযে স্বল্প কিছু বক্তব্য আমেরিকায বেখেছিলেন, তবে তাতে তেমন জোর ছিল না। ববং আমাদের

*অধ্যাপক সুখরঞ্জন রায় (ঢাকা)

উদ্দেশ্য ক'রে ইংলণ্ড থেকে লেখা শিক্ষাবিষয়ক দু'একটি প্রবন্ধে একটু নোতুন কথা বলার প্রয়াস করেছেন, শিক্ষাব যথার্থতার অভাবেব দিকে ইঙ্গিত করেছেন। প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বাভাসেব সময় থেকেই রবীন্দ্রনাথ কল্পনায় ও মননে পরিবর্তিত হয়ে পড়েন। কাব্যে নিসর্গপ্রেরণা মন্দীভূত হয়ে জীবনের ও সমাজের অধিকাব বিস্তৃত হয়। গীতাঞ্জলি ও গীতিমাল্যের সঙ্গে তুলনায় গীতালির ভাবে পার্থক্যের দিকটি লক্ষ্য কবার বিষয়। এই সময়ে লেখা 'ফাল্গুনী' নাটকে আমাদের পুবাতন সমাজকে জীর্ণতা দূরে নিক্ষেপ ক'রে যৌবনেব চাঞ্চল্য অর্থাৎ প্রগতি ববণ কবার প্রেরণা দেওয়া হয়েছে। 'বলাকার' প্রথমের দিকেব কয়েকটি কবিতা, যেমন, সবুজেব আহ্বান, সর্বনেশে, শঙ্খ, প্রভৃতিতে ঐ স্থাবব সমাজকে দুঃখববণ করার বা সংগ্রামী বিপ্লবেব পথের পথিক হবার আহ্বান জানানো হয়েছে। এই সময়কার লক্ষণীয় ঘটনা হ'ল 'সবুজপত্রে'র প্রকাশ। বঙ্গীয় ১৩২১ সনেব বৈশাখে প্রমথ চৌধুবীব উদ্যোগে এই পত্রিকার প্রকাশ। এব উদ্দেশ্য জডত্ব ও শৈথিল্য থেকে শিক্ষিত বাঙালিকে উদ্ধাব কবা। চলিত ভাষায প্রবন্ধাদি লেখাব ধারা প্রতিষ্ঠিত কবা এই পত্রিকাব গৌণ কীর্তি মাত্র। পত্রিকাব প্রধান লেখক ববীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুবী। ববীন্দ্রনাথ এবকম পত্রিকাব প্রকাশে যাবপবনাই আনন্দ প্রকাশ কবেছিলেন এবং এব প্রযোজনে স্বযং নিঃশেষ প্রগতিব দিকে উদ্বোধিতও হযেছিলেন। 'কালান্তব' পুস্তকেব উল্লেখযোগ্য বাজনীতিক ও সমাজনীতিক প্রবন্ধাবলী এই সবুজপত্রের পৃষ্ঠাতেই প্রকাশিত। একালের সংস্কারেব বিরুদ্ধে বিপ্লবধর্মী ও মানবিকতাময উপন্যাস 'চতুবঙ্গ', বিবাহিতা পত্নীব অন্যাসক্তি নিযে পবীক্ষামূলক উপন্যাস 'ঘরে বাইবে' এবং নাবীপ্রগতিকে সমর্থন জানিয়ে লেখা কয়েকটি ছোটগল্পও সবুজপত্রেব তাগিদে বচিত। এই সব মিলিযে খ্রীঃ ১৯১৪ থেকে আরম্ভ ক'বে ববীন্দ্র মানসধর্মে যে-কালেব অভ্যুদয় ঘটল তা বিস্ময়কব রূপে তখনকাব বাংলায অভিনব, বৈপ্লবিক।

গীতালি-বলাকার সময থেকে কবি নির্দ্বন্দ্ব প্রগতি-চেতনার অধিকাবী, আব সৃষ্টিধর্মী সাহিত্যিক বচনাই এই পর্বে তাঁব আত্মপ্রকাশেব মুখ্য বাহন হয়েছে। এই পর্বেই গান্ধীজীর নেতৃত্বে নূতন বীতির স্বাধীনতা আন্দোলন এবং জনজাগরণেব সূচনা, এই পর্বেই বলশেভিক বিপ্লব এবং ভাবতে সাম্যবাদী কয়েকটি রাজনীতিক দলের উদ্ভব, দেশীয ব্যবসা-বাণিজ্যের বিস্তারের প্রাবম্ভ, শান্তিনিকেতনে বিশ্বভাবতীর প্রতিষ্ঠা এবং সুরুলে আধুনিক কৃষিবিদ্যাচর্চা ও গ্রামসংগঠনেব প্রবর্তন। এই পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথের সমাজনীতিক ও রাজনীতিক কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধেবও রচনা। এই পর্যায়ে কবির বিপ্লবী ব্যক্তিত্বেরও পূর্ণতম বিকাশ। আনুমানিক ১৯২৪ খ্রীঃ পর্যন্ত এই পর্ব প্রসাবিত মনে কবা হয়েছে। ১৯২৪এর পর থেকে প্রাগ্রসর ধনতান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে লেখনীধারণ

এবং তাঁর উদারতম ও কার্যকরী মানবিকতা ও সমাজতন্ত্রবাদে নিতান্ত আস্থার পূর্ণাঙ্গ পরিচয় প্রকাশিত হয়েছে। এ যেন কবি-মনীষীর দীর্ঘকাল ধরে উপলব্ধ, অনুশীলিত সমাজরাষ্ট্রচিন্তার ও স্বাদেশিকতার নিতান্ত আন্তরিক ও ঘনীভূত প্রকাশ।

নৈবেদ্য-গীতাঞ্জলির ধর্মচেতনা ও ঈশ্বরবোধ সম্পর্কে ইংলণ্ডের সুধীসমাজ যে ধারণাই পোষণ করুন এবং তদনুসরণে ভারতীয় রবীন্দ্র-রসিক যে-আলোচনাই উপস্থাপিত করুন না কেন, এ-কথা স্বীকার করতেই হবে যে সে-ধর্ম মানুষ এবং তার জড়ত্বমুক্ত উদার সামাজিক জীবনের সঙ্গে নিত্যসম্বন্ধে আবদ্ধ, সে-ঈশ্বর মানুষের জীবন-সংগ্রাম ও পতন-উত্থানের নিযত সঙ্গী, আর সে-মানুষ ভারতের হিন্দু-মুসলমান উচ্চবর্ণ-নিম্নবর্ণ নির্বিশেষ মানবসত্তা। তাঁর এই ধর্মবোধের পরিচয় তত্ত্ববোধিনী-সম্পাদক হিসেবে তত্ত্ববোধিনীতে প্রকাশিত 'ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা' 'আত্মপরিচয়' ধর্মের নবযুগ' ও 'ধর্মের অধিকার' প্রবন্ধে সম্যক্ প্রকাশিত হয়েছে এবং এবিষয়ে স্বল্প পূর্বেই আমরা আলোচনা করেছি। ১৯১৪ খ্রীঃ প্রারব্ধ প্রথম মহাযুদ্ধের প্রতিঘাতে লিখিত সৃষ্টিধর্মী রচনা হ'ল 'বলাকা'র কবিতাবলী, গীতালির গান এবং ফাল্গুনী। কিন্তু সমাজ ও রাষ্ট্রের দিক দিয়ে উৎপীড়ক এবং স্বার্থপর পাপী মানুষের গ্লানি-মোচনের প্রয়োজনেই রক্তক্ষয় ও আত্মদান আবশ্যক হয়ে পড়েছে এমন ধারণা তিনি একালে ভাষিত বা লিখিত কয়েকটি প্রবন্ধেই প্রকাশ করেছেন। যে সাম্রাজ্য-লোভ এবং ধনতন্ত্রমূল রাষ্ট্রস্বার্থ যুদ্ধবিগ্রহের মূলে, তার নিরাকরণের প্রযাসে এবং স্থায়ী যথার্থ শান্তির প্রতিষ্ঠায় স্বল্প পরেই তিনি আমেরিকা ও যুরোপে কিছু ভাষণ দেন এবং শান্তিকামী মনীষীদের সঙ্গে সাক্ষাৎও করেন, কিন্তু চির-অভিযাত্রী মানুষের সংগ্রামের সমর্থক ও শোষিতের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন কবি প্রথম মহাযুদ্ধকে অভিনন্দিতই করেছেন দেখি। হয়ত বা তাঁর এমন ধারণা হয়েছিল যে এই যুদ্ধে স্বার্থে-স্বার্থে সংঘাতে স্বার্থপরতা বিচূর্ণ হবে, যদিও প্রত্যাশাভঙ্গ ঘটতেও তাঁর বেশিদিন লাগেনি। শান্তিনিকেতন' পুস্তকে গ্রথিত তাঁর কয়েকটি ভাষণে যুদ্ধকে অভ্যর্থনার পরিচয় দেখি। তারও লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, রবীন্দ্রনাথের এই মনোভাবে কেবল যুরোপের সাম্রাজ্যবাদী সংঘাতের কথাই স্থান লাভ করেনি, ভারতবর্ষের শ্রেণীস্বার্থপোষক হিন্দুধর্মের ও উচ্চবর্ণের নিষ্ঠুর অমানবীযতাও সমানভাবে অভিশপ্ত হয়েছে। যেমন—

> "মানুষের মুশকিল হয়েছে, সে আপনার সংস্কার দিয়ে আপনার চারিদিকে একটা আবরণ উঠিয়েছে, কত যুগের কত আবর্জনাকে সে জমিয়ে জমিয়ে তুলেছে। সে বলে, 'আকাশের আলোককে আমি বিশ্বাস করব না, আমার ঘরের মাটির দীপকে আমি বিশ্বাস করব, আলোক নতুন, কিন্তু আমার

ঐ দীপ সনাতন।' তার শয়নগৃহে বিষাক্ত বাতাস জমা হয়ে রয়েছে; সেইটেতেই সে প'ড়ে থাকতে চায়, কেন না, সে যে হ'ল তার সঞ্চিত বাতাস, সে নতুন বাতাস নয়। ঈশ্বরের আলো, ঈশ্বরের বাতাস কেবলই যে নতুনকে আনে সেই নতুনকে সে বিশ্বাস করছে না। ঘরের কোণের অন্ধকারটা পুরাতন, তাকেই সে পূজা করে।

"এইজন্য ঈশ্বরকে ইতিহাসের বেড়া যুগে যুগে ভাঙতে হয়। তাঁর আলোককে তাঁর আকাশকে যা নিষেধ ক'রে দাঁড়ায় তারই উপরে একদিন তাঁর বজ্র এসে পড়ে। সেইখানে একদিন তাঁর ঝড় বয়। তবে মুক্তি। স্তূপাকার সংস্কার যা জমা হয়ে উঠে সমস্ত চলবার পথকে আটকে বসে আছে সেইখানে রক্তস্রোত বয়ে যায়। তবে মুক্তি। স্বার্থের সঞ্চয় যখন অভ্রভেদী হয়ে ওঠে তখন কামানের গোলা দিয়ে তাকে ভাঙতে হয়। তবে মুক্তি। তখন কান্নায় আকাশ ছেয়ে যায়। কিন্তু সেই কান্নার ধারা নইলে উত্তাপ দূর হবে কেমন ক'রে?...

"মানুষ মানুষকে খেয়ে বাঁচবে, এই হবে? ইতিহাসবিধাতা তাই হতে দেবেন? না। তিনি কামানের গর্জনের ধ্বনির ভেতর দিয়ে বলেছেন— নতুন হতে হবে। য়ুরোপে নতুন হবার সেই ডাক উঠেছে।

"সেই আহ্বান আমাদের মধ্যে নেই? আমরাই জরাজীর্ণ হয়ে থাকব? ইতিহাসবিধাতা কি আমাদেরই আশা ত্যাগ করেছেন? দুর্গতির পর দুর্গতি, দুঃখের পর দুঃখ দিয়ে তিনি আমাদের দেশকে বলছেন, 'না, হয়নি, তোমাদেরও হয়নি, নতুনকে লাভ অমৃতকে লাভ হয় নি। তুমি যে আবর্জনাস্তূপ জমিয়েছ তা তোমাকে আশ্রয় দিতে পারে নি। আমি অনন্ত প্রাণ, আমায় বিশ্বাস করো। বীর পুত্র, দুঃসাহসিক পুত্র সব, বেরিয়ে পড়ো'।" (অমৃতের পুত্র—শান্তিনিকেতন)

পরের দিনের ভাষণে কবি একই কথার পুনরুচ্চারণ করেছেন, যেমন—

"সত্যকে হাজার হাজার বছর ধরে বেঁধে অচল ক'রে রেখে দিয়েছি এই বলে আমরা গৌরব করে থাকি। ....ইতিহাসবিধাতা সেই স্পর্ধা চূর্ণ করবেন না। মানুষ অন্ধ জড়প্রথার কারাপ্রাচীর যেখানে অভ্রভেদী করে তুলবে এবং সত্যের জ্যোতিকে প্রতিহত করবে, সেখানে তাঁর বজ্র পড়বে না।... রুদ্ধ সত্যের সেই করাঘাত কি ভারতবর্ষের ললাটে এসে পড়ে নি? সত্যকে ফাঁসি পরাতে চেয়েছে যে-দেশ সে-দেশ কি সত্যের আঘাতে মূর্ছিত হয় নি? অপমানে মাথা হেঁট হয়নি? সইবে না বন্ধন—বড়ো দুঃখে ভাঙবে, বড়ো

অপমানে ভাঙবে। সেই উদ্‌বোধনের প্রলয়মন্ত্র পৃথিবীতে জেগেছে, সেই ভাঙবার মন্ত্র জেগেছে।"

এই সব উক্তির সঙ্গে 'বলাকা'ব শঙ্খ, ঝড়ের খেয়া প্রভৃতি কবিতার ভাব তুলনার যোগ্য এবং একই বিষয়েব উপর পুনঃপুনঃ জোব দিয়ে কথা বলায় কবি স্বদেশের সামাজিক শোষণেব ব্যাপারে অন্তরে কতদূর আহত ছিলেন তারই প্রমাণ মিলছে। অন্য একটি ভাষণে দেখা যায, কবি ন্যায়েব সংগ্রামকে অন্যায় মনে কবেন না, নিষ্ঠুব শোষণ-উৎপীডনকেই হিংসাত্মক আচবণ ব'লে মনে কবেন এবং তাবই নিবাকবণে সশস্ত্র সংগ্রামকে অভ্যর্থনা জানান। "মা মা হিংসীঃ" ভাষণ পডলে এ বিষযটিও স্পষ্ট হযে ওঠে যে এদেশেব জাতিবর্ণভিত্তিক শ্রেণীশোষণেব কলঙ্ক কবিব কাছে এতই তুর্নিবার ব'লে মনে হয়েছে, সুতরাং এতই অসহনীয হয়ে উঠেছে যে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ভিত্তিতেই এই গ্লানিব মোচন-সম্ভাবনা অনুমান কবেছেন এবং শ্রেণীচবিত্রধারীদের কাছে ব্যঞ্জনায় জানাচ্ছেন—এই হিংসা বন্ধ কবো এবং তাদেব হয়ে প্রার্থনা করছেন—হে ঈশ্বর, এই ক্ষুদ্রতা, সংকীর্ণতা, জঘন্য স্বার্থপরতাব হাত থেকে আমাদেব বাঁচাও। যেমন—

"যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ ক্ষুদ্র বিষয নিয়ে মরছে ততক্ষণ পর্যন্ত তুঃখের পর তুঃখ, আঘাতের পব আঘাত তার উপর আসবেই আসবে—কে তাকে রক্ষা কববে। কিন্তু, যেমনি সে তাব সমস্ত তুঃখ-আঘাতের মধ্যে সেই অমৃত-লোকেব আশ্বাস পায অমনি তাব এই প্রার্থনা আর-সকল প্রার্থনাকে ছাড়িযে ওঠে: মা মা হিংসীঃ। প্রতিদিনেব হাত থেকে, ছোটোব হাতের মাব থেকে আমাকে বাঁচাও। আমি বডো,—আমাকে মৃত্যুব হাত থেকে, স্বার্থের হাত থেকে, অহমিকার হাত থেকে নিযে যাও।······আজ মানুষ মানুষকে পীড়ন কববার জন্যে নিজেব এই অমোঘ ব্রহ্মাস্ত্রকে ব্যবহাব কবেছে, তাই সে ব্রহ্মাস্ত্র আজ তারই বুকে বেজেছে। মানুষেব বক্ষ বিদীর্ণ ক'বে আজ রক্তের ধারা পৃথিবীতে প্রবাহিত হয়ে চলবে—আজ কে মানুষকে বাঁচাবে! ···আমবা আজ এই পাপেব মূর্তি যে কী প্রকাণ্ড তা কি দেখব না? এই পাপ যে সমস্ত মানুষের মধ্যে রয়েছে এবং আজ তাই এক জায়গায় পুঞ্জীভূত হয়ে বিরাট আকার নিয়ে দেখা দিয়েছে, এ কথা কি আমরা বুঝব না! আমরা এ দেশে প্রতিদিন পরস্পরকে আঘাত করছি, মানুষকে তার অধিকার থেকে বঞ্চিত কবছি, স্বার্থকে একান্ত ক'রে তুলছি। এ পাপ কত দিন ধরে জমছে, কত যুগ ধরে জমছে! প্রতিদিনই কি আমরা তারই মার খাচ্ছি নে? বহু শতাব্দী থেকে আমরা কি কেবলই মরছি নে? সেই

জন্যই তো এই প্রার্থনা : মা মা হিংসীঃ। বাঁচাও বাঁচাও এই বিনাশের হাত থেকে বাঁচাও।"

বহুকীর্তিত "ঈশ্বরভাবুক" রবীন্দ্রনাথেব কাছে এবং 'শান্তিনিকেতন' ভাষণে এ কী বৈপ্লবিক কথা শুনছি! তাহ'লে এতদিন আমবা কি ববীন্দ্রনাথকে ঠিক বুঝিনি, অথবা অসুবিধে আছে ব'লে ইচ্ছে ক'বেই বুঝতে অথবা বোঝাতে চাইনি। সাম্রাজ্য-বাদীদের এই পারস্পরিক সংগ্রামকে এবং প্রত্যাশিত বিনিপাতকে কবি যে অভ্যর্থনা কবেছেন তার প্রমাণ অন্যত্রও রয়েছে, যেমন, তাঁর 'আত্মপরিচয়' পুস্তিকার তিন সংখ্যক ('আমাব ধর্ম') প্রবন্ধে। তিনি লিখছেন—

> "যে বোধে আমাদেব আত্মা আপনাকে জানে সে বোধেব অভ্যুদয় হয় বিরোধ অতিক্রম ক'বে, আমাদের অভ্যাসের এবং আবামেব প্রাচীব ভেঙে ফেলে। যে বোধে আমাদেব মুক্তি, দুর্গং পথস্তৎ কবযো বদন্তি—দুঃখের দুর্গম পথ দিয়ে সে তাব জযভেবী বাজিয়ে আসে—আতঙ্কে সে দিগ্‌দিগন্ত কাঁপিয়ে তোলে, তাকে শত্রু ব'লেই মনে কবি, তাব সঙ্গে লড়াই ক'বে তবে তাকে স্বীকাব করতে হয়—কেননা, নাযমাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ। 'অচলাযতনে' এই কথাটাই আছে····· আমি তো মনে কবি আজ য়ুরোপে যে যুদ্ধ বেধেছে সে ঐ গুরু এসেছেন ব'লে। তাঁকে অনেক দিনেব টাকাব প্রাচীব, মানেব প্রাচীব, অহংকারের প্রাচীব ভাঙতে হচ্ছে।"

বুঝতে হবে যে ববীন্দ্রনাথ এ সব জায়গায় 'আত্মা' 'মুক্তি' প্রভৃতি পুবাতন অধ্যাত্ম-বোধক শব্দ ব্যবহাব কবলেও এবং উপনিষদেব মন্ত্র উদ্ধার কবলেও তার দ্বারা বাস্তব সামাজিক-বাষ্ট্রিক পরিস্থিতির বর্ণনাই দিয়েছেন। আমাদেব পূর্বপবিচিত অধ্যাত্মকথা বলেন নি। এসব বিষয় পর্যালোচনা না ক'রেই ভাবতের জাতীয়তা-আন্তর্জাতিকতার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধ-নির্ণায়ক শ্রদ্ধেয় আধুনিক লেখক নেপাল মজুমদাব রবীন্দ্রনাথকে একদিকে ধনতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদেব বিরুদ্ধে সাম্যবাদী বাস্তব সংগ্রামী, অন্যদিকে ভগবদ্‌বাদী বিশুদ্ধ আধ্যাত্মিক ব'লে নির্ধারণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট ঈশ্বব-অধ্যাত্মের রীতি-প্রকৃতিব স্বরূপ একটু গভীরভাবে সন্ধান কবলেই তিনি দেখতেন যে নিসর্গ এবং বাস্তব জীবন, বাস্তব সংগ্রামের এক কানাকড়ি অতিরিক্ত মূল্য তিনি অধ্যাত্মের উপর আরোপ কবেন নি। তাঁর অমৃত, তপস্যা প্রভৃতি শব্দ জড়ের সঙ্গে মানুষের সংগ্রাম এবং তাব ফলাফলের কথাই নির্দেশ কবেছে অথবা সৌন্দর্য-উপলব্ধির প্রকারকেই নির্দেশ কবেছে। তাই, নিজ নিজ পূর্বসংস্কারে বিমূঢ় হয়ে সাধারণ আলোচকেরা যেখানে অধ্যাত্মদর্শন করেছেন, নেপালবাবুও সেই গড্ডলিকা রীতিতেই চালিত হয়ে নিঃশেষে সমাজবাদী ও প্রগতি-পথিক রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা

উপলব্ধি ক'রেও তাঁকে অধ্যাত্মবাদী বলে চিহ্নিত করতে দ্বিধা অনুভব করেন নি, যেমন—"ইংলণ্ড ও আমেরিকায় ধর্ম ও অধ্যাত্মবিষয়ক বক্তৃতা এবং গীতাঞ্জলির স্বীকৃতি ও সমাদর লাভের ফলে রবীন্দ্রনাথের মনে কেমন যেন একটি ধারণা ক্রমশই বদ্ধমূল হইতে থাকে যে, জগতের মূল সমস্যাই হইতেছে ধর্ম ও অধ্যাত্মসমস্যা। রাজনীতির প্রয়োজনীয়তা ও কার্যকারিতা সম্পর্কে তিনি ক্রমশই গভীরভাবে সন্দিহান হইয়া উঠিতে থাকেন।......এইখানেই গান্ধীজীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রধান পার্থক্য।" কিন্তু সত্যই কি তাই? তাহ'লে বিলাত-যাত্রার অব্যবহিত পূর্বেকার তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত "ধর্মের অধিকার", "ধর্মের নবযুগ" প্রভৃতি প্রবন্ধকে মূল্যহীন মনে করতে হয়। সেই সঙ্গে আমাদের আলোচিত শান্তিনিকেতন ভাষণগুলি এবং পরবর্তী কালান্তর প্রভৃতির বহু রচনাও। ঐ প্রবন্ধ দুটিতে ধর্ম বলতে তিনি কি আধ্যাত্মকে মনে করেছেন? "যাত্রার পূর্বপত্রে" য়ুরোপের আধ্যাত্মিকতা প্রমাণ করতে গিয়ে তিনি কি বেদ-বেদান্তের আধ্যাত্মিকতা টেনে এনেছেন? বস্তুতঃ আমরা দেখিয়েছি যে য়ুরোপ-যাত্রার ঠিক পূর্ব এবং পরবর্তী কাল থেকেই তিনি পরিস্ফুটভাবে জীবনবাদী হয়ে উঠেছেন। তথাকথিত আধ্যাত্মিকতার যদি কিছু খাদ পূর্বে থেকেই থাকে মহাযুদ্ধের পর থেকে তা নিঃশেষিত হয়েছে। Nationalism-এর প্রবন্ধাবলীতে তিনি কোন্ আদর্শে য়ুরোপের রাষ্ট্রস্বার্থের সমালোচনা করেছেন? বেদান্তের আদর্শে না বাস্তব মানবিক আদর্শে? অবশ্য নৈতিক সন্দেহ নেই। গীতালি, বলাকা, ফাল্গুনী, সবুজ পত্র এবং কালান্তরের প্রবন্ধনিচয় এই প্রগতিমূলক জীবনবাদী মনোভাবের, এবং আধ্যাত্মিক নয়, বাস্তব সংগ্রামের মনোভাবের পরিচয়ই বহন করছে। ভারতে প্রচলিত রাজনীতির আন্দোলন যা তাঁর মতে ভিক্ষার আন্দোলন, কাপুরুষতার পরিচায়ক, তা তিনি সমর্থন করেন নি। ত্যাগদুঃখময় আত্মসংগঠন বা স্বদেশী সমাজের সংগঠনের মধ্যেই তিনি যথার্থ স্বরাজ পাবার নির্দেশ দিয়েছিলেন। 'গান্ধীজী' প্রবর্তিত আন্দোলনের সঙ্গে তিনি যে মনে-প্রাণে সামিল হতে পারেন নি তার কারণ তাঁর আধ্যাত্মিক কোনো আদর্শ নয়। আধ্যাত্মিক কারণে তিনি অসহযোগকে না-ধর্মী বলেন নি, বাস্তব কারণেই বলেছেন। সে হ'ল তাঁর অভিপ্রেত কর্মমূলক সংগঠন-পদ্ধতি, যার মধ্যস্থতায় অবহেলিত অনুন্নত সমাজকে শিক্ষিত নাগরিক সমাজের সমকক্ষ ক'রে তোলা হবে, হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ বিনষ্ট করা হবে। সুতরাং লেখকের এ বিবেচনও ঠিক কিনা সন্দেহ যে "রবীন্দ্রনাথ গ্রামাঞ্চলের গরীব মানুষের উপর জমিদার, মহাজন, পুরোহিত, মনিব, পুলিসের শোষণ অত্যাচারকে দেখিতে পাইলেন, কিন্তু কোথাও তাহার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রামের আহ্বান জানাইতে পারিলেন না।" রবীন্দ্রনাথের গঠনমূলক স্বদেশীর আহ্বান এই প্রতিরোধ-সংগ্রামের আহ্বান নয় কেন? 'জাতীয়তা-আন্তর্জাতিকতা'র লেখক

মজুমদার মহাশয় অন্ততঃ এখানে গান্ধীজীর চম্পারণ সত্যাগ্রহ প্রভৃতিকে ঠিক পথের আন্দোলন ব'লে মনে করেছেন এবং মনে করেছেন যে রবীন্দ্রনাথ অধ্যাত্মবাদী ব'লেই ঐ আন্দোলনেব সপক্ষতা করেন নি। কিন্তু একথা কি ঠিক নয় যে গান্ধীজীই আধুনিক পলিটিক্‌স্‌কে অহিংস-অধ্যাত্মেব দ্বারা সমাবৃত করতে চেয়েছেন, অথচ রবীন্দ্রনাথের সমাজ-সংগঠন আদর্শে (কি কালীগ্রাম-শিলাইদহে কি শ্রীনিকেতনে) অধ্যাত্মের বাষ্প-মাত্র নেই। গান্ধীজী আধুনিক বিজ্ঞানেব প্রসাব চান নি, শিল্পাযনের ও কৃষিতে যন্ত্র-ব্যবহারের বিরোধী ছিলেন, এমন কি ইংরাজিভাষা-শিক্ষাবও বিরোধী ছিলেন, কৃত্রিম-পদ্ধতিতে জন্মনিয়ন্ত্রণ নিয়ে শ্রীমতী স্যাংগারেব সহিত তাঁব বিতর্ক ধর্মবোধ নিয়েই, এমন কি বিহারের ভূমিকম্পকেও তিনি অতিপ্রাকৃতভাবে বিচাব করেছেন, অথচ এসব বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিকোণ কতই না আধুনিক ও বাস্তব। "ভিক্ষার দানে আমবা স্বাধীন হইব না……তপস্যাব বলে আমবা সেই দানেব অধিকার পাইব" এবং "পিতামহেরা অমবলোক হইতে আমাদের আহ্বান কবিতেছেন, বলিতেছেন—তোমরা যে অমৃতেব পুত্র এই কথা জানো এবং এই কথা জানাও, মৃত্যুছাযাচ্ছন্ন পৃথিবীকে এই সত্য দান করো যে, কোনো কর্মপ্রণালীতে নয়, বাষ্ট্রতন্ত্রে নয়, বাণিজ্য-ব্যবস্থায নয়, যুদ্ধ-অস্ত্রের নিদারুণতায় নয়—তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি··" এই ধরণের উক্তিতে তপস্যা বলতে এবং অমৃতলাভ বলতে রবীন্দ্রনাথ কি যথার্থই ধ্যানী আরণ্যক হয়ে যেতে বলেছেন, অথবা দুঃখের মধ্য দিয়ে শক্তিলাভ, সংগঠনেব মধ্য দিয়ে আত্মকর্তৃত্বের অমৃত-ফললাভকে লক্ষ্য করেছেন? "কর্মপ্রণালী" "বাষ্ট্রতন্ত্র" "বাণিজ্য-ব্যবস্থা" "যুদ্ধ-অস্ত্র" প্রভৃতি বিষয় কি সাম্রাজ্যবাদী পশ্চিমেব সমালোচনায় ব্যবহৃত হয় নি, যেমন ধবা যাক্‌ National-ism-এর প্রবন্ধে অথবা "Organization" প্রবন্ধে, এবং তার পরিবর্তে ভারতীয় উদার সামাজিকতার দিকে অঙ্গুলিনির্দেশে কি "এইখানেই তাঁহার আধ্যাত্মিকতা আসিয়া দেখা দিয়াছে" এমন মন্তব্য সমীচীন? গান্ধীজী সন্ত্রাসবাদের সপক্ষতা করেন নি, রবীন্দ্রনাথও করেন নি। কিন্তু এ বিষয়ে কারণ হিসেবে দুই মনীষীর দৃষ্টিভঙ্গি কি এক? রবীন্দ্রনাথ কি গান্ধীজীর মতই অহিংস-অধ্যাত্মেব দিক দিয়ে কবেন নি? রবীন্দ্রনাথ সন্ত্রাসবাদীদের বীরত্বের পুনঃপুনঃ প্রশংসা করেছেন অথচ বিচ্ছিন্ন হত্যাকে সমর্থন করছেন না, এতে কি এই মনে হয় না যে এটি সাফল্যের কার্যকর পন্থা নয় ব'লেই করেন নি। বন্ধুবর মজুমদারের মত যুক্তিবাদী লেখকও যখন বিনা বিচারে রবীন্দ্র-বাক্যে মুহুর্মুহু অধ্যাত্ম দর্শন করেন তখন এই প্রার্থনা করা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না যে, হে ইতিহাস-বিধাতা, এই সম্মোহ থেকে আমাদের বুদ্ধিজীবীদের তুমিই পরিত্রাণ করো।

প্রথম মহাযুদ্ধ এবং সবুজপত্রের প্রকাশ উপলক্ষ্য ক'রে মুক্তপুরুষ রবীন্দ্রনাথের অবরুদ্ধ অন্তর এমন ভাবেই আত্মপ্রকাশ করেছিল যে এদেশের রক্ষণশীল সমাজ সচকিত

হয়ে নানাভাবে তাঁকে আক্রমণ করে। বাস্তব পদার্থ নেই ব'লে তাঁর সাহিত্য-সৃষ্টিরই নিন্দা করা হয়, যে-সাহিত্যেই তাঁর স্বরূপের মুখ্যতম প্রকাশ! অবশ্য এর পূর্বেও 'অচলায়তন' নিয়ে তাঁকে এই নিন্দাবাদের সম্মুখীন হতে হয়েছিল যে তিনি হিন্দুসমাজকে ভাঙতে চাইছেন। এই অভিযোগ তিনি স্বীকারও করেছিলেন এবং মৃদু-ভাবেই জানিয়েছিলেন যে তিনি গড়ার কথাও বলেছেন। আসলে বিপ্লবের স্বরূপই হ'ল পুবাতনকে চুবমার ক'রে নূতনকে গড়ে তোলা। তিনি 'গুরু'ব মুখে স্পষ্টোক্তি বসিয়েছেন—'না যদি কুলোয় তাহ'লে এমনি ক'রে দেয়াল আবাব আব একদিন ভাঙতেই হবে, সেই বুঝে গেঁথো।' ফলতঃ অচলাযতন নিয়ে রবীন্দ্রজীবনীকারের আধুনিক উক্তি—"ববীন্দ্রনাথ একদিকে বিদ্রোহী, অন্যদিকে Reformist" অর্থহীন এবং অসম্যগ্ দর্শনেব পবিচায়ক। যাই হোক, অচলায়তনে যদি ববীন্দ্রনাথ প্রচলিত হিন্দু-ধর্মেব আচাবসর্বস্ব সংকীর্ণতাকেই ভাঙতে চেয়েছেন, পরবর্তীকালে চেযেছেন সামগ্রিক শোষণপ্রবৃত্তিকে, এক শ্রেণীব দ্বাবা অন্য শ্রেণীকে সবদিক থেকে বঞ্চিত ক'বে বাখার চক্রান্তকে নির্মূল কবাব জন্য ব্যাকুল হয়েছেন। তাঁব ধাবণায এ না হ'লে, শুধু ইংবেজ গেলে জনগণেব প্রকৃত স্বাধীনতা হবে না। এই উপলব্ধি প্রগতিসমর্পিত ববীন্দ্রচিত্তেব দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রস্ফুট, কিন্তু এবই অবিমিশ্র পবিচয় বহন কবছে তাঁর ১৯২৯-৩০ খ্রীঃ থেকে লিখিত বহু বচনা ও ভাষণ। এই সময় তাত্ত্বিক ভাবেও সংগ্রামী মানবমহিমাকে তিনি উপলব্ধি কবেছেন। সে পর্যায়ে আসার পূর্বে এখন যুদ্ধ-সমকালীন এবং সবুজপত্র-বলাকা-ফাল্গুনী-সমকালীন তাঁব বিভিন্ন অনুভূতি ও চিন্তার পবিচয লক্ষ্য করা যাক। সাহিত্যে প্রগতিমূলক জীবনভাবুকতাব আলোচনা যদ্যপি পববর্তী অধ্যাযে বিস্তৃতভাবেই করা হবে, তবু চিন্তা ও কল্পনাব নিগূঢ় সামঞ্জস্য প্রদর্শনেব জন্য সৃষ্টিধর্মী বচনাব বিষয় প্রসঙ্গক্রমে সন্নিবেশিত হ'ল (এবং এই অধ্যায়ে সর্বত্রই তা করা হয়েছে)।

গীতালির কযেকটি গানে যেমন যুদ্ধকে অভিনন্দিত কবাব মনোভাব স্পষ্ট, বলাকার বিশিষ্ট কয়েকটি কবিতাতেও তাই। এবং এদেবই সঙ্গে ভাবেব দিক থেকে একত্র বিবেচ্য উল্লিখিত 'শান্তিনিকেতনে'র "মা মা হিংসীঃ" "পাপেব মার্জনা" "আরো" প্রভৃতি ভাষণগুলি। আবাব 'সর্বনেশে' 'শঙ্খ' কবিতায় যেমন আমাদের জড জীবন থেকে চৈতন্যময় সংগ্রামী মুক্তিব তূর্য-আহ্বান জানানো হয়েছে, যুদ্ধারম্ভের ঠিক পরবর্তী 'ঝড়েব খেয়া'তেও এবং 'পাড়ি' কবিতাতেও তেমনিই। মহাযুদ্ধেব প্রতিঘাতেই কবিতাগুলির সূচনা, কিন্তু লক্ষণীয় এই যে কবি দ্রুতগতিতে য়ুরোপীয় জীবন থেকে স্বদেশের সমাজজীবনে প্রত্যাবৃত্ত হয়েছেন এবং এদেশীয় প্রথানির্ভর অমানবীয় সুবিধাবাদের জীবন, শ্রেণীকলঙ্কচিহ্নিত সুখ ও আরামের জীবনকে ধিক্কার দিয়ে এর

সুনিশ্চিত ভাবী পরিণামের জন্য প্রস্তুত হতে বলেছেন। 'পাড়ি' কবিতার মর্মকথা প্রারম্ভেই ব্যক্ত হয়েছে। এব মধ্যে অবহেলিত মানুষের যে ছবি তুলে ধরা হয়েছে, যে-মানুষের উদ্ধাবের জন্য ইতিহাস-বিধাতার আগমন, তা নিঃসন্দেহে স্বদেশের এবং শিলাইদহবাসের পর থেকে কবির নিতান্ত প্রত্যক্ষ ও সুপরিচিত। ফাল্গুনীতেও যে যৌবনেব জয় দেখানো হয়েছে তা আমাদেরই স্থবিরতাকে ধিক্কৃত ক'রে নূতন জীবনে উৎসাহিত করার জন্য। মনে বাখতে হবে, বলাকা-ফাল্গুনী থেকে প্রেবণা নিয়েই নজরুলের কাব্যের আসরে পদক্ষেপ, আব নজরুলেব জীবনবাদ একালের বাবীন্দ্রিক বাস্তবতারই অতিশয়িত প্রসার। সবুজপত্র রবীন্দ্রনাথের অবরুদ্ধ অথবা মন্দীভূত তারুণ্যের)বেগকে প্রবল ক'বে তুলেছিল, যাব ফলে গল্পসৃষ্টিতে নাবীর মুখেও এখন থেকে প্রতিবাদেব বাক্য উচ্চাবিত হযেছে সংকীর্ণ সমাজ ও সংসাবেব বিরুদ্ধে। চতুরঙ্গে এবং পলাতকা মহুযার কোনো কোনো কবিতাতেও এই প্রতিবাদ। নূতনেব বেগে চালিত হয়ে প্রৌঢত্বে অধিকতর তারুণ্যের অধিকাবী কবি বিবাহিতা নাবীব পবাসক্তি নিযেও পবীক্ষামূলক উপন্যাস বচনায় নামলেন এই পর্যাযেই। তবু এই নাবীত্বেব প্রতি সহানুভূতি কবির সর্বাত্মক বিপ্লবী মনোভাবেব একাংশ মাত্র।

'সবুজপত্র'-প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে 'সবুজেব অভিযান' ব'লে প্রায মৌখিক শব্দবিন্যাসে যে বিশিষ্ট কবিতাটি রচনা করেন, তাব প্রতিপাদ্য ভাবেব ব্যাখ্যা-হিসেবে লেখেন 'বিবেচনা ও অবিবেচনা' প্রবন্ধ ('কালান্তব' দ্রঃ), এতে পুবাতন প্রথা ও শাস্ত্রশাসন-বাহিত সমাজেব প্রচলিত রীতিনীতি উল্লঙ্ঘন করাব যৌক্তিকতা বোঝানো হয়েছে। যুদ্ধারম্ভের পর লেখা "লড়াইয়েব মূল" প্রবন্ধটি মহাযুদ্ধের কাবণ সম্পর্কে কবিব অধ্যয়ন যে কতদূর যথাযথ তা নির্দেশ করছে। যুবোপীয় রাষ্ট্রগুলিব সাম্রাজ্যলোভেব পিছনে যে ধনতান্ত্রিক চক্রান্ত বয়েছে এই ব্যাপারটি কবি ঠিক ধবেছেন দেখা যায়। এবং এও বুঝেছেন যে রাষ্ট্র আর কিছুই নয়, ধনতান্ত্রিক শোষণেব যন্ত্র "Organization", আর এই পণ্য-বিক্রয় মুনাফা-উঠানোর বাজাবের অসুবিধে হলেই ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিব মধ্যে যুদ্ধ লাগে। এর পূর্বেই অবশ্য কবি চীনে ও আফ্রিকায় এই ভাগাভাগির লড়াই ও ভাগাভাগির মিত্রতা লক্ষ্য করেছেন তবে ধনতান্ত্রিক কাঠামোটি তেমন ভালো ক'রে দেখেন নি, এখন দেখছেন। যেমন—

> "সম্প্রতি পৃথিবীতে বৈশ্যরাজক যুগেব পত্তন হইয়াছে। বাণিজ্য এখন আব নিছক বাণিজ্য নহে, সাম্রাজ্যের সঙ্গে একদিন তার গান্ধর্ববিবাহ ঘটিয়া গেছে। .... এখন বাণিজ্য-প্রবাহের মতো রাজত্ব-প্রবাহেরও দিনরাত আমদানি রফতানি চলিতেছে। ইহাতে পৃথিবীর ইতিহাসে সম্পূর্ণ একটা নূতন কাণ্ড ঘটিতেছে—তাহা এক দেশের উপর আর-এক দেশের রাজত্ব এবং

> সেই দুই দেশ সমুদ্রের দুই পারে। ··· এখন মুশকিল হইয়াছে জর্মনির। তার ঘুম ভাঙিতে বিলম্ব হইয়াছিল। সে ভোজের শেষ বেলায় হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া উপস্থিত। ক্ষুধা যথেষ্ট, মাছেরও গন্ধ পাইতেছে, অথচ কাঁটা ছাড়া আর বড়ো-কিছু বাকি নাই। এখন রাগে তাহার শরীর গস্‌গস্‌ করিতেছে। সে বলিতেছে, আমার জন্য যদি পাত পাড়া না হইয়া থাকে, আমি নিমন্ত্রণপত্রের অপেক্ষা করিব না। আমি গায়ের জোরে যার পাই তার পাত কাড়িয়া লইব।"

এখানে উল্লেখ্য, এই ছোট প্রবন্ধটি মহাযুদ্ধ-বিষয়ে সবুজপত্র-সম্পাদকের সম্পাদকীয়ের পাদপূরণ-হিসেবে লিখিত। প্রমথ চৌধুরী মশায় মন্তব্য করেছিলেন যে ফ্রান্স ও ব্রিটেনের সঙ্গে জার্মানীর এ যুদ্ধ হ'ল বৈশ্যশক্তির সঙ্গে ক্ষত্রিয়শক্তির যুদ্ধ। রবীন্দ্রনাথ নিপুণভাবে সংশোধন ক'রে বললেন, দুই-ই বৈশ্য এবং দুই-ই ক্ষাত্রশক্তিপুষ্ট। বলতে হবে, রবীন্দ্রনাথ কবি হয়েও বিস্ময়কর রাজনীতিক প্রজ্ঞার পরিচয় দিয়েছেন এবং তা এমনই সময়ে, যখন এদেশের চিন্তাশীলেরা এ নিয়ে মাথা ঘামাতেন না এবং স্বাদেশিকেরা ইংরেজের জয়লাভের সপক্ষে প্রার্থনাসভা করছিলেন, এমন কি গান্ধীজীও (অবশ্য স্বল্প পরে) সত্যনিষ্ঠ ভক্ত প্রজারূপে রাজার জয়ের জন্য ভারতীয় সৈন্যসংগ্রহের পরিশ্রমে দেহপাত করছিলেন। এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা লক্ষণীয়। এই যে ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রস্বার্থের বিষয় কবি উল্লেখ করলেন একেই তিনি স্বল্প পরবর্তী কাল থেকে Nationalism অর্থাৎ উগ্র-জাতিস্বার্থবাদ ব'লেও অভিহিত করেছেন। অথচ Nationalism-এর সাধারণ অর্থে ঐ ব্যাপারটি বোঝায় না। এই নিয়ে তখন এবং সাম্প্রতিকেও রবীন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসার সম্মুখীন হয়েছেন। তাঁর "Nationalism" ভাষণগুলি সম্পর্কে একটু পরেই আলোচনা করছি, কিন্তু আপাতত ঐ দুই দৃশ্যতঃ পৃথক্ ব্যাপারের মধ্যেকার কবি-অভিপ্রেত সামঞ্জস্য লক্ষ্য ক'রে নেওয়া যেতে পারে। আমাদের মনে হয়, রবীন্দ্রনাথ অর্থনীতি-রাজনীতির দিকে না গিয়ে য়ুরোপীয় সভ্যতার বিবর্তনের দিক থেকে ঐ নামকরণ পছন্দ করেছেন। তাঁর ধারণায় প্রাচ্যে এই একজাতিবাদ প্রশ্রয় পায় নি। বিরোধমূলক য়ুরোপীয় সভ্যতাতেই পেয়েছে। প্রাচ্যে, যেমন আমাদের দেশে, বাহিরের জাতি প্রবেশ ক'রেও একত্র মিলিত হয়ে পড়েছে। আর য়ুরোপে যেখানে একজাতিত্ব গড়ে ওঠার সম্ভাবনা বেশি ছিল, সেখানেই তারা বিভক্ত ও পৃথক্ হয়ে পড়েছে। এ বিষয় তাঁর 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতা' 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' 'ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা' প্রভৃতি কয়েকটি প্রবন্ধে এবং বিক্ষিপ্তভাবে পূর্বেকার নানা ভাষণে পরিস্ফুট হয়েছে। য়ুরোপীয় সভ্যতার মর্মমূলের এই বিরোধকে তাদের বিশিষ্ট ইতিহাসের নিয়মে উদ্ভূত জাতিস্বার্থগত বিরোধ ব'লে তিনি গ্রহণ

কবেছেন এবং সেই হিসেবেই বোধ হয় আধুনিক অর্থনীতি ও State-এর বিষয় বিবেচনা না ক'বে প্রবৃত্তি ও অভ্যাসের নৈতিক মূল ধ'রে তিনি Nationalism শব্দটিই পছন্দ করেছেন। ঐ "লডাইয়ের মূল" প্রবন্ধটির উপসংহাবেই আমরা দেখি, য়ুরোপীয় সভ্যতার প্রকৃতিকেই কবি এজন্য দায়ী করেছেন—

> "কিন্তু জর্মন পণ্ডিত যে তত্ত্ব আজ প্রচার কবিতেছে এবং যে তত্ত্ব আজ মদের মতো জর্মনিকে অন্যায় যুদ্ধে মাতাল কবিয়া তুলিল, তাহাব উৎপত্তি তো জর্মন পণ্ডিতের মগজেব মধ্যে নহে, বর্তমান য়ুরোপীয় সভ্যতার ইতিহাসের মধ্যে।"

যুবোপীয সভ্যতাব ইতিহাস এব' প্রাচ্য সভ্যতার ইতিহাস নির্ণয়ে, একটিকে বিরোধমূলক এবং অন্যটিকে মিলনমূলক ব'লে অভিহিত করার মধ্যে হয়তো-বা কবির ভাবদৃষ্টি অন্তর্দৃষ্টি কিছু পবিমাণে প্রভাব বিস্তাব করেছে এবং দেখা যায়, শান্তি-নিকেতনেব কযেকটি ভাষণে যেখানে অধ্যাত্মের সঙ্গে বাস্তবকে কবি সমন্বিত করছেন সেখানে এই যুদ্ধেব কারণ-নির্ণযে কবি উগ্র জাতিপ্রেমকেই দায়ী করেছেন। যেমন—

> "অনেক দিন থেকে আপনাব মধ্যে আপনাকে যে মানুষ কঠিন করে বদ্ধ কবেছে, আপনাব জাতীয অহমিকাকে প্রচণ্ড কবে তুলেছে, তাব সেই অবরুদ্ধতা আপনাকেই আপনি একদিন বিদীর্ণ কববেই করবে।"
>
> ('মা মা হিংসীঃ')

এবং

> "ইতিহাসেব ভিতব দিযে ইতিহাসেব দেবতা তাঁব পূজা গ্রহণ করবেন, এ যুদ্ধেব মধ্যে তাঁব সেই উৎসব। কোনো জাতি তার জাতীয় স্বার্থকে পুঞ্জীভূত কবে তাব জাতীয়তাকে সংকীর্ণ করে তুলবে—তা হবে না, ইতিহাসবিধাতার এই আদেশ। মানুষ সেই জাতীয় স্বার্থদানবের পাযে এতদিন ধ'বে নরবলির উদ্‌যোগ কবেছে, আজ তাই সেই অপদেবতাব মন্দির ভাঙবাব হুকুম হয়েছে।" ('আরো')

ঠিক এই কথা বুয়ব যুদ্ধেব পটভূমিতে লেখা নৈবেদ্যের কবিতাটির মধ্যেও রয়েছে—

জাতিপ্রেম নাম ধরি প্রচণ্ড অন্যায়
ধর্মেরে ভাসাতে চাহে বলের বন্যায়,

সুতরাং মনে করা যেতে পারে যে রাষ্ট্রযন্ত্র এবং ধনতান্ত্রিকতা-বিষয়ে অবহিত হয়েও কবি তাঁর বিশিষ্ট ইতিহাস-অধ্যয়ন-জনিত ভাবাসক্তিতে য়ুরোপীয় সভ্যতার মূলরূপকে সংক্ষেপে Nationalism ব'লে অভিহিত করেছেন। এইজন্য Nationalism-সম্বন্ধীয় ভাষণগুলির মধ্যে অনিবার্যভাবে ধন-রাষ্ট্র-সাম্রাজ্য-তান্ত্রিক য়ুরোপের ছবিই ফুটেছে।

ঐভাবে চিহ্নিত সভ্যতার বিস্তারের প্রতিরোধকল্পেই যেন নিজ সাহিত্যকলাদি শিক্ষার ক্ষেত্রে তাঁর বিশ্বভারতীর গঠন-মূলক আদর্শ প্রদর্শন ও প্রচার।

স্বদেশের প্রচলিত রাষ্ট্রসমাজচিন্তার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মেলেনি এবং সামাজিক স্বরাজের দৃষ্টান্ত প্রদর্শনে রবীন্দ্রনাথ যুদ্ধকালে ও যুদ্ধোত্তর পর্যায়ে তাঁর প্রয়াস শিথিল তো করেনই নাই, পরন্তু অধিকতর সাংগঠনিক ও বৈজ্ঞানিক রীতিতে কর্মপরিচালনার উদ্যোগ করেছেন। শিলাইদহ-কালীগ্রামে জমিদারির দায়িত্বভার হস্তান্তরিত করার সঙ্গে সঙ্গে, সুরুল-শ্রীনিকেতনে ঐ উদ্‌যোগ স্থানান্তরিত হয় এবং একটি সামগ্রিক দৃষ্টি নিয়েই গ্রামসংগঠন প্রারব্ধ হয়, যদিও অর্থাভাবে এবং দেশের কার্যকর সহানুভূতির অভাবে এর প্রসার ব্যাহত হয়েছে এবং তাই নিয়ে কবিকে শেষ দিন পর্যন্ত আক্ষেপ করতে হয়েছে, যেমন তাঁর উত্তরবঙ্গের উন্নয়নকার্য ব্যাহত হয়েছে ত্যাগী কর্মীর অভাবে। মনে করা যেতে পারে এই ভাবুক-কর্মীর আদর্শের দুটি দিক, শুদ্ধ স্বাদেশিকতা এবং আন্তর্জাতিকতা-মিশ্র স্বাদেশিকতা শেষ পর্যন্ত দুটি শাখায় আত্মবিস্তার চেয়েছিল—এরই ফল শ্রীনিকেতন এবং বিশ্বভারতী-শান্তিনিকেতন। দেখা যায়, মহাযুদ্ধের সময়েও শিলাইদহ-পরিসরে সংগঠনের কাজ যাতে পূর্ণোদ্যমে চলে তার জন্য তিনি ঐ অঞ্চলে পুনঃপুনঃ যাতায়াত করছেন, সাধারণ আয়-ব্যয়ের পরীক্ষা ক'রে, শিক্ষা-চিকিৎসা প্রভৃতি বিষয়ের সমাধান ও ঋণ থেকে দরিদ্র প্রজাদের পরিত্রাণের ব্যবস্থা পরীক্ষা ক'রে নোতুন ব্যবস্থা নির্ধারণ করছেন। এই সময়ে লেখা 'লোকহিত' প্রবন্ধে দেখা যায় স্বাদেশিকদের উচ্ছ্বাস-প্রণোদিত নাইট্‌স্কুল প্রভৃতি প্রয়াসের তিনি সমালোচনা করেছেন। বক্তব্য সেই আগেকার মৌলিক বিষয়—শিক্ষিতেরা অশিক্ষিত-অনুন্নতদের সঙ্গে একাত্ম না হ'লে, হিন্দু মুসলমানের সঙ্গে সামাজিকভাবে এক না হ'লে, উঁচু-নিচু পার্থক্য রেখে উপকার করার প্রয়াস ব্যর্থ হতে বাধ্য। তাঁর পরীক্ষিত ধারণা হ'ল—"কিন্তু ছোটোর উপকার করিতে গেলে কেবল বড়ো হইলে চলিবে না—ছোটো হইতে হইবে, ছোটোর সমান হইতে হইবে।" কারণ, "মানুষ কখনো যথার্থ হিতকে ভিক্ষারূপে গ্রহণ করিবে না, ঋণরূপেও না, কেবলমাত্র প্রাপ্য বলিয়াই গ্রহণ করিতে পারিবে।" একটি প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত দিয়ে তিনি দেখিয়ে দিলেন—

> "হিন্দু-মুসলমানের পার্থক্যটাকে আমাদের সমাজে আমরা এতই কুশ্রীভাবে বে-আব্রু করিয়া রাখিয়াছি যে কিছুকাল পূর্বে স্বদেশী অভিযানের দিনে একজন হিন্দু স্বদেশী-প্রচারক একগ্লাস জল খাইবেন বলিয়া তাঁহার মুসলমান সহযোগীকে দাওয়া হইতে নামিয়া যাইতে বলিতে কিছুমাত্র সংকোচ বোধ করেন নাই।"

এই প্রবন্ধে পরিষ্কারভাবে তিনি ভদ্রশ্রেণীচরিত্রের সুবিধাবাদী বিকৃতিকে তুলে ধরেছেন—

> "লোকসাধারণের সম্বন্ধেও আমাদের ভদ্রসম্প্রদায়ের ঠিক ঐ অবস্থা।

তাহাদিগকে সর্বপ্রকারে অপমানিত করা আমাদের চিরদিনের অভ্যাস। যদি নিজেদের হৃদয়ের দিকে তাকাই তবে এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, ভারতবর্ষকে আমরা ভদ্রলোকের ভারতবর্ষ বলিয়াই জানি। বাংলাদেশে নিম্নশ্রেণীর মধ্যে মুসলমানদের সংখ্যা যে বাড়িয়া গিয়াছে তাহার একমাত্র কারণ, হিন্দু ভদ্রসমাজ এই শ্রেণীয়দিগকে হৃদয়ের সহিত আপন বলিয়া টানিয়া রাখে নাই।"

কবির বক্তব্য, এই ধরনের ভাব অন্তরে পোষণ ক'রে নিজেদের গরজে নিম্নশ্রেণীর হিতসাধন করতে এলে, সে প্রয়াস ব্যর্থ হবে, ছদ্মবেশ উদ্‌ঘাটিত হতে বিলম্ব হবে না (এবং হয়ও নি)। কিন্তু স্বাদেশিকদের সমালোচনার উদ্দেশ্যে এই যে প্রবন্ধের পত্তন কবি করলেন, এতে নিগৃহীত শোষিত সমস্ত শ্রেণীর জন্যই তাঁর বেদনাকে উৎসারিত ক'রে দিলেন। কারণ, স্বদেশের কথা আলোচনা করতে গিয়ে ধনতান্ত্রিক বিশ্বের দুর্ভাগা শ্রমিকদের দিকেও তিনি দৃষ্টিনিক্ষেপ করেছেন এবং ব্যঞ্জনায় জানাতে চেয়েছেন যে য়ুরোপীয় পদ্ধতির অনুকরণে রাজনীতিক আন্দোলন এবং নকল দেশহিতের প্রয়াস ব্যর্থ হতে বাধ্য। এই আলোচনাতেও দেখা যায় তিনি য়ুরোপের রাষ্ট্রসহায় ধনতান্ত্রিকতার মূল ব্যাপারটি মোটামুটি ঠিকই ধরেছেন, যেমন—

"শক্তির ধারাটা এখন ক্ষত্রিয়কে ছাড়িয়া বৈশ্যের কূলে বহিতেছে। লোকসাধারণের কাঁধের উপরে তাহারা চাপিয়া বসিয়াছে। মানুষকে লইয়া তাহারা আপনার ব্যবসায়ের যন্ত্র বানাইতেছে। মানুষের পেটের জ্বালাই তাহাদের কলের স্টীম উৎপন্ন করে।····· কর্মপ্রণালী নামক প্রকাণ্ড একটা জাঁতা মানুষের আর সমস্তই গুঁড়া করিয়া দিয়া কেবল মজুরটুকু মাত্র বাকি রাখিবার চেষ্টা করিতেছে।· ধনের ধর্মই অসাম্য। জ্ঞান-ধর্ম-কলাসৌন্দর্য পাঁচজনের সঙ্গে ভাগ করিলে বাড়ে বৈ কমে না, কিন্তু ধন জিনিসটাকে পাঁচজনের কাছ হইতে শোষণ করিয়া লইয়া পাঁচজনের হাত হইতে তাহাকে রক্ষা না করিলে সে টেকে না। এই জন্য ধনকামী নিজের গরজে দারিদ্র্য সৃষ্টি করিয়া থাকে। তাই ধনের বৈষম্য লইয়া যখন সমাজে পার্থক্য ঘটে তখন ধনীর দল সেই পার্থক্যকে সমূলে ঘুচাইতে ইচ্ছা করে না, অথচ সেই পার্থক্যটা যখন বিপদজনক হইয়া উঠে তখন বিপদটাকে কোনো মতে ঠেকো দিয়া ঠেকাইয়া রাখিতে চায়।"

এই উক্তির শেষাংশে তিনি ধনতন্ত্রের করতলগত রাষ্ট্রের ভূমিকার বিষয় বললেন। যখন তিনি একথা লিখছেন তখন এদেশে ধনতন্ত্রের ভূমিকা পরোক্ষ, উপনিবেশগত। এরই মধ্যে তিনি কিন্তু ঠিক লক্ষ্য করেছেন যে বাংলার পাট বিদেশের বাজারে চড়া

দামে বিক্রী হওয়ার মূলে বাংলাব মাটি ততটা হেতু নয়, যতটা পাটচাষীদের হাড়ভাঙ্গা খাটুনি। যাই হোক, আত্মশক্তি ও সমূহ পুস্তিকায় সংগৃহীত পূর্বেকার প্রবন্ধে ও ভাষণে এ বিষয়ে পথনির্দেশ হিসেবে যা বলেছেন, এখানেও তাই বললেন,—শিক্ষার সার্বজনীন বিস্তার চাই। শিক্ষার ফলে প্রবুদ্ধ হয়ে অশিক্ষিত হিন্দু-মুসলমান স্বাধিকার দাবি করবে। স্থিতাবস্থা নম্রমুখে সহ্য করবে না, সেই শক্তিব সঞ্চারে যেমন তাদের তেমনি ভদ্রসমাজের অভিপ্রেত ফললাভ।

কবি ১৯১৬ খ্রীঃ গোড়ার দিকে জাপান ও আমেরিকা ভ্রমণেব উদ্দেশ্যে বেরিয়ে এবং বৎসরখানেক সেখানে কাটিয়ে ফিরে আসেন। এই ভ্রমণে কবিব উল্লেখযোগ্য বক্তৃতা হ'ল Nationalism পুস্তিকাব কয়েকটি প্রবন্ধ। এই প্রবন্ধগুলি পশ্চিমা যান্ত্রিক সভ্যতাব বিপক্ষে প্রতিবাদ। সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশতত্ত্ব, ধনতান্ত্রিক শোষণ প্রভৃতিব বিষয় এতে আভাসে ইঙ্গিতে আছে মাত্র, গৌণভাবেও নেই। রবীন্দ্রনাথেব ধাবণা ছিল, যুদ্ধেব পটভূমিকায যুরোপীয সভ্যতা, যাতে ব্যক্তিমানুষ এবং সামাজিক মানুষকে নিতান্ত অবহেলা কবা হযেছে, তাব বিভেদমূলক দোষত্রুটিগুলি দেখিয়ে দিলে সেগুলির সংশোধন হতেও পারে এবং প্রকারান্তবে প্রাচ্য সমাজমূলক সভ্যতাকে বিপৎকালে তাবা শ্রেয় ব'লে মনে ভাবতেও পাবে। কিন্তু ববীন্দ্রনাথ এবিষযে ভুল বুঝেছিলেন। চিবাচবিত সমাজনিহিত শান্ত ও নিশ্চেষ্ট প্রাচ্যকে শোষণ কবাব উপবেই যাদের স্থিতি তারা উপনিবেশগুলির সঙ্গে আদর্শানুপ্রাণিত ভাবেব সম্বন্ধে, আদান-প্রদানে মিলিত হবে এমন অবাস্তবতা-বিষয়ে কবিব বোধ নিশ্চয়ই জাগ্রৎ ছিল। তবু হয়ত যুদ্ধেব পটভূমি ব'লেই তিনি এই দুবাশা পোষণ ক'রে থাকবেন। আমেরিকায অর্থসংগ্রহ তাঁব বক্তৃতা-অভিযানেব একটা দিক হলেও তা নিতান্ত লঘু ব্যাপার, কারণ, জাপান-আমেবিকাকে তুষ্ট ক'রে কিছু বলতে তিনি চান নি। যদিও একথা ঠিক যে পশ্চিমেব কাছে নিতান্ত অপ্রিয় সত্য—বৈশ্যতন্ত্র-বশীভূত ক্ষাত্রধর্মেব নগ্ন প্রকাশেব বিষয তিনি উচ্চাবণ করেন নি। এ দিকটি তাঁব সম্যক আযত্তে নয, তা ছাড়া তিনি আদর্শ-ভাবুক কবি, অর্থনীতি-বাষ্ট্রনীতিবিৎ নন বলেই করেন নি। তাঁব বক্তৃতাগুলিকে মনুষ্যধর্মের বিকাশ, ব্যক্তির মূল্য, যান্ত্রিকতাব অমানবীয বিষময় ফল, এইসব আধা-আধ্যাত্মিক কথায় সমাচ্ছন্ন ক'রে পবিবেশন করেছিলেন। কিন্তু তিনি যাই করুন, জাপান এবং আমেরিকা দু'দেশ থেকেই তিনি রূঢ় সমালোচনা পেযেছিলেন এ-যাত্রায়, এবং চিত্তরঞ্জন দাশ প্রমুখ দেশের রাজনীতিকেরাও তাঁর Nationalism-এর যুবোপীয় সভ্যতা-গত তাত্ত্বিক অর্থ অনুধাবন না কবতে পেবে, যে-কোনো জাতীয়তাবাদেব বিরুদ্ধ উক্তি মনে ক'রে, নানাভাবে তাঁর সমালোচনায় প্রবৃত্ত হন।* তা ছাড়া

* 'ভারতে জাতীয়তা আন্তর্জাতিকতা ও রবীন্দ্রনাথ'—দ্রঃ

আমাদের স্বাদেশিকদেব দৃষ্টিতে জাপান এসিয়ার গৌববক্ষেত্র হিসেবে পরিগণিত ছিল। এজন্য জাপানের সমালোচনা স্বদেশের রাজনীতিকদের কাছে ভালো মনে হয় নি। যাই হোক, তাঁবা যদি মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য কবতেন তাহ'লে দেখতেন যে য়ুরোপীয় সভ্যতাব (তাঁব বিশিষ্ট ধারণার অনুগত সভ্যতার) অমানবীয় যান্ত্রিকতা ও লোভের ব্যবস্থাপনাব ক্ষাত্রশক্তিময় বীতি দ্বাবা চিহ্নিত দেশগুলিকেই সামূহিক ভাবে তিনি Nation বলছেন, এসিয়াব কোনো জাতি ও দেশকে নয়। তাঁব মতে এসিয়া হ'ল মানুষে-মানুষে ভাষায-ভাষায় জাতিতে-জাতিতে সামাজিক ঐক্যসূত্রে মিলনের দেশ, ধনপ্রাধান্যময় বিবোধ-কণ্টকিত নেশনেব দেশ নয়। আফ্রিকা এসিয়ার দেশগুলি স্বযং নেশন নয়, সেগুলি নেশনেব বাঁচা-বাড়ার উপকবণ-ভূমি। অর্থাৎ উপনিবেশ-বাদীদেব নেশন এবং উপনিবেশস্বার্থকে বাঁচিয়ে বাখাব বাণিজ্য ও ক্ষাত্রশক্তিময ব্যবস্থাপনাই ন্যাশনালিজ্‌ম্‌। 'Nationalism'এব প্রবন্ধাবলীব লক্ষ্য ঠিক আমাদেব দেশ নয, য়ুবোপ আমেবিকা এবং য়ুবোপেব শিষ্য জাপান। জাপান-যাত্রাব পথে তিনি বন্দবে বন্দবে বাণিজ্যেব প্রভূত আযোজন দেখে ধনতান্ত্রিকতাব জঠরে মানবতার গ্রাস লক্ষ্য ক'বে একই মন্তব্য করেছেন, আবার তৃতীযবার আমেবিকা গিয়েও তাই। এবই ফলে এবং যুদ্ধোত্তর ভারতে ধনতান্ত্রিকতা ও যান্ত্রিকতার প্রাবল্য লক্ষ্য ক'বে পবে তিনি মুক্তধাবা ও বক্তকববীতে নিজ অভিপ্রায জ্ঞাপন কবেছেন।

১৯১৭-১৮ খ্রীঃ শ্রীযুতা এ্যানি বেসাণ্ট স্বদেশী আন্দোলনে কার্যকব ভাবে প্রবেশ ক'রে হোমরুল লীগ সঙ্ঘ স্থাপন কবেন ও পরে কারারুদ্ধ হন। এই সময় কবি তাঁব বিখ্যাত গান "দেশ দেশ নন্দিত করি" বচনা কবেন এবং শ্রীযুতা বেসাণ্টেব অন্তবীণ হওযার উপলক্ষ্যে 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম' প্রবন্ধ লিখে ভাষণ দেন। একই সময়ে তখনকার ভারত-সচিব মণ্টেগু ভাবতীয়দেব অধিকতব স্বাধিকার দেওয়ার প্রস্তাব কবেন। গান্ধীজী তখন ভারতে, যুধ্যমান ইংবেজেব সপক্ষে সৈন্যসংগ্রহে ব্যস্ত, তখনও সত্যাগ্রহ আন্দোলনে নামেন নি। মণ্টেগু-প্রস্তাবিত স্বল্প স্বাধিকারে মডাবেটদল উল্লসিত হওযায় রবীন্দ্রনাথ তাঁর মনোভাব প্রকাশ কবলেন 'ছোটো ও বড়ো' এবং 'স্বাধিকাবপ্রমত্তঃ' এই দুটি প্রবন্ধে। গান্ধীজীর স্বাধীনতা-আন্দোলনে প্রত্যক্ষভাবে যোগদানের ফলে অসহযোগ ও চরকা প্রভৃতি বিষয়ে রবীন্দ্রনাথেব যে বিখ্যাত প্রতিক্রিয়া, তাব পূর্বেকার বাজনীতিক-সমাজনীতিক প্রবন্ধ এগুলি, এবং ভাবের দিক থেকে এগুলি পূর্বেকাব 'রাজাপ্রজা' এবং 'আত্মশক্তি' প্রভৃতির সঙ্গে একসূত্রে গাঁথা ব'লে মনে করা যায়। 'কর্তাব ইচ্ছায় কর্ম' একটি মোটামুটি বড় প্রবন্ধ। এর মধ্যে কবি আত্মকর্তৃত্ব বা স্বাধিকাব দাবি করেছেন, কাবণ, স্বাধিকার পেলে ভুল পথে চলতে চলতেও আমরা শক্তি অর্জন করব। কিন্তু পরকর্তৃত্বে চালিত ও পালিত হ'লে বিমূঢ়

নির্জীব অবস্থা আমাদের কোনোদিনই ঘুচবে না। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ রাষ্ট্রব্যবস্থার পরাধীনতার সঙ্গে আমাদের সনাতন পরাধীনতা, অর্থাৎ শাস্ত্র, প্রথা ও আচারের কর্তৃত্বের বিষয়ও স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন এবং বুঝিয়ে দিয়েছেন যে নিজের ঘরের অন্ধ-কর্তৃত্বের শাসনের অবসান না ঘটিয়ে কেবল রাষ্ট্রিক স্বাধিকারে লাভ হবে না। যেমন—

> "এই আত্মাভিমানে বাহিরের দিকে মুখ করিয়া বলিতেছি, রাষ্ট্রতন্ত্রের কর্তৃসভায় আমাদের আসন পাতা চাই, আবার সেই অভিমানেই ঘরের দিকে মুখ ফিরাইয়া হাঁকিয়া বলিতেছি 'খবরদার! ধর্মতন্ত্রে সমাজতন্ত্রে, এমন কি ব্যক্তিগত ব্যবহারে কর্তার হুকুম ছাড়া এক পা চলিবে না'—ইহাকেই বলি হিন্দুয়ানির পুনরুজ্জীবন। দেশাভিমানের তরফ হইতে আমাদের উপর হুকুম আসিল, আমাদের এক চোখ জাগিবে, আর এক চোখ ঘুমাইবে। এমন হুকুম তামিল করাই দায়।"

ফলতঃ মনে হয়, মণ্টেগু-প্রস্তাবিত শাসন-সংস্কারকে উপলক্ষ্য ক'রে রবীন্দ্রনাথ মুখ্যভাবে স্বাদেশিক এবং অন্যান্য শিক্ষিতদের হীন সুবিধাবাদী দৃষ্টিভঙ্গিরই সমালোচনা করেছেন, যেমন করেছেন পূর্বেকার আত্ম-সংগঠন বিষয়ক প্রবন্ধাবলীতে। তাঁর বলবার আসল কথা হ'ল—"গবর্ণমেণ্টের কাছ হইতেও আমরা বড়ো দাবিই করিব, কিন্তু নিজেদের কাছ হইতে আরো বড়ো দাবি করিতে হইবে, নহিলে অন্য দাবি টিকিবে না।" "সম্মুখে চলিবার প্রবলতম বাধা আমাদের পশ্চাতে।" যাঁরা 'হিন্দুধর্ম' 'হিন্দুধর্ম' ব'লে পরিবর্তনে বাধা দেয় তাদের বক্তব্যের অসারতা প্রতিপন্ন ক'রে দেখালেন যে তাঁরা ধর্মতন্ত্রকেই ধর্ম ব'লে মনে করছেন, যথার্থ হিন্দুধর্মে মানুষে মানুষে বিভেদের প্রাচীর তুলতে বলা হয়নি। হিন্দুয়ানির প্রথার দাসত্বকে রবীন্দ্রনাথ 'বুড়ির শাসন' বলেছেন এবং ঐ শাসন-মানা বিষয়ে তিনি এই প্রবন্ধে শুধু যুক্তি দেখিয়ে মৃদুভাবে আপত্তি জানিয়েছেন মাত্র। তিনি যদি এই প্রবন্ধেই আর একটু গভীরে যেতেন তাহ'লে দেখতেন সে এই বুড়িতন্ত্রের মধ্যে হিন্দুসমাজের উচ্চবর্ণ কর্তৃক নিম্নবর্ণের অর্থনীতিক শোষণও নিহিত রয়েছে, নতুবা, ধর্মতত্ত্ব-দর্শন-বিজ্ঞান আয়ত্ত ক'রেও, জ্ঞানে দ্রষ্টা হয়েও তাঁরা যে এই প্রথাসর্বস্ব ধর্মকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য উদগ্রীব হলেন এ অযৌক্তিকতা স্থায়ী হ'ত না। এ শুধু কু-সংস্কার নয়, সুবিধাবাদের দুর্মর সংস্কার, তাই এ যায় না, এবং মূল অর্থনীতিক কাঠামোর বিপর্যয় না ঘটলে এ চলবে। প্রবন্ধটির শেষে তিনি ইতিহাসবিধাতার কাছে "এ দুখ বহন করো মোর মন" প্রভৃতির মত শক্তির বর চেয়েছেন।

একদিকে এ্যানি বেসাণ্ট কর্তৃক উত্থাপিত আমাদের হোমরুলের দাবি, অন্যদিকে ভারতসচিব মণ্টেগু-প্রস্তাবিত শাসনকর্তৃত্বের সংস্কারে ভারতীয়দের নিতান্ত সীমিত

অধিকারপ্রাপ্তিতে মডারেটদলের উল্লাস, এর পটভূমিতে 'ছোটো ও বড়ো' প্রবন্ধেরও প্রকাশ। এতে রবীন্দ্রনাথ ইংল্যাণ্ডের কিছুসংখ্যক মহৎ-চরিত্র ইংরেজের সঙ্গে ভারতের আমলাতান্ত্রিক ও সৈন্যপুলিসসহায় ইংরেজের তুলনা করেছেন এবং আশাবাদীদের বেশি আশান্বিত না হওয়ার উপদেশ দিয়েছেন। কারণ, এই দ্বিতীয় শ্রেণীর ইংরেজ যাদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক অব্যবহিত প্রত্যক্ষ, তারা উপরের মহল থেকে পাওয়া স্বল্প বরলাভের ফলও আমাদের ভোগ করতে দেবে না। এরাই লেখকের মতে ছোটো ইংরেজ (তু° নীলদর্পণ—'এ সমিন্দিরে বেলাতের ছোটনোক')। এ প্রবন্ধে সাম্রাজ্যবাদ ও অর্থনীতিক শোষণ সম্বন্ধে তেমন কিছু কথা নেই। প্রসঙ্গক্রমে উগ্রপন্থার বিপক্ষতা অথচ বীরত্বের প্রতি উৎসাহবাক্য আছে। কোনো আদর্শে নয়, সহানুভূতি ও যুক্তিতে দাঁড়িয়ে, অন্ধ পুলিসী শাসনের নির্মম প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্তের সামনে দাঁড়িয়ে যে ক'রারের জন্য কবির স্বপ্ন-আশ্বাস-ভঙ্গ ঘটেছে তার মধ্যে একটি দৃষ্টান্ত এই প্রবন্ধে পাওয়া যাবে—"কিন্তু এক এক সময়ে এমন দুর্যোগ আসে যখন এই বাঙালির ছেলের মতো অত্যন্ত ভালোমানুষের কাছেও উচ্চতম সত্যের কথা অবজ্ঞাভাজন হইয়া উঠে।" পিতা-পিতৃব্য অন্তরীণ অবস্থায় মুমূর্ষু, সুতরাং সহায়সম্বলহীন আশ্রমের দুটি ছাত্রের মুখের দিকে তাকিয়ে কবি লিখেছেন—"ছেলেদুটির মুখে একটি শব্দ নাই, আমরাও কিছু বলি না—কিন্তু এই ছেলেরা যখন সামনে থাকে তখন ধৈর্যের কথা, প্রেমের কথা, নিত্যধর্মের প্রতি নিষ্ঠার কথা, সর্বমানবের ভগবানের প্রতি বিশ্বাসের কথা বলিতে আমার কুণ্ঠা হয়।" অতএব, কবির আমাদেরই মত রক্তমাংসের শরীর, অশরীরী আধ্যাত্মিকতার বাহক তিনি নন। প্রবন্ধটিতে ইংরেজের পুলিসী শাসনের তীব্র নিন্দা ক'রে এবং পরিণামে এর ব্যর্থতা দেখিয়ে আত্মশক্তিতে স্বায়ত্তশাসন অর্জন করার দুঃখ বরণ করতে বলা হয়েছে। 'স্বাধিকারপ্রমত্তঃ' প্রবন্ধটিতে প্রাকৃতিকশক্তিসহায় সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের স্বরূপ উন্মোচন ক'রে এর নৈতিক দুর্বলতার দিক দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে। কবি বলছেন, মহাযুদ্ধে য়ুরোপীয়দের আত্মিক শূন্যতা নগ্নভাবে প্রকাশ পেয়েছে। সুতরাং এদের কাছে স্বায়ত্তশাসন ভিক্ষা করার মত মূঢ়তা যেন আমাদের না হয়। আমরা আত্মশক্তিতে, পল্লী-সংগঠনের মধ্য দিয়ে জাগরিত শক্তিতেই এদের স্বার্থসম্বল, সুতরাং অন্তঃসারশূন্য শাসনের দর্পকে অতিক্রম করতে পারব। লক্ষণীয় এই যে, য়ুরোপীয় বণিকদের দানবলীলার কারণ হিসেবে এখানেও কবি Nationalismকে দেখেছেন—'ইহার কারণ, য়ুরোপীয়েরা স্বজাতিকেই সব চেয়ে সত্য বলিয়া মানিতে শিখিয়াছে।' আমরা পূর্বেই বলেছি যে Nationalism-এর কবি-অভিপ্রেত তত্ত্বটি তাঁর নৈতিক ও সামগ্রিক দৃষ্টির উপর নির্ভর ক'রে গ'ড়ে তোলা। এর মধ্যে ধনতন্ত্র,

সাম্রাজ্যতন্ত্র সবই মিলিত করা হয়েছে, অথচ জোর দেওয়া হয়েছে নৈতিকতার উপর। "স্বাধিকারপ্রমত্তঃ" প্রবন্ধটিকেও ঘিরে রয়েছে একটি নৈতিক আবহাওয়া। সেজন্য এটিকে ঠিক রাজনীতিক প্রবন্ধ বলাও যায় না। তবে উপসংহারের উক্তি—"ভিক্ষার ডাকে আমরা মানুষ হইব না। আমাদের পিতামহেরা অমরলোক হইতে আমাদের আহ্বান করিতেছেন, বলিতেছেন, তোমরা যে অমৃতের পুত্র এই কথা জানো এবং এই কথা জানাও, মৃত্যুছায়াচ্ছন্ন পৃথিবীকে এই সত্য দান করো যে, কোনো কর্মপ্রণালীতে নয়, রাষ্ট্রতন্ত্রে নয়, বাণিজ্যব্যবস্থায় নয়, যুদ্ধ-অস্ত্রের নিদারুণতায় নয়—তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি"—এ থেকে কিন্তু এমন সিদ্ধান্তে আসা চলে না যে—ইংরেজ যা করে করুক, আমরা গীতা-উপনিষদ্ আবৃত্তি করতে করতে অধ্যাত্ম-সম্পদে বলবান্ হয়ে তাদের আসলে ফাঁকি ধরিয়ে দেব। বরং রবীন্দ্রনাথের এই ধরনের নৈতিক উক্তির এই অর্থই সমীচীন যে পরম দুঃখের মধ্য দিয়ে ত্যাগ ও সংগঠনের ক্লেশ স্বীকার ক'রে আত্মশক্তিতেই আমরা বাস্তব স্বরাজের অধিকারী হব। অর্থাৎ এখানেও সেই স্বদেশী সমাজের আদর্শবাণী। রবীন্দ্রনাথ এই সব ক্ষেত্রে যদি ধর্মের কথা শুনিয়েও থাকেন, সে ধর্ম জীবনের পূর্ণাঙ্গ অভিব্যক্তি, সে ধর্ম আধুনিক বুদ্ধি-বিজ্ঞানকে অস্বীকার ক'রে নয়, শূন্য ঝুলি নিয়ে বৈরাগ্যসাধনও নয়। সবদিক দিয়ে বলিষ্ঠ হয়ে শিক্ষাদানে ও ভেদহীন সমাজকল্যাণে উৎসর্গীকৃত জীবন এবং সৌন্দর্য-সাহিত্য-দর্শনের দ্বারা সমৃদ্ধ উদার মুক্ত জীবনই তাঁর মতে অনন্তের সঙ্গে যুক্ত ধর্মের জীবন। এ বিষয়টি তাঁর শান্তিনিকেতন ভাষণমালা, মানুষের ধর্ম, শিক্ষা, আত্মপরিচয় প্রভৃতি পুস্তকে পুনঃপুনঃ নানাভাবে কথিত হয়েছে। এই সময়কার কবির সাহিত্যিক সৃষ্টি হ'ল 'পলাতকা'। সবুজপত্রের প্রেরণায় লেখা "স্ত্রীর পত্রে" নারীমুক্তিকল্পনার বিস্তৃত কাব্যরূপ।

এই দ্বিতীয় পর্যায়ে রবীন্দ্র-চিন্তার উল্লেখ্য প্রকাশ ঘটে নবীন স্বাদেশিকতার অভিঘাতে, গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ ও অসহযোগকে কেন্দ্র ক'রে। কিন্তু এই সময়ে তাঁর পূর্ণাঙ্গ সমবায় পদ্ধতির পরিকল্পনা এবং 'বিশ্বভারতী' গঠনের উদ্যোগও তাঁর প্রাদেশিক কর্ম ও চিন্তায় একান্ত লক্ষণীয় ব্যাপার। অসহযোগকে রবীন্দ্রনাথ গঠনমূলক পদ্ধতি নয় ব'লে যে সমালোচনা করবেন তার সম্ভাবনা তাঁর পল্লীসমাজ-পল্লীস্বরাজ-পরিকল্পনার মধ্যেই নিহিত ছিল। তাঁর তখনকার কার্যকর সমবায়প্রচেষ্টার সঙ্গে সমবায়-বিষয়ক তখনকার বিস্তৃত চিন্তার সংযোগ লক্ষণীয়। কিন্তু শিক্ষার আদর্শে বিশ্বভারতী তাঁর পূর্বেকার সংকীর্ণ জাতীয়তামূলক ব্রহ্মচর্য-বিদ্যালয় থেকে যথার্থই ভিন্নতর পরিকল্পনা, বৃহৎ মানবতাবোধের দ্বারা উদ্দীপিত। এই সময় মহাযুদ্ধ শেষ হয়ে এসেছে, যুদ্ধত্যাগী রুশজনগণের সোভিয়েট প্রতিষ্ঠিত হয়েছে (যদিও সাম্রাজ্যবাদী মহলে এটিকে

গুরুত্বপূর্ণ রাজনীতিক পরিবর্তন ব'লে স্বীকার ও প্রচার করা হয়নি, সুতরাং ভারতবর্ষেও তখনই এবিষয়ে কোনো প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়নি), পীস্ কনফারেন্স্এ সাম্রাজ্যবাদীদের বিশ্বভাগাভাগির চক্রান্ত চলছে এবং মণ্টেগু-চেমস্ফোর্ড মিলিত শাসন-সংস্কারের রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই রাজনীতিক আন্দোলনকে কঠোরভাবে দমন করার সুপারিশ বহন ক'রে রাওল্যাট্ কমিটির রিপোর্টও প্রকাশ পেয়েছে। এদেশে একহাতে বন্দুক তুলে ধরে অন্যহাতে মুষ্টিভিক্ষা দেওয়ার এই রীতিটি ("দক্ষিণহস্তে অন্যায়ের এবং বামহস্তে ছলনার অস্ত্র") কিছু পূর্ব থেকেই 'ছোটো ও বড়ো' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ সমালোচনা ক'রে রেখেছেন।

এই সময়কার উল্লেখযোগ্য রচনা 'বাতায়নিকের পত্র' নামে একত্র গ্রথিত পাঁচটি পত্রে সমকালীন য়ুরোপীয় পরিস্থিতি এবং শাসন-সংস্কার-অভিমুখী স্বাদেশিক পরিস্থিতির ছায়া পড়েছে। পত্রাকৃতি প্রবন্ধগুলি জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদের পূর্বে অথচ রাওল্যাট আইনের বিরুদ্ধে গান্ধীজীর আইন-অমান্য সংগ্রাম ও পাঞ্জাবে মার্শাল-ল' জারির পরে লেখা। প্রথম পত্রে য়ুরোপের অধার্মিক ক্ষাত্রশক্তির আস্ফালন এবং স্বদেশে তার অনুকরণকে নিন্দা করা হয়েছে, যেমন করা হয়েছিল 'পথ ও পাথেয়' প্রবন্ধে ১৯০৮ সালের গোড়ার দিকে। দ্বিতীয়ে সাম্রাজ্যবাদীদের মনস্তত্ত্ব (লোভ) বিচার ক'রে শান্তিসম্মেলন ও ভার্সাই সন্ধির ভাবী ব্যর্থতার ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। তৃতীয়ে নীতির দিক থেকে সাম্রাজ্যবাদীদের চরিত্র ও কর্মফলের বিচার করা হয়েছে এবং নৈতিকশক্তিতে বলশালী হয়ে স্বদেশবাসীদের ঐ ক্ষাত্রশক্তিকে উপেক্ষা করতে বলা হয়েছে। চতুর্থ পত্রে বাঙ্লা মঙ্গলকাব্যের শক্তিপূজার উদাহরণ দিয়ে য়ুরোপের শক্তিদৃপ্ত সাম্রাজ্যবাদীদের অনুকরণের দ্বারা ভারতবাসীকে নৈতিক পরাভব স্বীকার না করতে উপদেশ দেওয়া হয়েছে। পঞ্চম পত্রে সামন্ততান্ত্রিক বিধিব্যবস্থার কড়া পাহারায় শাসিত ভারতবর্ষে নিম্নবর্ণ ও মুসলমানের সামাজিক অপমানের বিষয় তুলে ধ'রে ইংরেজের কাছে স্বাধীনতা দাবি করার পূর্বে নির্যাতিত সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের লাঞ্ছনা দূর করার প্রয়োজন বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই পত্রটিই লেখকের বক্তব্যের দিক থেকে অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ এবং স্বদেশী সমাজের কাল থেকে আরম্ভ ক'রে শ্রীনিকেতনের পল্লী সংগঠন অধ্যায় পর্যন্ত বলতে গেলে এটিই রবীন্দ্রনাথের মুখ্য বক্তব্য। কালান্তরের 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম' 'সত্যের আহ্বান' 'সমস্যা' 'স্বরাজসাধন' প্রভৃতি প্রবন্ধগুলিরও মর্মকথা এই। প্রচলিত স্বাদেশিকতা বা গান্ধীজীর আন্দোলনের সমালোচনা যেন কতকটা উপলক্ষ্যেরই মত। পঞ্চম পত্রে রবীন্দ্রনাথ কৌশলে দেখালেন যে য়ুরোপীয় রাষ্ট্রিকতার মধ্যে দুর্বলের উপর প্রবলের যে অত্যাচার, ভারতের সমাজব্যবস্থার মধ্যেও তাই। একটি বিরাট শ্রেণীকে হীন অমানুষ ক'রে রাখার পাকা ব্যবস্থা আমরা করেছি

এবং তাদের স্বাধীনতার মর্যাদা না দিয়ে নিজেরা সেই মর্যাদা ভোগ করবার জন্যে বিদেশিদের কাছে জোরগলায় ভিক্ষে চাইছি। তাঁর মতে এরকম দাবিতে স্বাধীনতা পেলেও আমাদের অমর্যাদা। "আমরা দাসত্বের সমস্ত বিধি সমাজের মধ্যে বিচিত্র আকারে প্রবল ক'রে রাখব আর তোমরা তোমাদেব ঔদার্যের দ্বারা প্রভুত্বের সমান অধিকাব আমাদের হাতে নিজে তুলে দেবে।····· আর যদি আমাদেব দরবার মঞ্জুব হয়? যদি আমরা আমাদের দেশের লোককে প্রত্যহ অপমান করতে কুণ্ঠিত না হই, অথচ বিদেশের লোক এসে আপন ধর্মবুদ্ধিতে সেই অপমানিতদের সম্মানিত কবে, তাহলে ভিতরে বাহিরেই কি আমাদের পরাভব সম্পূর্ণ হয় না।"

আয়ার্ল্যাণ্ড-এর সমবায় ও কৃষি-উন্নতির প্রয়াসের দৃষ্টান্ত থেকে প্রেরণা পেযে ববীন্দ্রনাথ তাঁর স্বদেশী-সমাজ গঠনেব প্রাবম্ভেই এদেশেব দরিদ্র কৃষক-জীবনে সমবায়েব প্রয়োজন উপলব্ধি করেন এবং প্রবন্ধে ও চিঠিপত্রে সমবায়েব প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে তাঁব মতামত প্রকাশ কবতে থাকেন। খ্রীঃ ১৯০৬-৭ থেকে কুষ্টিয়া-শিলাইদহ-পতিসরে সমবায় পদ্ধতিতে চাষ নিযে পরীক্ষা চলে, যদিও সাফল্য ঘটেনি। কিন্তু পতিসরের সমবায় ব্যাঙ্কটি বেশ কিছুদিন চলেছিল এবং এতে ঋণভাবে সর্বস্বান্ত প্রজারা উপকারও পেয়েছিলেন এবং এব সাহায্যে পতিসব অঞ্চলের শিক্ষা, চিকিৎসা, রাস্তাঘাট, নির্মাণ প্রভৃতি বিষয়েও উপকাব পাওয়া গিয়েছিল। এই সময় ১৯০৫ এপ্রিল থেকে প্রকাশিত 'ভাণ্ডার' পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে গ্রামেব উন্নতি-বিষয়ে আলোচনারও আহ্বান কবি জানান। ১৯১৮ খ্রীঃ 'ভাণ্ডার' নামে অন্য একটি পত্রিকা সমবায-সংগঠন-সমিতি থেকে প্রকাশিত হয়। এতে প্রথম সংখ্যার জন্য রবীন্দ্রনাথ 'সমবায' ব'লে ছোট একটি প্রবন্ধ লেখেন। এই প্রবন্ধটিতে তিনি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ও মিলিতভাবে চাষবাস, গোপালন, দুগ্ধেব ব্যবসায়ে সমবায় পদ্ধতিতে উপকার প্রভৃতি সম্বন্ধে এবং সাধারণভাবে ধনসম্পদের বিকিরণ-বিষয়ে বললেন। কিন্তু এর কয়েকবৎসর পরে লেখা 'সমবায' নামেব দ্বিতীয় প্রবন্ধে স্পষ্টভাবে ধনেব উৎপাদন ও বণ্টনের লোকায়ত পদ্ধতির অনুমোদন করলেন। যদিও তিনি সোভিয়েট দেশে জোর ক'রে রাষ্ট্রশক্তি দখল ক'রে আর্থিক সাম্য আনার প্রয়াসের সমর্থন করলেন না। সম্ভবতঃ তখনও তিনি সোভিয়েট পরিস্থিতি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল ছিলেন না। হয়ত বা এ বিষয়ে যা প্রচাবিত হ'ত তাতেই তিনি আস্থা রেখেছিলেন। এই প্রবন্ধটিতে সমবায়ের মধ্যস্থতায় সমাজতন্ত্র-গঠনের বিষয় যদ্যপি পরিস্ফুটভাবে বলা হয়েছে, যেমন—"সাধারণের দারিদ্র্য হরণেব শক্তি ধনীর ধনে নেই। সে আছে সাধারণের শক্তির মধ্যেই।···কৃত্রিম উপায়ে ধনবণ্টন করে কোনো লাভ নেই। সত্য উপায়ে ধন উৎপাদন করা চাই"—তবু এ কথা ভেবে দেখা হয়নি যে ধন-উৎপাদনের যাবতীয় উপকরণ যদি রাষ্ট্ররক্ষিত মুষ্টিমেয়ের

হাতে আবদ্ধ থাকে তাহ'লে তা গায়ের জোরে আয়ত্ত না করলে দয়ার উপর কেউ ছেড়ে দেয় না। ক্রোড়পতি ভোগীরা ধার্মিকও নয়, নিতান্ত দুর্বলও নয়। অন্যত্র অবশ্য এই রবীন্দ্রনাথকেই বহুবার বলতে শুনেছি যে বঞ্চিত মানুষ নিতান্ত দুঃখেই বিপ্লবের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ আধুনিক ডেমোক্রেসি বা প্রজাতন্ত্রকেও এক ধরনের সমবায় ব'লে মনে করেছেন এবং লক্ষ্য করেছেন যে যুনাইটেড্ স্টেট্স এর ডেমোক্রেসি নামে মাত্র প্রজাতন্ত্র, সেখানকার রাষ্ট্রের চালক মুষ্টিমেয় ধনী—"কিন্তু যেখানে মূলধন ও মজুরির মধ্যে অত্যন্ত ভেদ আছে সেখানে ডেমোক্রাসি পদে পদে প্রতিহত হতে বাধ্য। কেননা সকল রকম প্রতাপের প্রধান বাহক হচ্ছে অর্থ। সেই অর্থ-অর্জনে যেখানে ভেদ আছে সেখানে রাজপ্রতাপ সকল প্রজার মধ্যে সমানভাবে প্রবাহিত হতেই পারেনা। তাই যুনাইটেড্ স্টেট্স্এ রাষ্ট্রচালনার মধ্যে ধনের শাসনের পরিচয় পদে পদে পাওয়া যায়। টাকার জোরে সেখানে লোকমত তৈরি হয়। টাকার দৌরাত্ম্যে সেখানে ধনীর স্বার্থের সর্বপ্রকার প্রতিকূলতা দলিত হয। একে জনসাধারণের স্বায়ত্তশাসন বলা চলে না" (সমবায় ২)। এর বছর আষ্টেক পরে রুশ দেশে গিয়ে স্বচক্ষে এরই বিপরীত ব্যাপার লক্ষ্য ক'রে কবিকে বিস্ময় প্রকাশ করতে হয়েছে—"এখানে এসে যেটা সব চেয়ে আমার চোখে ভালো লেগেছে সে হচ্ছে এই ধনগরিমার ইতরতার সম্পূর্ণ তিরোভাব। কেবলমাত্র এই কারণেই এ দেশে জনসাধারণের আত্মমর্যাদা এক মুহূর্তে অবারিত হয়েছে। চাষাভুষো সকলেই আজ অসম্মানের বোঝা ঝেড়ে ফেলে মাথা তুলে দাঁড়াতে পেরেছে। এইটে দেখে আমি যেমন বিস্মিত তেমনি আনন্দিত হয়েছি।" সমবায়ের অস্ত্রে এক এক স্থানে ধনের রাশীকরণের মূলোচ্ছেদ হতে পারে ঠিকই কিন্তু এর মধ্যে একটা 'যদি' আছে। তা হ'ল রাষ্ট্রের সহায়তা। প্রকৃত জনরাষ্ট্র না হ'লে কেবল গরীবদের সমবায় ধোপে টেকে না। এজন্য মনে হয রাশিয়ার চিঠিতে কবি যে বারংবার স্বদেশের অবস্থা সম্পর্কে বিলাপ করেছেন, তা অনেকেটাই অর্থহীন হয়ে পড়েছে, কারণ, আমাদের সার্বিক উন্নতিতে বিদেশী সরকার তো দায়বদ্ধ ছিল না। অবশ্য তাঁর স্বদেশী সমাজের সামগ্রিক প্রয়োগে বৈদেশিক শাসনের মধ্যেও সমবায়ের ক্ষেত্রে কিছুটা সুফল পাওয়া যেত তাতে আজকের দিনের ধনতান্ত্রিক বিকৃতি থেকে রক্ষা পাওয়া যেত এমন মনে করা যায়। কিন্তু কার্যকর সমবায়ের জন্য স্বায়ত্তশাসনের প্রয়োজনীয়তা যে রবীন্দ্র-দৃষ্টির অগোচর ছিল এমনও নয়। কারণ, "ভারতবর্ষে সমবায়ের বিশিষ্টতা" ভাষণে একজায়গায় তিনি বললেন "আমার পূর্ববর্তী বক্তা ডেন্‌মার্কের উল্লেখ করেছেন। কিন্তু একটি কথা তিনি ভুলেছেন। ভারতবর্ষের অবস্থা ও ডেন্‌মার্কের অবস্থা ঠিক সমান নয়। ডেন্‌মার্ক আজ ডেয়ারি ফার্মে যে উন্নতি করেছে তার মূল শুধু সমবায

নয়, সেখানকার গভর্মেণ্টের ইচ্ছায় ও চেষ্টায় dairy farm-এর উন্নতির জন্য প্রজাসাধারণের শিক্ষার ব্যাপক ব্যবস্থা হয়েছে। ডেন্‌মার্কের মতো স্বাধীন দেশেই সবকাবেব তরফ থেকে সাধারণকে এমন সাহায্য কবা সম্ভব।"

স্বদেশেব অবহেলিত সাধারণ জনের আর্থিক দুরবস্থায় চিন্তাক্লিষ্ট হয়ে রবীন্দ্রনাথ এর প্রতিকাবের যে সব উপায় নিজ অভিজ্ঞতা ও বুদ্ধি দিয়ে নিরূপণ করেছিলেন, সমবায় তার অন্যতম। এব জন্যে বিশ্বের অর্থনীতি বিষয়েও একটা পবিষ্কার ধাবণায় তাঁকে আসতে হয়েছিল। সে ধাবণা অর্থবিজ্ঞানীদেব মত গাণিতিক না হলেও সাধারণভাবে যে যথাযথ তা এই সমবায়-বিষযক প্রবন্ধগুলিব অনুসবণে ধবা যায়। বাশিয়ায় গিয়ে বলশেভিক বিপ্লব সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞান অর্জন কবাৰ পূর্বেই তিনি ধনতান্ত্রিক শ্রেণীশাসন এবং তাব ফলাফল বিষযে যে ধারণা করে নিযেছিলেন তাব পবিচয় Nationalism-এব বক্তৃতাগুলি, লডাইয়ের মূল, Organisation প্রভৃতি প্রবন্ধেব মত এখানেও রযেছে এবং আবও স্পষ্টভাবেই, যেমন—"এক কালে পণ্য-উৎপাদনেব শক্তি, তার উপকবণ ও তার মুনাফা ছিল অল্পপবিমিত, সুতবাং তাব দ্বাবা সমাজেব সামঞ্জস্য নষ্ট হতে পাবেনি। কিন্তু এখন ধন জিনিসটা সমাজেব অন্য সকল সম্পদকেই ছাডিযে গিযে এমন একটা বিপুল অসাম্য সৃষ্টি কবেছে যাতে সমাজের প্রাণ পীড়িত, মানবপ্রকৃতি অভিভূত হয়ে পডেছে। ধন আজ যেন মানবশক্তির সীমা লঙ্ঘন ক'রে দানবশক্তি হয়ে দাঁড়ালো, মনুষ্যত্বেব বড়ো বড়ো দাবি তার কাছে হীনবল হয়েছে। যন্ত্রসহায় পুঞ্জীভূত ধন আব সাধাবণ মানুষের স্বাভাবিক শক্তিব মধ্যে এমন অতিশয় অসামঞ্জস্য যে, সাধাবণ মানুষকে পদে পদে হার মানতে হচ্ছে। এই অসামঞ্জস্যেব সুযোগটা যাদের পক্ষে তাবাই অপব পক্ষকে একেবারে অন্তিম মাত্রা পর্যন্ত দলন কবে নিজের অতিপুষ্টি সাধন কবে এবং ক্রমশই স্ফীত হয়ে উঠে সমাজদেহেব ভাবসামঞ্জস্যকে নষ্ট কবতে থাকে।

সমাজেব ভিত্তিই হচ্ছে সামঞ্জস্য। তাই যখনই সেই সামঞ্জস্য নষ্ট হয়ে এমন সকল রিপু প্রবল হয়—এমন-সকল ব্যবস্থা-বিপর্যয় ঘটে যা সমাজবিরুদ্ধ, যাতে ক'রে অল্প লোকে বহুলোকেব সংস্থানকে নষ্ট করে, তাদেব সকলকে আপন ব্যক্তিগত ঐশ্বর্যবৃদ্ধির উপায়রূপে ব্যবহার কবতে থাকে, তখন হয় সমাজ সেই অত্যাচাবে জীর্ণ হয়ে বহু লোকেব দুঃখ ও দাস্য-ভাবে আধমরা হয়ে থাকে, নয় তার আত্মবক্ষার প্রবৃত্তি বিদ্রোহী হয়ে ওঠে।" (ভারতবর্ষে সমবায়ের বিশিষ্টতা)

রবীন্দ্রনাথ এখানে শ্রেণীস্বার্থ এবং সংঘাতকে ইতিহাস-অনুগত দৃষ্টিতে দেখছেন, এবং ভারতবর্ষের মত দেশে হয়ত ধনতন্ত্রের অগ্রসর পদধ্বনিও শুনতে পেয়েছেন, কিন্তু অন্ততঃ স্বদেশের দিকে লক্ষ্য ক'রেই তিনি দেখেছেন যে এখানে ক্ষয়িত সামন্ততান্ত্রিক পরিস্থিতিরই জঘন্য বিকৃতি, তারই বহুশাখান্বিত শোষণ, অত্যাচার ও মিথ্যাচারের

কদর্য নগ্নমূর্তি। এরই ফলে কৃষকের দুরবস্থা, উন্নত-অনুন্নত জাতিবর্ণ-বিভেদ এবং ধর্মকেন্দ্রিক হিন্দুমুসলমান বিরোধ। ধনতন্ত্রের অজগর-গ্রাস ভারতের সাম্প্রতিক চরিত্র এবং চিরাচরিত সামন্ততান্ত্রিক বিকৃতির সঙ্গে নব-উদ্গত ধনতান্ত্রিকতার বিমিশ্রণে এখনকার এক অদ্ভুত জটিল পরিস্থিতি। কালান্তরের 'বাতায়নিকের পত্র' 'সমস্যা' প্রমুখ কয়েকটি প্রবন্ধে সামন্ততান্ত্রিক জনপীডন সম্বন্ধেই রবীন্দ্রনাথ বিশেষভাবে সচেতন হয়েছেন, 'আত্মশক্তি' 'রাজা-প্রজা' 'সঞ্চয়' 'পরিচয়ের' মধ্যেও তাই। সমবায়-প্রসঙ্গে দেখা যায় তিনি দু'দিকেই গুরুত্ব দিচ্ছেন, আর 'রাশিয়ার চিঠি' ও 'পল্লীপ্রকৃতি'র ভাষণাবলীতে আধুনিক অর্থনীতিক শোষণ-ব্যবস্থার দিকেই বিশেষ-ভাবে। 'মুক্তধারা' নাটকে সামন্ততান্ত্রিকতার সঙ্গে আধুনিক যান্ত্রিকতার বিমিশ্রণ—তাঁর উগ্রজাতীয়তাবাদের তত্ত্ব বা "প্রকাণ্ড ব্যূহবদ্ধ অহংকার ও স্বার্থপরতার চর্চা" এবং রক্তকরবীতে মুনাফালোভী মালিক ও শ্রমিকের দ্বন্দ্বসংঘাত, যার নিরসন করতে হ'ল, কবির স্বপ্নে, মালিককেই। কিন্তু 'ভারতবর্ষে সমবায়ের বিশিষ্টতা' প্রবন্ধ দেখা যাক। অর্থসম্পদের বশ্যতায় শুধু যে আধুনিক মুনাফালোভীই শ্রমিককে বঞ্চিত করছে তাই নয়, যে-দেশে ক্ষয়িত সামন্ততান্ত্রিক প্রথার আধিপত্য প্রবল সেই দেশেও এই শোষণ নানাভাবে চলছে। সমাজবাদী রবীন্দ্রনাথ পশ্চিমের ব্যাপার লক্ষ্য ক'রে স্বদেশের বিশেষ অবস্থার দিকটি চিহ্নিত করলেন এই ব'লে—

> "সামাজিক দিকে মানুষ ধর্মকে স্বীকার করেছে, কিন্তু আর্থিক দিকে করেনি। অর্থের উৎপাদন অধিকার ও ভোগ সম্বন্ধে মানুষ নিজেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বলেই জানে। এইখানেই সে আপন অহমিকা, আপন আত্মম্ভরিতাকে ক্ষুণ্ণ করতে অনিচ্ছুক……এই নিয়ে যখন আমরা বিপ্লবোন্মত্ত ভাব ধারণ করি তখন সাধারণত ধনিক ও শ্রমিকদের সম্বন্ধ নিয়েই উত্তেজনা প্রকাশ করি। কিন্তু অন্য ব্যবসায়ীদের সম্বন্ধেও একথা সম্পূর্ণ খাটে, অনেক সময়ে সে কথা ভুলে যাই। একজন আইনজীবী হয়তো একখানা দলিল মাত্র পড়ে কিম্বা আদালতে দাঁড়িয়ে গরিব মক্কেলের কাছে পাঁচ-সাত শো, হাজার দুহাজার টাকা দাবি করেন, সেখানে তাঁরা অন্যপক্ষের অজ্ঞতা-অক্ষমতার ট্যাক্‌সো যথাসম্ভব শুষে আদায় করে নেন। কারখানার মালিক ধনিকেরাও ঠিক তাই করেন। পরস্পরের পেটের দায়ের অসাম্যের উপরেই তাঁদের শোষণের জোর। আমাদের দেশে কন্যাপক্ষের কাছে বরপক্ষ অসংগত পরিমাণে পণ দাবি করে, তার কারণ, বিবাহ করার অবশ্যকৃত্যতা সম্বন্ধে কন্যা ও বরের অবস্থার অসাম্য। কন্যার বিবাহ করতেই হবে, বরের না করলেও চলে, এই অসাম্যের উপর চাপ দিয়েই এক পক্ষ অন্য পক্ষের উপর দণ্ড দাবি করতে

বাধা পায় না। এস্থলে ধর্মোপদেশ দিলে ফল হয় না, পরস্পরের ভিতরকার অসাম্য দূর করাই প্রকৃষ্ট পন্থা।" (ভারতবর্ষে সমবায়ের বিশিষ্টতা)

কয়েক বৎসর পূর্বে লেখা 'লোকহিত' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ আমাদের দেশের শিক্ষিত-ভদ্র এবং অশিক্ষিত-অভদ্র এই নিদারুণ শ্রেণীবৈষম্যেব দিকে আমাদের সচেতন করতে গিয়ে এদেশেব ধারাবাহিক সামন্ত-তান্ত্রিক শোষণের বিষযেই আলোকপাত করেছেন, যেমন,

"আমাদের ভদ্রসমাজ আবামে আছে, কেননা, আমাদের লোকসাধাবণ নিজেকে বোঝে নাই। এই জন্যই জমিদার তাহাদিগকে মারিতেছে, মহাজন তাহাদিগকে ধবিতেছে, মনিব তাহাদিগকে গালি দিতেছে, পুলিশ তাহাদিগকে শুষিতেছে, গুরুঠাকুব তাহাদেব মাথায় হাত বুলাইতেছে, মোক্তার তাহাদেব গাঁট কাটিতেছে, আর তাহাবা কেবল সেই অদৃষ্টের নামে নালিশ কবিতেছে যাহাব নামে সমন-জাবি করিবার জো নাই। আমবা বড় জোর ধর্মের দোহাই দিয়া জমিদাবকে বলি 'তোমাব কর্তব্য করো', মহাজনকে বলি 'তোমাব সুদ কমাও', পুলিসকে বলি 'তুমি অন্যায কবিও না'—এমন কবিয়া নিতান্ত দুর্বলভাবে কতদিন কত দিক ঠেকাইব। চালুনিতে করিয়া জল আনাইব আর বাহককে বলিব 'যতটা পাবো তোমার হাত দিয়ে ছিদ্র সামলাও'—সে হয় না, তাহাতে কোনো এক সময়ে এক মুহূর্তেব কাজ চলে, কিন্তু চিবকালেব এ ব্যবস্থা নয়।"

তাহ'লে প্রতিকারের কোন্ ব্যবস্থার নির্দেশ ববীন্দ্রনাথ দিচ্ছেন? সে হ'ল তাঁব বহুচিন্তিত শিক্ষা-সংগঠন-মূলক জনশক্তিব উদ্বোধন। বিদেশীদেব হাতে এটা সম্ভব নয় ব'লে তাঁব স্বদেশী সমাজেব প্ল্যান। তবে লক্ষণীয এই যে ১৯০৭-৮ এব কর্ম-উদ্‌যোগেব মধ্যে তাঁর এ চিন্তা ছিল না যে "ধর্মোপদেশে ফল হয় না। অসাম্য দূব কবাই প্রকৃষ্ট পন্থা।" অভিজ্ঞতায তিনি বুঝেছেন যে সংঘাত ববণ করে নিয়েই অসাম্য দূর কবতে হবে।

ঠিক একালে অর্থনীতিক সমবায়ের সঙ্গে তাঁব আন্তর্জাতিক বিদ্যাসমবায়েরও পরিকল্পনা এবং বিশ্বভারতীব মধ্য দিয়ে এ বিষযে কার্যকর পদক্ষেপ। আমরা শিক্ষার দিক থেকে এ বিষয়টিকে প্রগতিমূলক ব'লে মনে কবেছি দুটি কারণে। এক, তিনি তাঁর কতকটা রক্ষণশীল পূর্বেকার জাতীয়তাবাদী আশ্রম-বিদ্যালয় থেকে সরে এলেন এবং দুই, বাজনীতিক জাতীয় জাগরণের মধ্যে যুরোপীয় বীতিব জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার যে বিরুদ্ধতা চলছিল তার প্রতিবাদ ক'রে দেশীয় বিদ্যাচর্চাব সঙ্গে যুবোপীয় আধুনিক বিদ্যাব সমন্বয়েব উপকার দেখিয়ে দিলেন। স্বদেশী আন্দোলনে নেমে গান্ধীজী ইংরেজি শিক্ষা, বিজ্ঞান-চর্চা, আধুনিক চিকিৎসা প্রভৃতির বিরুদ্ধতাই প্রকাশ করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথেব বিজ্ঞানের উপর শ্রদ্ধা যথেষ্ট ছিল। এবং তিনি যন্ত্রসহায় কৃষিকর্ম এবং শিল্পায়নের প্রবল সমর্থক ছিলেন। কেবল মানুষের উপব যন্ত্রের প্রভুত্ব বা যন্ত্র-মুনাফা-সম্বল মুষ্টিমেয় ব্যক্তির প্রভুত্বের বিরোধী ছিলেন। যেমন, তিনি মানবিকতারূপ মুক্ত ধর্ম চাইতেন, কিন্তু নিষ্ঠুব প্রথামূলক বা প্রথাব ছদ্মবেশে শোষণমূলক ধর্মতন্ত্র চাইতেন না। যাই হোক, প্রচলিত বীতির শিক্ষাব বিরুদ্ধে এদেশে ববীন্দ্রনাথই প্রথম সোচ্চারকণ্ঠ সমালোচক। এর পূর্বে গোখ্‌লে জাতিবৃত্তিনির্বিশেষে অবহেলিত নিম্নশ্রেণীর মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষাব বিস্তাব চেয়েছিলেন। ববীন্দ্রনাথ জনশিক্ষা তো চেয়েছিলেনই, তার উপর শিক্ষার সহজ স্বাভাবিক রীতি প্রবর্তনে উদ্যোগী হযেছিলেন এবং সর্বক্ষেত্রে মাতৃভাষাকেই শিক্ষাব বাহন কবতে চেয়েছিলেন। বক্ষণশীলদেব কোনো সংকীর্ণতা শিক্ষার ব্যাপ্তি রুদ্ধ না কবে, সে দিকে দৃষ্টি দিয়েই তিনি বিদ্যার ক্ষেত্রে পূর্ব-পশ্চিমকে মেলাতে চেয়েছিলেন। এরই সঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের অনুরূপে, ধনদৃপ্ত বিজ্ঞানদৃপ্ত বস্তুসম্বল যুরোপ প্রাচীন ভারতীয় আদর্শে নীতিতে আস্থাবান হোক, কবির এমন অভিলাষও থাকতে পাবে। 'পূর্ব ও পশ্চিম' 'শিক্ষার মিলন' প্রভৃতি প্রবন্ধ থেকে এবিষয বোঝা যায়।

স্বাদেশিক সংগ্রামে সত্যাগ্রহেব বর্ম নিয়ে গান্ধীজীর পদক্ষেপ এবং অপ্রত্যাশিত-ভাবে নূতন পথে সংগ্রাম-পরিচালনে ববীন্দ্র-চিত্তের প্রতিক্রিয়া তাঁর সূক্ষ্মবিচাব ও দূরদৃষ্টিকে উদ্বোধিত করেছে। গান্ধীজীর ব্যক্তিত্ব এবং মোটামুটি দেশবাসীব উপব তাঁর প্রবল প্রভাবের ব্যাপাবটি জেনেও গান্ধীজীব সত্যাগ্রহ, অসহযোগ এবং চবকা-খদ্দর বিষয়ে তাঁব অনন্নুমোদন তিনি যুক্তিসহকারে উপস্থাপিত কবতে দ্বিধা করেননি। গান্ধীজীব ব্যক্তিগত তপস্যা এবং নীতিগত অস্পৃশ্যতা-বর্জন আন্দোলনেব জন্য রবীন্দ্রনাথের তাঁব উপব যদ্যপি আন্তবিক শ্রদ্ধা ছিল, তবু তাঁর কর্মনীতি রবীন্দ্রনাথ প্রায় স্বীকার করেননি বললেই চলে এবং স্থানে স্থানে তাঁব সমালোচনা বেশ কঠোরই হয়েছে বলতে হবে। রবীন্দ্রনাথেব এই সমালোচন তাঁব স্বাধীনচিত্ততা এবং প্রগতিবাদিতারই পরিচায়ক। সেই ১৯০৫-৬ এর তেরো-চোদ্দ বৎসব পর আন্দোলনের নূতন পরিস্থিতিতে রবীন্দ্রনাথ যেভাবে সাড়া দিয়েছেন তাতে তাঁর অন্তরের গভীর স্বাদেশিকতাও প্রমাণ কবে। একালকার প্রবন্ধাবলী প্রধানতঃ 'কালান্তর' গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে এবং বলা যায় যে এই প্রবন্ধগুলির বিষয় ও প্রকরণে পনেবো কুড়ি বছর আগেকার 'আত্মশক্তি' 'রাজা-প্রজা' প্রভৃতির বক্তব্য অনুস্যূত থাকলেও এরকম বিদ্যুতীশক্তিসম্পন্ন প্রখর রচনা পূর্বে বিরল। বলা যেতে পারে এই নূতন আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথের প্রগতিমূলক দেশাত্মবোধ আহত হয়েছিল ব'লেই কর্তব্য-অনুরোধে তিনি এর পরিমাপ করতে বিলম্ব করলেন না। তাঁর সমালোচনার মধ্যে গান্ধীবাদের প্রতি

আক্রমণ থাকলেও, নিছক বিরুদ্ধতাব জন্যই তিনি অসহযোগ-চরকাব প্রতিবাদ কবেননি। গঠনমূলক ও সামগ্রিক দৃষ্টিকোণের পটভূমিতেই তিনি ধর্ম-রাজনীতি-বিমিশ্রণমূলক অভিনব প্রস্তাব অযৌক্তিকতা দেখিয়েছেন এবং সর্বত্র জাতির মৌলিক ত্রুটির দিকেই রাজনীতিকদের মনোযোগ আকর্ষণ কবতে চেয়েছেন। একটিমাত্র কথায় তাঁর বক্তব্যেব সাবসংক্ষেপ কবলে বলতে হয়—"সম্মুখে চলিবাব প্রবলতম বাধা আমাদের পশ্চাতে" এবং ঐ হিন্দু-মুসলমান সামাজিক বিভেদ এবং হিন্দুব মধ্যেকার জাতিবর্ণ-ভেদ বিলুপ্ত না হ'লে একজাতি-একপ্রাণ মনোভাবও গডবে না, আন্দোলনও ফলপ্রসূ হবে না। অন্যপক্ষে গান্ধীজীব ব্যক্তিগত ত্যাগ-তপস্যার উপর কবির শ্রদ্ধা যথেষ্ট ছিল, তাঁর অস্পৃশ্যতা-বিরোধী আন্দোলনেব মহত্ত্বেব দিক সম্বন্ধেও তিনি অবহিত ছিলেন। চরকা-কাটা খদ্দর-পরাকে ববীন্দ্রনাথ সংকীর্ণক্ষেত্রের জাতীযতা, অন্ধসংস্কার ও বুদ্ধিমনের যান্ত্রিকতা ব'লে অভিহিত করেছেন আব অসহযোগেব মধ্যে গঠনমূলক কিছুই দেখেননি। কিন্তু ধর্ম ও অহিংসা-সত্যেব উপব ববীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধা থাকলেও বাজনীতিব সঙ্গে ধর্মেব মিশ্রণেব অথবা ধর্মকে তার প্রকৃত ভূমি থেকে সরিয়ে এনে বাজনৈতিক লাভের ক্ষেত্রে প্রয়োগ কবার ফলাফলকে ববীন্দ্রনাথ সন্দেহেব চোখেই দেখেছিলেন। এবিষয়ে Bengalee পত্রিকায় প্রকাশিত এবং ববীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার উদ্ধৃত একটি চিঠি কবির মনোভাব স্পষ্ট করেই বুঝিযে দেয—

I believe in the efficacy of Ahimsa as a means of overcoming the congregated might of physical force on which the political powers of all countries mainly rest. But like every other moral principle Ahimsa has to spring from the depth of mind and it must not be forced upon man from some outside appeal of urgent need. The great personalities of the world have preached love, forgiveness and non-violence, primarily for the sake of spiritual perfection and not for the attainment of some immediate success in politics or similar department of life. They were aware of the difficulty of their teaching being realised within a fixed period of time in a sudden and wholesale manner by men whose previous course of life had chiefly pursued the path of self. No doubt through a strong compulsion of desire for some external result, men are capable of repressing their habitual inclinations for a

limited time, but when it concerns an immense multitude of men of different traditions and stages of culture, and when the object for which such repression is exercised needs a prolonged period of struggle, complex in character, I cannot think it possible of attainment."

রবীন্দ্রনাথেব এই চিঠি ববদৌলিতে অসহযোগ ঘোষণাব পর এবং চৌরিচৌবা গ্রামের ক্রুদ্ধ জনতার পুলিসের উপব নির্মম প্রতিশোধ গ্রহণের পূর্বে লেখা। এর পূর্বে রবীন্দ্রনাথ ১৯১৯ থেকে প্রায তিন বছর সত্যাগ্রহ বা আইন-অমান্যের ধাবা লক্ষ্য করেছেন, বাওলাট আইনের বিরুদ্ধে গান্ধীজীর প্রথম আন্দোলনের ডাক, বিক্ষুব্ধ জনতাব প্রতিশোধস্পৃহা, জালিয়ানওয়ালাব গণহত্যা, ১৯২০-২১ এব সর্বাত্মক অসহযোগেব সঙ্গে খিলাফত আন্দোলনেব সহযোগ সবই দেশ অথবা বিদেশ থেকে লক্ষ্য করেছেন। এমন কি জালিযানওয়ালাব হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে 'স্যব' উপাধি ত্যাগ ক'বে রাজনীতির সঙ্গে প্রায জড়িযেও পড়েছেন। আবার ইংলণ্ড-আমেরিকা ঘুবে দেশে ফিবে এসে (১৯২১) অসহযোগেব শক্তি এবং অন্তর্নিহিত দুর্বলতা দুইই পূর্ণভাবে হৃদয়ংগম করেছেন এবং ভাবতবর্ষে প্রায় এককভাবেই (দীনবন্ধু Andrews-কে বাদ দিলে) এই অভিনব আন্দোলনেব সমালোচনার দাযিত্ব গ্রহণ কবেছেন। লক্ষণীয এই যে, যে-ববীন্দ্রনাথ ১৯২০-২১ এব অসহযোগের সঙ্গে প্রবর্তিত চবকা, বয়কট প্রভৃতিকে সমর্থন করলেন না তিনিই ১৯১৯ এব রাওলাট এ্যাক্টের প্রতিবাদে প্রবর্তিত গান্ধীজীর অহিংস প্রতিবোধকে একটি চিঠিতে সতর্কতামিশ্র উৎসাহ জানিয়েছিলেন। আবও দেখা যায়, ঐ নিষ্ক্রিয প্রতিবোধ সংগ্রামে ডাক দেওয়ার পব আমেদাবাদ ও পাঞ্জাবেব স্থানে স্থানে ক্রুদ্ধজনতাব হিংসাত্মক কার্যকলাপে বিক্ষুব্ধ হয়ে গান্ধীজী 'মহাভুল করেছি' ব'লে যখন আন্দোলন প্রত্যাহার ঘোষণা করলেন, এবং এর জন্যে গান্ধীজীর বিপক্ষে রূঢ় সমালোচনাও সোচ্চার হয়ে উঠল, তখন রবীন্দ্রনাথই একমাত্র ব্যক্তি যিনি গান্ধীজীর সিদ্ধান্তে পূর্ণ আস্থা জানিয়ে এনড্রুজের মধ্যস্থতায় তাঁকে পুনরায় উৎসাহিত করলেন। অথচ নাগপুর কংগ্রেস অধিবেশনের পর চরকা-বয়কট সহ পূর্ণ অসহযোগের প্রবর্তন করা হলে রবীন্দ্রনাথ এর প্রতিবাদে প্রবৃত্ত হলেন। তাহ'লে কি এই মনে করতে হবে যে কাপুরুষোচিত হত্যাকাণ্ডের বীরোচিত প্রতিবাদ রবীন্দ্রনাথ নির্দ্বিধায় সমর্থন করেন কিন্তু অসহযোগ সামগ্রিকভাবে ইংরেজ জাতি এবং আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানেব বিরুদ্ধে সংকীর্ণ জাতীয়তা নিয়ে আসতে পারে ব'লে এই বিক্ষোভ, বিশেষতঃ তিনি যখন শিক্ষার ক্ষেত্রে সর্ববিদ্যাসমন্বয় এবং সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সর্বজাতিসমন্বয়ের ভাবাদর্শ তাঁর অন্তরের মধ্যে গ'ড়ে তুলছিলেন তখন? অথবা এককথায় যাবতীয়

পোলিটিক্যাল আন্দোলন সম্পর্কে তাঁব ঘোব অনাস্থা ছিল ব'লে? হিসেবে দেখা যায়, অসহযোগের মূল সংগ্রামী-আদর্শের বিরুদ্ধে নয়, কয়েকটি সংলগ্ন ব্যাপার নিয়েই তাঁব প্রতিবাদ। সেগুলি হ'ল—(১) খিলাফৎ আন্দোলনকে আশ্রয় ক'রে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যসাধনের প্রয়াস, (২) বিলাতি পণ্য বয়কট ও বিলাতিবস্ত্র দাহ এবং (৩) চরকাকাটার বাধ্যবাধকতা। কালান্তবের বিখ্যাত 'হিন্দু মুসলমান' 'চরকা' 'সত্যের আহ্বান' প্রভৃতি প্রবন্ধগুলিতে এই তিনটি বিষয় নিয়েই তিনি আলোচনা করেছেন।

এই প্রসঙ্গে মনে বাখতে হবে যে স্বাধীনতাব 'লাভ' নয়, 'অর্জন'কেই তিনি মূল্য দিতে চেয়েছিলেন এবং এবিষযে তাঁর পবিকল্পিত গ্রামসংগঠনমূলক স্ববাজ লাভের পন্থায় তিনি সন্দেহাতীত ছিলেন ব'লেই রাজনীতিক আন্দোলনকে সমর্থন করা তাঁব পক্ষে সম্ভব হয়নি, যেমন হযনি ১৯০৬-৭এব বয়কট বা উগ্রপন্থাব কার্যাবলীকেও। আরও লক্ষণীয এই যে রবীন্দ্রনাথ এবং গান্ধীজী উভয়েবই পার্শ্ববর্তী, নিরপেক্ষ অথচ মানব-প্রেমিক ও ভাবতপ্রেমিক এনড্রুজ ও এই স্বদেশী আন্দোলনেব কযেকটি দুর্বলতাব দিকে গান্ধীজীব দৃষ্টি আকর্ষণ কবেছিলেন। যেমন—খিলাফৎ, বযকট এবং নিপীড়িত নিম্নবর্ণেব প্রতি ঔদাসীন্য। খিলাফৎ সমস্যার উপব গান্ধীজী পুনঃপুনঃ জোব দিচ্ছেন দেখে Andrews প্রতিবাদে লিখছেন—"I hate the khilafat doctrine of a Turkish Empire which was too sacred to be touched and involved the refusal of independendce to another race······Will you or will you not accept Arab and Armenian and Syrian independence in lands which are obviously theirs and not of the Turks?" ববীন্দ্রনাথ বিষযটিকে এইভাবে না দেখে গান্ধীজীব অন্তর্নিহিত অভিপ্রায় যে এই পথে সফল হতে পারে না তা বুঝিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু দীনবন্ধুব স্পষ্টোক্তি হ'ল—"I am out against 'Empire' altogether and to agree to the khilafat demand for an Ottoman Empire would surely cut the ground under the Indian demand for independence." স্বদেশী আন্দোলনের অন্য একটি দুর্বলতার দিক যা পরে ইংরেজ-প্রদত্ত Communal Award রূপে মহাত্মাজীকে আঘাত করেছে বিস্ময়করভাবে দীনবন্ধু সেবিষয়েও তাঁর দৃষ্টি-আকর্ষণ এইভাবে করেছিলেন—"We must honestly, fairly and squarely face the non-Brahamin movement and all that it implies······This kind of thing appears to me every whit as bad as the religion of the 'white race' which is being proclaimed in Africa today. Congress, so far as I am aware, is still in the hands of the high Castes." এ সমালোচনা রবীন্দ্রনাথেরও,

কারণ, তিনি পুনঃ পুনঃ এই কথাই বলতে চেয়েছেন যে আমরা আমাদের দেশের অশিক্ষিত নিম্নশ্রেণী ও মুসলমানদেব যে স্বাধীনতা দিতে চাই না, সেই স্বাধীনতা আমবা বিদেশীর কাছে অযৌক্তিকভাবে দাবি কবছি। তবু নিরপেক্ষ অথচ অন্যায়-অসহিষ্ণু দীনবন্ধু খুব সোজাসুজি এবং স্পষ্টভাবেই বিষয়টি উপস্থাপিত কবেছিলেন।* কিন্তু এবিষয়ে বোধহয় গান্ধীজীরও তেমন কিছু করাব ছিল না। কারণ, আমাদের স্বাদেশিক আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে জডিত এ আন্দোলন শিক্ষিতদের আন্দোলন। আধুনিক পরিভাষায় যাকে বলা হয় সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বুর্জোয়া অভ্যুত্থান। যে-অভ্যুত্থান, যে-মানসমুক্তি রামমোহন থেকে আরম্ভ ক'রে বাংলায় সাংস্কৃতিক বিপ্লবরূপে দেখা দিযেছিল, যাকে ভুল ক'রে কেউ কেউ বেনেসাঁস ব'লে অভিহিত কবেছেন। কৃষক শ্রমিকদেব নিয়ে আন্দোলনে নামতে গেলে ববীন্দ্রনাথেব গ্রামসংগঠনেব আদর্শ পুরোপুরি গ্রহণ করতে হত। সম্ভবতঃ সেবকম আন্দোলন দুরূহ এবং দীর্ঘকাল-সাপেক্ষ ব'লে গৃহীত হয়নি। গান্ধীজী অস্পৃশ্যতা-নিবাবণ এবং হরিজন উন্নযনেব মধ্য দিয়ে এ দায়িত্ব পালন কবতে চেয়েছিলেন, কিন্তু খুবই আংশিকভাবে সাফল্য লাভ করেছিলেন। তবু স্বদেশী আন্দোলনেব এই অভিনব রূপটি সূক্ষ্ম বিচাবে যে-পরিমাণেই সমালোচনার যোগ্য হোক না কেন, একথা স্বীকার করতেই হবে যে এই উপায়েই গান্ধীজী অভূতপূর্ব জনজাগরণ সম্ভব করেছিলেন এবং স্বাধীনতা আন্দোলনেব ইতিহাসে এইটিই তাঁব মহত্তম দান। দেশের অর্থনীতি, সমাজ, হিন্দু-মুসলমান সমস্যাব তাত্ত্বিক বিচারে সমাধান খুঁজে তাবপব আন্দোলনে প্রবৃত্ত হতে গেলে এই ভাবাত্মক মোটামুটি ঐক্যও হযত সম্ভবপব হত না। তা ছাড়া দেখতে হবে, বিদেশীর অপসাবণ না ঘটলে হিন্দু মুসলিম, সমবায়, কৃষি-শিল্পেব উন্নতি সম্ভবপর নয়, গান্ধীজী ও দেশবন্ধুব এই ধরনের বাস্তবমুখী ববীন্দ্র-প্রত্যালোচনাব যাথার্থ্যও অস্বীকাব কবার নয়। তবু রবীন্দ্রনাথের প্রস্তাবিত সাংগঠনিক পূর্ণোদ্যমেব মধ্যে অন্ততঃ যুক্তির দিক থেকে তখনকার এমন কি এখনকারও প্রগতির মূলসূত্র নিহিত বযেছে, এ বিষয়টি তুলে ধবাই আমাদের বর্তমান শ্রমের উদ্দেশ্য। এবং একথা কে না স্বীকাব করবে যে আজকের প্রগতিমূলক উন্নয়ন-পরিকল্পনার অবসরে যে সব স্বার্থপবতা ও দুর্নীতিপরায়ণতার চিহ্ন দেখা যাচ্ছে, স্বাদেশিক ভাব-প্লাবনে স্তিমিত হয়ে যে চাবিত্রিক বদ্ধমূল পাপ জাতীয় উন্নতিকে ব্যাহত কবছে তা ঐ দুরূহ সাংগঠনিক আদর্শেই নির্মূল হতে পারত। এখন অসহযোগ আন্দোলনের অভিঘাতে উচ্চারিত রবীন্দ্র-বক্তব্যগুলি লক্ষ্য করা যাক।

* দীনবন্ধুর উল্লিখিত বিষয় দুটি তুলে ধরার দিক থেকে "জাতীয়তা, আন্তর্জাতিকতা ও রবীন্দ্রনাথে"র লেখক শ্রীযুক্ত নেপাল মজুমদারের কাছে আমরা ঋণী।

'সত্যের আহ্বান' প্রবন্ধটি সদ্য-আবির্ভূত অসহযোগ বিষয়ে রবীন্দ্রচিত্তের প্রতিক্রিয়ার একটি সামগ্রিক ও সুলিখিত পরিচয়। য়ুরোপ থেকে ফিরে এসে আন্দোলনের যে প্রত্যক্ষ মূর্তি তিনি দেখলেন তাতে ক'রে এর মূলে দেশের প্রতি একটা ফাঁকি রয়েছে ব'লে তিনি অনুভব করলেন। দেশের অর্থনীতি, সমাজতত্ত্ব, পল্লীর দরিদ্রদের অবস্থা—এসব অধ্যয়ন ক'রে গঠনমূলক কর্মে আত্মনিয়োগ না ক'রে শুধু বিদেশীর অস্তিত্বের উপর যে-কোনো একটা ইস্যু খাড়া ক'রে প্রতিবাদমূলক এবং বুদ্ধিবিচার-ভিত্তিহীন প্রতিরোধ আন্দোলন করা তাঁর মতে ঠিক স্বাদেশিকতা নয়। তা ছাড়া চরকায় সুতো কাটা এবং বিলাতিবস্ত্র-দাহ তাঁর মতে বুদ্ধি ও বৈজ্ঞানিক যুক্তির সাহায্যে করা হচ্ছে না। এতে অন্ধ অভ্যাস এবং যান্ত্রিক আজ্ঞানুবর্তিতার ভাব প্রধান হয়ে এই যুক্তিহীন শাস্ত্র-মানার দেশে নোতুন ধরনের অন্ধতার সৃষ্টি করছে। এরকম অসহিষ্ণু প্রতিরোধ আন্দোলনে জাতির সামগ্রিক শক্তির প্রকাশ নেই। পরিশেষে তিনি মনে করেছেন যে বিশ্বের সমাজ-জীবনে ও রাষ্ট্রে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান যে-সব পরিবর্তন ও নূতনতর দৃষ্টিকোণের জন্ম দিচ্ছে তার সঙ্গে এ ধরনের আন্দোলনের কোনো সমধর্মিতা নেই। লক্ষণীয় এই যে, প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজীর ত্যাগ ও প্রেমের মহিমা কীর্তন ক'রেও তাঁর চরকা ও বয়কটের নির্দেশকে যুক্তিহীন হুকুম ব'লে এবং এই ধরনের আন্দোলনকে প্রগতিচিহ্নহীন ব'লে সাব্যস্ত করেছেন। রবীন্দ্রনাথের এই মতামত প্রকাশিত হ'লে গান্ধীজী Young India পত্রিকায় কবিকৃত সমালোচনার প্রত্যুত্তর দেওয়ার প্রয়াস করেছিলেন। কিন্তু, গান্ধীজীর পথনির্দেশ ঠিক অথবা রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা ঠিক এই নিয়ে বিচার-বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত না হয়ে আমাদের শুধু এই লক্ষ্য করলেই চলবে যে, মহাত্মাজীর ব্যক্তিগত চারিত্র্যের প্রভাবকে অভিনন্দিত ক'রেও তাঁর কর্মপন্থাকে দেশকে পিছিয়ে নিয়ে যাওয়ার পন্থা ব'লে সমালোচনা করার মূলে সমালোচকের যে মানসিকতা বর্তমান তাতে তাঁর প্রগতিশীল মুক্তবুদ্ধিরই স্বাক্ষর পাওয়া যাচ্ছে। এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ চরকা ও বিলাতিবস্ত্র-বয়কটের বাস্তব অর্থনীতিক ভিত্তির প্রসঙ্গও তুলেছেন, আদর্শগত আধ্যাত্মিক প্রতিবাদেই ক্ষান্ত থাকেন নি। এর পরে লেখা 'চরকা' 'স্বরাজসাধন' প্রভৃতি প্রবন্ধেও কবির এই প্রশংসনীয় বাস্তব ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিই তাঁকে আবেগপ্রবণ স্বাদেশিকদের থেকে পৃথক্ ক'রে তুলেছে। রবীন্দ্রনাথ চরকার ও বিলাতিবস্ত্রবর্জনের সম্ভাব্য অর্থনীতিক সুবিধা বিষয়ে সংশয়কুণ্ঠিত আপত্তি এইভাবে প্রকাশ করেছেন—"একটি কথা উঠেছে এই যে, ভারতে শতকরা আশিজন লোক চাষ করে এবং তারা বছরে ছয়মাস বেকার থাকে, তাদের সুতো কাটতে উৎসাহিত করবার জন্যে কিছুকাল সকল ভদ্রলোকেরই চরকা ধরা। প্রথম আবশ্যক হচ্ছে যথোচিত উপায়ে তথ্যানুসন্ধান দ্বারা

এই কথাটি প্রতিপন্ন করা। অর্থাৎ কী পরিমাণ চাষা কতদিন পরিমাণ বেকার থাকে। যখন চাষ বন্ধ তখন চাষাবা কোনো উপায়ে যে-পবিমাণ জীবিকা অর্জন করে সূতা কাটাব দ্বারা তার চেয়ে বেশি অর্জন কববে কি না। চাষ ব্যতিরেকে জীবিকার একটিমাত্র উপায়েব দ্বারা সমস্ত কৃষাণকে বদ্ধ করা দেশের কল্যাণের পক্ষে উচিত কি না, সে সম্বন্ধেও সন্দেহ আছে। কিন্তু মূল কথা এই যে, কারো মুখের কথায় কোনো অনুমানমাত্রের উপর নির্ভর ক'রে আমরা সার্বজনীন কোনো পন্থা অবলম্বন কবতে পারব না, আমবা বিশ্বাসযোগ্য প্রণালীতে তথ্যানুসন্ধান দাবি কবি।……কাপড পোডাতে আমি বাজি আছি, কিন্তু কোনো উক্তিব তাড়নায় নয়। বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিবা যথেষ্ট সময নিযে যথোচিত উপায়ে প্রমাণ সংগ্রহ করুন এবং সুযুক্তি দ্বারা আমাদের বুঝিয়ে দিন যে, কাপড পবা সম্বন্ধে আমাদেব দেশ অর্থনৈতিক যে অপবাধ কবেছে অর্থনৈতিক কোন্ ব্যবস্থার দ্বাবা তাব প্রতিকাব হতে পাবে। বিনা প্রমাণে বিনা যুক্তিতে কেমন ক'বে নিশ্চিত বলব যে, বিশেষ একটা কাপড প'বে আমবা আর্থিক যে অপবাধ কবেছি কাপডটাকে পুডিয়ে সেই অপবাধেব মূলটাকে আরো বিস্তৃত ক'বে দিচ্ছি নে, ম্যাঞ্চেস্টাবের ফাঁস তাতে পবিণামে ও পবিমাণে আরো কঠিন হযে উঠবে না! এ তর্ক আমি বিশেষজ্ঞভাবে উত্থাপিত করছি নে, কেননা আমি বিশেষজ্ঞ নই, আমি জিজ্ঞাসুভাবেই কবছি। বিশেষজ্ঞ যা বলেন তাই যে বেদবাক্য আমি তা বলিনে। কিন্তু সুবিধা এই যে বেদবাক্যের ছন্দে তাঁবা কথা বলেন না। প্রকাশ্য সভায় তাঁবা আমাদেব বুদ্ধিকে আহ্বান কবেন।" অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ বৈজ্ঞানিক যুক্তি-পরিচালিত গঠনমূলক আন্দোলন চান। বিলাতি পণ্য বর্জন অপেক্ষা তিনি যে স্বদেশী উদ্যোগে বস্ত্র নির্মাণ চান এবং চবকাব চেযে মিলে কাটা সুতো এবং মিলে বোনা বস্ত্রশিল্পেব প্রসাব চান তার পবিচয় অন্যত্রও নানান্ স্থানে ছডিয়ে রয়েছে। আর তাঁর অভিমতে এই ধবনের স্বদেশী উদ্‌যোগ সমবাযেব ভিত্তিতেই সার্থক হতে পারে। 'চরকা' প্রবন্ধে এই সমবাযেব দিকেই তিনি স্বাদেশিকদেব মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। 'সত্যের আহ্বানে' তিনি সেন্টিমেণ্ট বা অতিপ্রাকৃত কোনো 'বাণী'র উপর আস্থা স্থাপন না ক'রে বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি এবং যুক্তির উপর নির্ভর করতে স্বাদেশিকদের আহ্বান জানিয়েছেন। গান্ধীজীর ত্যাগ, তপস্যা, মানবপ্রীতির উপর ভক্তি ন্যস্ত ক'রেও তাঁর পদ্ধতির তীব্র প্রতিবাদ কবতে বিরত হন নি। যেমন—"দেশেব চিত্ত-প্রতিষ্ঠিত এই স্বরাজকে অল্পকাল কয়েকদিন চরকা কেটে আমরা পাব, এর যুক্তি কোথায়? যুক্তির পরিবর্তে উক্তি তো কোনমতেই চলবে না। মানুষের মুখে যদি আমবা দৈববাণী আরম্ভ কবি, তাহলে আমাদের দেশে যে হাজার বকমের মারাত্মক উপসর্গ আছে এই দৈববাণী যে তারই মধ্যে অন্যতম এবং প্রবলতম হয়ে উঠবে।‥কাপড় ব্যবহার

বা বর্জন ব্যাপারে অর্থশাস্ত্রিক তত্ত্বের ঘনিষ্ঠ যোগ আছে, এ সম্বন্ধে সেই তত্ত্বেব ভাষাতেই দেশের সঙ্গে কথা কইতে হবে, বুদ্ধির ভাষা মান্য করা যদি বহুদিন থেকে দেশেব অভ্যাসবিরুদ্ধ হয়, তবে আর সব ছেড়ে দিয়ে ঐ অনভ্যাসেব সঙ্গেই লড়াই কবতে হবে। কেন না এই অনভ্যাসই আমাদেব পক্ষে গোড়ায গলদ, original sin। সেই গলদটারই খাতিরে, সেই গলদকেই প্রশ্রয দিয়ে আজ ঘোষণা কবা হযেছে, 'বিদেশী কাপড অপবিত্র, অতএব তাকে দগ্ধ কবো।' অর্থশাস্ত্রকে বহিষ্কৃত কবে তাব জায়গায ধর্মশাস্ত্রকে জোর করে টেনে আনা হল।·· যে কলেব দৌবাত্ম্যে সমস্ত পৃথিবী পীড়িত মহাত্মাজী সেই কলেব সঙ্গে লড়াই কবতে চান এখানে আমবা তাঁব দলে। কিন্তু, যে মন্ত্রমুগ্ধ অন্ধ বাধ্যতা আমাদের দেশেব সকল দৈন্য ও অপমানেব মূলে, তাকে সহায ক'বে এ লড়াই কবতে পারব না।" 'সত্যের আহ্বান' প্রবন্ধে কবি একটি নূতন কথাও বলেছেন, সে হ'ল এখানকার স্বাধীনতা-আন্দোলনের সঙ্গে বিশ্বেব যোগ স্থাপন কবাব কথা, পৃথিবীব অন্যান্য নিপীড়িত অথচ স্বাধীনতাকামী মানুষেব আন্দোলনের সঙ্গে সামিল হওযাব কথা। প্রথম মহাযুদ্ধেব পটভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট দেখলেন, এখন এক জাতি থেকে অন্যজাতি পৃথক থাকতে পাববে না। বিশেষতঃ বিশ্বেব পবাধীন জাতিগুলি সাম্রাজ্যবাদী শোষণ থেকে মুক্তির জন্য সমভাবাপন্ন হয়ে পাবস্পরিক যোগাযোগ বক্ষা করতে বাধ্য হবে। যুদ্ধোত্তর যুরোপ ভ্রমণে তিনি বোমাঁ বোলাঁ প্রমুখ এমন বহু মনীষীব পরিচয় পেলেন যাঁবা সাম্রাজ্যবাদ-বিবোধী এবং নির্যাতিত মানুষের মুক্তিব সহায। ফলে তিনি স্বাদেশিকদেব আন্তর্জাতিক বিশ্বেব দিকে দৃষ্টি ফেরাবাব উপদেশ দিলেন। বলা বাহুল্য, বিভিন্ন কারণে ববীন্দ্রনাথেব এরকম উপদেশের মূল্যায়নে মহাত্মাজী, চিত্তরঞ্জন প্রমুখ স্বাদেশিকেবা কেউই তেমন আগ্রহশীল ছিলেন না। বেশ কিছুকাল পবে পণ্ডিত নেহরুর দৃষ্টি এ বিষযে আকৃষ্ট হলেও এবং ভিন্নপথে নেতাজী আন্তর্জাতিক সহায়তাব জন্য অগ্রসর হলেও এখানকার স্বদেশী আন্দোলনের চরিত্র সম্পূর্ণ এখানকারই ছিল। সংকীর্ণ জাতীয়তা থেকে মুক্ত, এদেশের আধুনিকতম প্রগতি-পথিক রবীন্দ্রনাথ বিশ্লেষণপূর্বক দেখালেন—"একটি মহাযুদ্ধেব তূর্যধ্বনিতে আজ যুগারম্ভেব দ্বার খুলেছে।···কিছুকাল থেকে পৃথিবীতে মানুষ যে পরস্পর কিরকম ঘনিষ্ঠ হয়ে এসেছে সে কথাটা স্পষ্ট হওয়া সত্ত্বেও অজ্ঞাত ছিল।··যুদ্ধের আঘাতে এক মুহূর্তে সমস্ত পৃথিবীর মানুষ যখন বিচলিত হযে উঠল, তখন এই কথাটা আব লুকানো রইল না। হঠাৎ একদিনে আধুনিক সভ্যতা অর্থাৎ পাশ্চাত্য সভ্যতার ভিত কেঁপে উঠল। বোঝা গেল, এই কেঁপে ওঠার কারণটা স্থানিক নয এবং ক্ষণিক নয়—এর কারণ সমস্ত পৃথিবী জুড়ে। মানুষের সঙ্গে মানুষের যে সম্বন্ধ এক মহাদেশ থেকে আর এক মহাদেশে ব্যাপ্ত, তার মধ্যে সত্যের সামঞ্জস্য যতক্ষণ

না ঘটবে ততক্ষণ এই কারণের নিবৃত্তি হবে না। এখন থেকে যে-কোনো জাত নিজের দেশকে একান্ত স্বতন্ত্র ক'রে দেখবে, বর্তমান যুগের সঙ্গে তার বিরোধ ঘটবে, সে কিছুতেই শান্তি পাবে না। এখন থেকে প্রত্যেক দেশকে নিজের জন্যে যে চিন্তা করতে হবে তার সে চিন্তার ক্ষেত্র হবে জগৎজোড়া।...ভাবী যুগের একটা প্রেরণা এসেছে মানুষকে সংযুক্ত করার জন্য। যে বুদ্ধি সকলকে সংযুক্ত করে সেই হচ্ছে শুভবুদ্ধি। এই যে 'লীগ অফ্ নেশনস্' প্রতিষ্ঠা বা ভারতশাসন-সংস্কার, এসব হচ্ছে ভাবী যুগ সম্বন্ধে পশ্চিমদেশের বাণী। এ বাণী সত্যকে যদি বা সম্পূর্ণ প্রকাশ না করে এর চেষ্টা হচ্ছে সেই সত্যের অভিমুখে।...সমস্ত বিশ্বের সঙ্গে যোগযুক্ত ভারতের বিরাট রূপ চোখে না পড়াতে আমাদের কর্মে ও চিন্তায় ভারতের যে পরিচয় দিতে আমরা প্রবৃত্ত হয়েছি সে অতি ছোটো, তার দীপ্তি নেই, সে আমাদের ব্যবসায় বুদ্ধিকেই প্রধান করে তুলছে। এই বুদ্ধি কখনো কোনো বড়ো জিনিসকে সৃষ্টি করেনি।"

এই 'সত্যের আহ্বান' এবং তার কয়েকদিন পূর্বে লেখা 'শিক্ষার মিলন' (আগস্ট, ১৯২১) প্রবন্ধ দুটিতে সদ্য: পশ্চিম-প্রত্যাবৃত্ত রবীন্দ্রনাথ আধুনিক বিজ্ঞানমূলক পাশ্চাত্ত্য বিদ্যার সারস্বত দিকটিকে যে ভাবে অভিনন্দিত করলেন, ধর্ম এবং প্রথানুসরণের গোঁড়ামি ত্যাগ ক'রে পশ্চিমের জ্ঞান-বিজ্ঞান-যন্ত্রশিল্পকে আয়ত্ত ক'রে জাতীয় সংকীর্ণতা-মুক্তির আহ্বান যেভাবে জানালেন তাতে তিনি গান্ধীজীর সঙ্গে অন্যান্য স্বাদেশিকদের সমালোচনার পাত্র হ'লেন। কেউ কেউ এমনও মনে করলেন যে রবীন্দ্রনাথ প্রকারান্তরে সাম্রাজ্যবাদীদের পক্ষ অবলম্বন করেছেন, য়ুরোপের প্রশংসা ক'রে তিনি আন্তর্জাতিক মানুষ হিসেবে পরিচিত হতে চান, তিনি জাতীয়তা-বিরোধী। "শিক্ষার মিলন" প্রবন্ধের প্রতিবাদে কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র সোজাসুজি "শিক্ষার বিরোধ" প্রবন্ধ পাঠ ক'রে রবীন্দ্রনাথের জাতীয়তা-বিরোধের প্রতিবাদ জানালেন। কিন্তু তিনি এ বিষয়টি লক্ষ্য করতে ভুলে গেলেন যে তিনি সেই সব কথাতেই রবীন্দ্রনাথের প্রতিবাদ করলেন যা রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন, কিছু পূর্বে তাঁর স্বাদেশিকতা ও ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধের মুহূর্তগুলিতে। স্বদেশ, রাজা-প্রজা প্রভৃতির প্রবন্ধগুলিতে রাষ্ট্রিকতা ও শক্তির দম্ভসম্বল ইংরেজ তথা য়ুরোপীয় সমাজের অধর্মাচরণের বিষয়টি পুনঃ পুনঃ তুলে ধরা হয়েছে। এমন কি দুচার বৎসর আগেকার চিন্তাতেও য়ুরোপ ও ভারতবর্ষের তুলনামূলক আলোচনায় য়ুরোপীয় রাষ্ট্রস্বার্থময় সভ্যতার কাছে আমাদের পাবার তেমন কিছু নেই অথবা কিছু পেতে গেলে খুবই সাবধানতার সঙ্গে নিতে হবে, এমন কথা জোর দিয়েই কবি বলেছেন, যেমন—

"আমাদের নিজেদের ব্যথা হইতে বুঝিতে পারি, আজ এমন একটা প্রবল সভ্যতা জগৎ জুড়িয়া আপন জাল বিস্তার করিতেছে, যা শোষণ করিতে পারে, শাসন করিতে

পাবে, কিন্তু যার মধ্যে সেই আধ্যাত্মিক শক্তি নাই যে শক্তিতে মানুষের সঙ্গে মানুষকে মিলাইয়া দেয় এই সভ্যতাব মধ্যে বুদ্ধিসম্পদ্ যথেষ্ট থাকিতে পারে, কিন্তু ইহাতে এমন একটি সত্যের কমতি আছে যে সত্য মানুষের সকলের চেয়ে বড়ো জিনিস। ··এই পশ্চিমেব বিত্যালয়ে নিজের জাতিব সত্তাকে অত্যন্ত তীব্র করিয়া অনুভব কবিতে শেখায়—এই শিক্ষায় যে স্বাদেশিকতা জন্মে তাব ভিত্তি অন্য জাতিব প্রতি অবজ্ঞা-পরায়ণ পার্থক্যবোধেব উপর প্রতিষ্ঠিত। এইজন্য এই শিক্ষা জগতের যেখানেই পৌঁছিয়াছে সেইখানেই পরজাতিব প্রতি সন্দেহসংকুল বিরুদ্ধতা জাগিয়াছে, সেইখানেই মানুষ অন্যদেশেব মানুষকে ছলে বলে ঠেলিয়া পৃথিবীব সমস্ত সুযোগ নিজে পুবা দখল কবিবাব জন্য নিজের সমস্ত শক্তিকে উগ্যত কবিয়া তুলিতেছে। এই যে একটা প্রকাণ্ড ব্যূহবদ্ধ অহংকাব ও স্বার্থপবতাব চর্চা, এই যে মানুষকে সত্য করিয়া দেখিবার দৃষ্টিকে ইচ্ছা কবিয়া বিকৃত কবিবাব চেষ্টা, ইহা আজ বিলিতি মদ এবং আব-আব পণ্যদ্রব্যেব সঙ্গে ভাবতেও আসিয়া পৌঁছিয়াছে। ··আমরা আজ এই মৃত্যুশেলবিদ্ধ পশ্চিমেব কাছ হইতে স্বাধীনতা ভিক্ষা করিবাব জন্য ছুটাছুটি কবিয়া আসিয়াছি। কিন্তু এই মুমূর্ষু আমাদিগকে কী দিতে পাবে? পূর্বে একবকমেব বাষ্ট্রতন্ত্র ছিল, তাহাব বদলে আর এক-বকমেব বাষ্ট্রতন্ত্র? ·যুরোপ কেন আমাদিগকে মুক্তি দিতে পাবে না? যেহেতু তাহাব নিজের মন মুক্তি পায নাই। তাহাব লোভেব অন্ত কোথায়?" (স্বাধিকাব-প্রমত্তঃ)। শবৎচন্দ্র মোটামুটি এই ভাব নিযেই রবীন্দ্রনাথের 'শিক্ষাব মিলনেব' সমালোচনা কবেছেন। কিন্তু লক্ষ্য কবা দরকার যে ববীন্দ্রনাথ পশ্চিমী শিক্ষাব, ইংবেজি ও বিজ্ঞান শিক্ষাব বিবোধী কোনো কালেই নন, ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠা ও তীব্র-জাতীযতার মুহূর্তেও নন। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায আমাদের বিবেকবুদ্ধির জাগবণেব প্রশংসা ববীন্দ্রনাথেব মত আর কে-ই বা করেছেন? বস্তুতঃ এক একটি আবেগের মুহূর্তে পশ্চিমী সভ্যতাকে ঘৃণার চোখে দেখলেও, শিক্ষাব পদ্ধতিতে আপত্তি কবলেও শিক্ষাব বিষয়েব নিন্দা তিনি করেন নি। এইখানেই যুদ্ধোত্তর নবজাতীয়তাভাবুক বা আন্তর্জাতিক রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে যুদ্ধপূর্ব জাতীয়তাবাদী ববীন্দ্রনাথের মানসিক যোগসূত্র।

শবৎচন্দ্র তাঁর 'শিক্ষার বিবোধ' প্রবন্ধে প্রথমেই ববীন্দ্রনাথের এই অভিমতের প্রতিবাদ করেছেন যে যুরোপ বিজ্ঞান এবং মারণাস্ত্রকে কাজে লাগিয়ে পৃথিবী জয় কবেছে বলেই তাদের সত্যের জোর আছে এমন কথা মানা যায় না। কিন্তু শবৎচন্দ্র বোধ হয ববীন্দ্রনাথের অভিপ্রায় ধরতে পারেন নি। বিজ্ঞানকে অকল্যাণে প্রয়োগ করছে সাম্রাজ্যবাদী বাষ্ট্রিক ধুরন্ধরেরা, কিন্তু এ ছাড়া বিজ্ঞানের যে স্বকীয় সারস্বত মহিমা রয়েছে, প্রাকৃতিক নিয়মকে আয়ত্ত করার মধ্যে যে মানবমহিমার সত্য রয়েছে তাকেই রবীন্দ্রনাথ অভিনন্দিত করেছেন এবং এই প্রথাজীর্ণ স্থবিব দেশে বিজ্ঞানই

একমাত্র চিত্তের মুক্তি আনতে পারে এজন্য পশ্চিমের সহায়তা তিনি কামনা করেছেন। মনে রাখতে হবে, স্বামী বিবেকানন্দও স্বদেশেব জড়ত্বমুক্তির ব্যাপারে পশ্চিমী বিজ্ঞানবিদ্যার দাক্ষিণ্য কামনা কবেছিলেন। শবৎচন্দ্র ইংরেজ প্রবর্তিত শিক্ষাপদ্ধতিতে ত্রুটি ধরেছেন। কিন্তু এই উপনিবেশবাদের সহাযক পদ্ধতির দোষ ববীন্দ্রনাথ পূর্বেই পুনঃপুনঃ উদ্‌ঘাটন কবেছেন তাঁব শিক্ষাবিষযক প্রবন্ধগুলিতে এমন কি স্বল্প পূর্বে লেখা "অসন্তোষের কারণ" প্রবন্ধে। তবু সত্যাগ্রহমন্ত্রে দীক্ষিত এবং মোটামুটি ইংরেজিয়ানা-বিদ্বেষী শবৎচন্দ্র তাঁব সমালোচনায বোধ হয় একটি যথার্থ ব্যাপাব ধরেছেন। তা হ'ল "আমাদের ঋষিবাক্য যত ভালই হোক তারা নেবে না, কাবণ তাতে তাদের প্রয়োজন নেই।" বস্তুতই তাবা নেয় নি এবং এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের উচ্চাশা পোষণ ব্যর্থ হয়েছে বলতে হবে।

লক্ষণীয় এই যে রবীন্দ্রনাথ ১৯২০তে য়ুবোপ ভ্রমণ কবতে গিযেই যে য়ুবোপের সঙ্গে সাবস্বত মিলনেব স্বপ্ন দেখলেন এমন নয়। তার পূর্বেই তাঁব 'বিশ্বভারতী'র কল্পনা এবং ১৯১৯এ লেখা 'বিদ্যাসমবায়' প্রবন্ধে বা 'ছাত্রশাসনতন্ত্র' প্রবন্ধেব উপসংহাবে তিনি আমাদেব শিক্ষায ব্যাপ্তিব জন্য ইংবেজ অধ্যাপকেব সাহচর্যের প্রয়োজন অনুভব কবেছেন। দীনবন্ধু এণ্ড্রুজ এবং পিয়র্সনের দৃষ্টান্ত তাঁর প্রত্যক্ষেই ছিল। মোটের উপব এই বলা যায় যে, জাতীয় বুদ্ধির সংকীর্ণতায় নিতান্ত ক্ষুব্ধ রবীন্দ্রনাথ বৈজ্ঞানিক মুক্তবুদ্ধি প্রবর্তনের জন্য আগ্রহী ছিলেন এবং এই অর্থেই তিনি য়ুবোপীয় পণ্ডিতবর্গের সাহচর্যে য়ুরোপীয় পদ্ধতিব সাহিত্য, বিজ্ঞান, সমাজবিদ্যাব প্রবর্তন কামনা করেছেন। যে জাতীয়-সংকীর্ণতা জাতিবর্ণভেদ ও হিন্দু-মুসলমানেব তীব্র পার্থক্যকে পুবাতন শাস্ত্র ও আচাবের সাহায্যে স্থায়ী ক'বে বাখতে চায়, তাব সঙ্গে আপোষে রবীন্দ্রনাথ কোনো মতেই রাজি ছিলেন না এবং সেইজন্যেই য়ুবোপীয়, পারসিক, চীনীয় বিদ্যাব সঙ্গে ভাবতীয় বিদ্যাব মিশ্রণে সাংস্কৃতিক বিপ্লব ঘটিয়ে গোঁড়া হিন্দুয়ানিব আশ্রয়টাকে অর্থহীন ক'রে তোলা তাঁর কর্তব্য ব'লে মনে করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ভাবুক এবং কবি ছিলেন ব'লে অসহযোগের বাজনীতিক গূঢ়ার্থ ধরতে পাবেন নি এমন মন্তব্য যাঁরা ক'রেছেন তাঁবা রবীন্দ্রনাথের 'সাধনা পত্রিকা'র রাজনীতিক প্রবন্ধগুলির কথা বা মহাযুদ্ধের পটভূমির রবীন্দ্রকৃত বিশ্লেষণের কথা সাময়িকভাবে ভুলে গেছেন।* খিলাফৎ আন্দোলন এবং অসহযোগের প্রবল জোয়ারের মুখে তাই

* তুলনীয় নেপাল মজুমদার মহাশয়ের মন্তব্য—"পরাধীন দেশে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের যে একটি বিশেষ ঐতিহাসিক ও প্রগতিশীল ভূমিকা আছে—রাজনীতির এ জটিল তত্ত্ব রবীন্দ্রনাথের খুব ভাল বোধগম্য হয় নাই। কেন না রবীন্দ্রনাথ কবি—এক মহান্ আদর্শবাদী ভাবুক কবি।" (জাতীয়তা আন্তর্জাতিকতা ও রবীন্দ্রনাথ)

জাতীয় মুক্তিকামী অথচ সমাজতান্ত্রিক কবি নিজ মতে অটল, গান্ধীজীর সঙ্গে মতবিরোধ হচ্ছে এবং বাংলার নেতা ও স্বাদেশিকদের শ্রদ্ধা হারাচ্ছেন জেনেও অবিচলিত। জাতির মৌলিক আভ্যন্তরীণ ত্রুটি সংশোধন না ক'রে অসহযোগ-ভিক্ষালব্ধ মুষ্টিমেয়ের স্বাধীনতায় তিনি রাজি নন। "আমাদের মানসপ্রকৃতির মধ্যে যে অবরোধ রয়েছে তাকে ঘোচাতে না পারলে আমরা কোনো রকমের স্বাধীনতাই পাব না।" "দেশের যে অবস্থা ঘটলে স্বাধীনতার মূলপত্তন হয়, স্বাধীনতা সত্য হয়, সে অবস্থা ঘটাবার জন্যে চেষ্টা করাই আমাদের বর্তমান কর্তব্য।" 'কালান্তর' গ্রন্থে সংকলিত এই সময়কার আন্দোলন-সমালোচনার প্রবন্ধ-নিচয়ের মধ্যেও কবি আসলে জাতীয় মৌলিক দুর্বলতার দিকেই বারংবার আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন এবং স্বকীয় উদ্‌যোগে এই ত্রুটি সংশোধনের দুটি উপায় একই সঙ্গে প্রবর্তন করতে চেয়েছেন—বিদ্যাসমবায়ে মানসিক রূপান্তর, গ্রামসংগঠনে অর্থনীতিক রূপান্তরের সঙ্গে মূর্ছিত সমাজচৈতন্যের বিকাশ সাধন।

অসহযোগ আন্দোলনের অভিঘাতে লেখা অন্যান্য কয়েকটি প্রবন্ধেও রবীন্দ্রনাথ এই মৌলিক ত্রুটিরই বিচার করেছেন এবং গঠনমূলক স্বাদেশিকতাকে তুলে ধরেছেন। রবীন্দ্রনাথ অহিংস অসহযোগকে একেবারে প্রত্যাখ্যান করেননি। সাম্রাজ্যবাদীদের অন্যায়ের প্রতিবাদে অহিংস অসহযোগের সার্থকতা তিনি স্বীকার করেছেন কয়েক-বারই, এমন কি 'প্রায়শ্চিত্ত' ও 'মুক্তধারা' নাটকে উগ্র রাষ্ট্রস্বার্থের প্রতিবাদে অসহযোগনীতিকে আংশিকভাবে সমর্থনও জানিয়েছেন, কিন্তু চরকা ও বয়কট তাঁর মনঃপূত হয়নি, আর তার চেয়েও বড় কথা, হিন্দু-মুসলমান বিরোধ এবং শিক্ষিত উচ্চবর্ণ হিন্দুর সঙ্গে নিম্নবর্ণের ব্যবধান দূর করার কোনো কার্যকর নীতি অসহযোগ আন্দোলনে ছিল না ব'লে, গঠনমূলক স্বাদেশিকতা নয় ব'লে একে প্রত্যাখ্যানই করেছেন। খিলাফৎ আন্দোলনকে ভিত্তি ক'রে গান্ধীজী হিন্দু-মুসলমানের যে মিলন গ'ড়ে তুলতে চেয়েছিলেন তা তিন-চার বছরও স্থায়ী হয়নি। খোদ তুরস্কেই নব্যমুসলিম আন্দোলনে ধর্মের গোঁড়ামি পরিত্যক্ত হওয়ায় এখানকার খিলাফতের আশ্রয় ভেঙে গেল এবং হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কে ভাঙন দেখা যেতে লাগল। ১৯২৩-২৪ থেকে নানান্ অছিলায় ক'লকাতা, অমৃতসর, দিল্লী, কোহাট, আলিগড় প্রভৃতি স্থানে ঘন ঘন দাঙ্গা-হাঙ্গামা হতে লাগল। মুসলিম লীগ্‌এর প্রত্যুত্তরে হিন্দু মহাসভা সংগঠিত হ'ল এবং সুযোগ বুঝে এখন থেকে নীতিগতভাবে ইংরেজ সরকার মুসলিমদের প্রতি পক্ষপাত দেখাতে লাগলেন। বঙ্গভঙ্গের সঙ্গে যুক্ত বয়কট আন্দোলনের সময় থেকেই রবীন্দ্রনাথ হিন্দু-মুসলিম সমস্যার গুরুত্ব অনুধাবন করেছিলেন এবং এ বিষয়ে তাঁর মনোভাব পাবনা সম্মিলনীর ভাষণে, সদুপায়, ব্যাধি ও প্রতিকার ('সমূহ' দ্রঃ), সমস্যা ('রাজাপ্রজা' দ্রঃ) প্রভৃতি প্রবন্ধে

স্পষ্টভাবেই বুঝিয়েছিলেন। খিলাফতের উচ্ছ্বাস স্তব্ধ হ'লে পব অসহযোগ আন্দোলনের প্রবলতার মধ্যেই কার্যতঃ বিভেদরক্ষাপরায়ণ হিন্দুদের উপর মুসলমানদেব অবিশ্বাস ক্রমে বর্ধিত হয়ে দাঙ্গার আকাব গ্রহণ করলে রবীন্দ্রনাথ পুনরায় হিন্দু-মুসলিম বিরোধের ভিত্তিমূলে প্রবেশ ক'বে সেই ভিত্তিকেই চূর্ণ করতে উভয় পক্ষকে উপদেশ দিয়েছেন। তিনি 'কালান্তরে'র মধ্যে সমস্যা, সমাধান এবং হিন্দু-মুসলমান শীর্ষক তিনটি প্রবন্ধে পুনরায় উভয়ের সম্পর্ক কী ভাবে সহজ হবে সেই পথেব নির্দেশ দিতে চেয়েছেন। 'সমস্যা' প্রবন্ধে তিনি প্রথমে স্বাধীনতা বা মুক্তির মূলতত্ত্ব পরিস্ফুট করতে চেয়েছেন। তিনি বলছেন যে মানুষের সঙ্গে মানুষেব ভেদেই স্বাধীনতাব বিলোপ। এই বিলোপকে দূব করাব জন্য প্রয়োজন হয বিপ্লবেব। ফবাসীবিপ্লবেব দৃষ্টান্ত দিয়ে বোঝাচ্ছেন—'গোড়াকাব কথাটা এই যে তাদেব মধ্যে শাসিত এবং শাসয়িতা এই দুই দলেব মধ্যে ভেদ ঘটেছিল। সে ভেদ জাতিগত ভেদ নয, শ্রেণীগত ভেদ। সেখানে একদিকে বাজা ও বাজপুরুষ, অন্য দিকে প্রজা, যদিচ একই জাতেব মানুষ, তবু তাদের মধ্যে অধিকাবেব ভেদ অত্যন্ত বেশি হযে উঠেছিল। এই জন্যে তাদেব বিপ্লবের একটি মাত্র কাজ ছিল, এই শ্রেণীগত ভেদটাকে বাষ্ট্রনৈতিক সেলাইযের কলে বেশ পাকাবকম সেলাই ক'বে ঘুচিযে দেওয়া।' এই রাষ্ট্রিক বিপ্লবের উদাহরণ দিয়ে হিন্দু-মুসলমান শ্রেণীগত বিভেদের পবিণাম নির্দেশ কবতে ভিন্নতঃ সোভিযেট সমাজ-বিপ্লবেব দৃষ্টান্ত দেওয়াব প্রয়োজনও কবি বোধ কবলেন, কারণ, সাধারণভাবে মুসলমান হিন্দু অনুন্নত-শ্রেণীর মতই দরিদ্র, বঞ্চিত। তিনি বলছেন—"আজ আবাব সেখানে (অর্থাৎ য়ুরোপে) দেখছি, আব একটা বিপ্লবেব হাওয়া বইছে। খোঁজ করতে গিয়ে দেখা যায়, সেখানে বাণিজ্যক্ষেত্রে যারা টাকা খাটাচ্ছে আর যারা মজুবি খাটছে, তাদের মধ্যে অধিকারের ভেদ অত্যন্ত বেশি। এই ভেদে পীড়া ঘটায় সেই পীড়ায় বিপ্লব।" সাময়িক কোনোবকম জোড়াতালি বা গোঁজামিল দিয়ে এরকম অবশ্যম্ভাবী বিপ্লব রোধ করা যায় না ব'লে এদেশের শিক্ষিত হিন্দু উচ্চবর্ণ এবং ধনীদেব সতর্ক করাব জন্য বাশিয়ার দৃষ্টান্ত দিয়ে বলছেন—"ধনীরা ভীত হয়ে উঠে কর্মীরা যাতে ভালো বাসস্থান পায, যাতে তাদের ছেলেপুলেরা লেখাপড়া শিখতে পারে, যাতে তারা সকল বিষয়ে কতকটা পরিমাণে আরামে থাকে, দয়া করে মাঝে মাঝে সে চেষ্টা করে। কিন্তু তবু ভেদ যে রয়ে গেল,—ধনীর অনুগ্রহের ছিটে-ফোঁটায় সেই ভেদ তো ঘোচে না, তাই আপদও মিটতে চায় না।" ইতিহাসবিৎ রবীন্দ্রনাথ এই প্রসঙ্গে আমেবিকার স্বাধীনতা, অষ্ট্রীয় রাজশাসন থেকে ইটালীয়দের মুক্তি এবং ইংলণ্ডে রাজতন্ত্র থেকে গণতন্ত্রের প্রবর্তন প্রভৃতি প্রসঙ্গও তুলেছেন। কিন্তু সেকথা বিস্তারের আপাততঃ প্রয়োজন নেই। 'সমস্যা' প্রবন্ধে মানুষে মানুষে এই বিভেদের ভূমিকা ক'বেই তিনি স্বদেশের কথায় এসেছেন এবং

পরিষ্কারভাবে বলেছেন যে ইংরেজ থাকা না থাকাটা আমাদের প্রধান সমস্যা নয়, প্রধান সমস্যা হ'ল মানুষে মানুষে ঐক্যেব অভাব। তিনি ইংবেজ-অধিকাবের সমর্থন করেন না, কিন্তু সেই সঙ্গে প্রখ্যাত স্বাদেশিকদের মত এও মনে কবেন না, ইংরেজ চলে গেলেই আমাদের মূল সমস্যাব সমাধান ঘটবে। তাঁর মতে প্রথমে ইংবেজ-বিতাডন হ'লে পরে দেশেব হিন্দু-মুসলমান, উচ্চবর্ণ-নিম্নবর্ণ, ধনী-নির্ধন সমস্যা আপনা থেকেই ঠিক হয়ে যাবে স্বাদেশিকদেব এবকম ধাবণাব মধ্যে একটা মস্ত বড ফাঁকি বয়েছে। "এই ফাঁকি সর্বনেশে, কেননা নিজকৃত ফাঁকিকে মানুষ ভালোবাসে, তাকে যাচাই করে দেখতে প্রবৃত্তি হয না।" তাঁব মতে ভাবতবর্ষে মানুষে মানুষে এ বিভেদ এত প্রবল যে তাই নিযে একজাতিত্ব (Nation) দাবী কবা যায না। এবং এই অবাস্তব নিযে এই কাঁচা ভিতেব উপব বড কোনো সিদ্ধি আসতেই পাবে না। দৃষ্টান্ত দেখিযে বলছেন—"খেলাফতেব ঠেকা-দেওযা সন্ধিবন্ধনেব পব আজকেব দিনে হিন্দু-মুসলমানেব বিবোধ তাব একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। মূলে ভুল থাকলে কোনো উপাযেই স্থূলে সংশোধন হতে পাবে না।" তৃতীয পক্ষ হিসেবে ইংবেজ ভেদ ঘটাচ্ছে, এ যেমন তিনি ১৯০৭-৮এ মানেননি, তেমন এখনও অর্থাৎ ১৯২৩এও মানছেন না এবং এক্ষেত্রে স্বাদেশিকদেব প্রত্যুত্তরে তিনি বলছেন—ছিদ্র আছে ব'লেই পাপ প্রবেশ কবেছে, তৃতীয পক্ষ এব সুবিধে আদায কবলে তাব ঘাডেই দোষ চাপানো যায় না।

এই প্রবন্ধে নানা যুক্তিতে ও ভঙ্গিতে মূলসমস্যা-চাপা-দেওয়া স্বাদেশিকদের বিভিন্ন দিক থেকে আক্রমণ ক'বে তিনি তাঁদেব জাগ্রত-নিদ্রিতাবস্থায় চক্ষুরুন্মীলন ঘটাতে চেয়েছেন। ১৯২১এ কংগ্রেসেব বযকট প্রভৃতি কর্মপদ্ধতিব সঙ্গে অস্পৃশ্যতা-আন্দোলনও যোগ ক'রে দিয়েছিলেন গান্ধীজী। রবীন্দ্রনাথ বলতে চেয়েছেন অস্পৃশ্যতা মূল সমস্যাব ক্ষুদ্র একাংশ মাত্র। এতে অস্পৃশ্যদের শিক্ষা ও অর্থনীতিক মান-উন্নয়নের কী সুবাহা হবে? "আমি বলি, এহ বাহ্য। স্পর্শদোষ তো আমাদের ভেদবুদ্ধির একটিমাত্র বাহ্যলক্ষণ। যে সনাতন ভেদবুদ্ধির বনস্পতি আমাদেব পথ বোধ ক'বে দাঁডিযে আছে তাব থেকে একটি কাঠি ভেঙে নিলেই তো পথ খোলসা হবে না।" পথ খোলসা হয়ওনি। ১৯২৮এ মতিলাল নেহরু-বচিত সর্বদলগ্রাহ্য শাসনতন্ত্র না মুসলিম লীগ না অনুন্নত সম্প্রদায় কারো কাছেই গৃহীত হল না। ১৯৩২এ Communal Award এব নিদারুণ আঘাতে মহাত্মাজী যদ্যপি স্বপ্নের মোহবেষ্টন ফেলে জাগলেন এবং ব্যক্তিত্বের প্রভাবে হিন্দু-বিভাগ বোধ করলেন, মুসলিম সমস্যা সমস্যাই থেকে গেল, পরিস্ফুট দ্বিজাতিতত্ত্বের হাওয়া বইতে লাগল, তথাকথিত Nation দ্বিখণ্ডিত হ'ল। তাবপর? আজকের ধর্মনিবপেক্ষ আমাদেব রাষ্ট্রে দ্বিজাতিতত্ত্বের বা বহুজাতিতত্ত্বের জড কি সত্যই মরেছে? আজ সমাজতন্ত্রেব হাওয়া বইছে। এ হাওযা যদি যথার্থ দক্ষিণা বাতাস

হয়, যদি সাময়িক নিম্নচাপের ফলে উদ্গত না হয়, এ যদি সামন্ততান্ত্রিক গলিত জীর্ণ পাতা যথার্থই উড়িয়ে নিয়ে যেতে পাবে তা হ'লে রবীন্দ্রনাথের প্রার্থিত স্বাধীনতার প্রত্যাশা পূর্ণ হতেও পারে।

এর পর উভয়ের ধর্মগত পার্থক্যের বিষয় তুলে ববীন্দ্রনাথ দেখালেন যে যথার্থ ধর্ম মিলন ঘটায়, মিলনে বাধা দেয় না। হিন্দুরা ধর্মের নামে অবুদ্ধি বা কুসংস্কারকেই প্রশ্রয় দিচ্ছে। ধর্মতন্ত্র বা আচারসর্বস্বতাকে মেনে বিবেক-বিচার তার কাছে বিসর্জন দিয়ে বসে আছে। অপবপক্ষে মুসলমানদেব বয়েছে ধর্মের গোঁড়ামি, যা অশিক্ষা অবুদ্ধি সঞ্জাত। শাস্ত্র ও প্রথার দাসত্বে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা হিন্দুব জীবনকে তিনি আধুনিক কাবখানা ঘবেব দাসত্বে বাঁধা শ্রমিকের জীবন থেকে কিছুমাত্র কম নিগৃহীত মনে করেন না, এব অমানবিকতা আবও ব্যাপক আবও ভযংকব ব'লেই বোধ কবেন। তাঁর ভাষায়—

> "যে বিপুল ব্যবস্থাতন্ত্র অতি নিষ্ঠুব শাসনেব বিভীষিকা সর্বদা উদ্যত রেখে বহু যুগ ধ'বে বহুকোটি নবনাবীকে যুক্তিহীন ও যুক্তিবিরুদ্ধ আচারেব পুনবাবৃত্তি কবতে নিযত প্রবৃত্ত বেখেছে, সেই দেশজোড়া মানুষ-পেষা কল কি কল হিসেবে কারো চেয়ে খাটো? বুদ্ধিব স্বাধীনতাকে অশ্রদ্ধা ক'বে এত বড়ো সুসম্পূর্ণ সুবিস্তীর্ণ চিত্তশূন্য বজ্রকঠোর বিধিনিষেধের কাবখানা মানুষের রাজ্যে আর কোনো দিন আব কোথাও উদ্ভাবিত হয়েছে ব'লে আমি তো জানি নে।"

এব পর ববীন্দ্রনাথ লক্ষ্য করেছেন যে উচ্চতম থেকে নিম্নতম পর্যন্ত বহু পর্যায়ে বিভক্ত এবং উচ্চতবের নিম্নতরকে ঘৃণায কলুষিত হিন্দু সমাজের সঙ্গে সাম্যের দ্বাবা ঐক্যবদ্ধ মুসলিম সমাজের শক্তির সমকক্ষতাও নেই। সুতবাং মেলা দুষ্কর। চবকা এবং অসহযোগের সমর্থনে গান্ধীজী Young India পত্রিকায় লেখেন—'When there is war the poet lays down the lyre' ইত্যাদি। রবীন্দ্রনাথ এই 'war' শব্দটির তাৎপর্য নিয়ে বললেন—ইংরেজের সঙ্গে অসহযোগের লড়াইয়ে প্রবৃত্ত না হয়ে প্রথমে এই মৌল দুর্বলতার সঙ্গেই লড়াই করতে হবে। "আমাদের লড়াই ভূতের সঙ্গে, আমাদের লড়াই অবুদ্ধির সঙ্গে, আমাদের লড়াই অবাস্তবের সঙ্গে।" এই সমাধানের পথই পরবর্তী প্রবন্ধে পরিস্ফুট ক'রে বলা হয়েছে—আধুনিক বিজ্ঞানমূলক জনশিক্ষার প্রসার চাই, যাতে মুক্তবুদ্ধির জাগরণ সম্ভব হবে। প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতিতে যে মুষ্টিমেয় শিক্ষিত নামে পরিচিত হচ্ছেন তাঁদের বুদ্ধি মুক্ত নয়। উচ্চশিক্ষা পেলেও তাঁরা হাজার বছরের সামন্ততান্ত্রিক সংস্কারের দাসানুদাস হয়েই থাকছেন। চরকায় সুতো কেটে এমন কি তার দ্বারা ইংরেজকে বিতাড়িত করেও স্বাধীনতার ফল

আমরা পার না। গান্ধীজীর প্রবন্ধে কথিত "When a house is on fire, all the inmates go out, and each one takes up a bucket to quench fire". এই রূপক-বাক্যের গূঢ়ার্থের প্রতিবাদ ক'রে রবীন্দ্রনাথ 'সমাধান' প্রবন্ধে বললেন—"আগুন লাগলে আগুন নেবানো চাই, এ কথাটা আমার মত মানুষের কাছেও দুর্বোধ নয়। এর মধ্যে দুরূহ ব্যাপার হচ্ছে কোন্‌টা আগুন সেইটে স্থির করা, তার পরে স্থির করতে হবে কোন্‌টা জল। ছাইটাকেই আমরা যদি আগুন বলি তাহ'লে ত্রিশ কোটি ভাঙা কুলো লাগিয়েও সে আগুন নেবাতে পারব না। নিজের চরকায় সুতো, নিজের তাঁতের কাপড় আমরা যে ব্যবহার করতে পারছি নে, সেটা আগুন নয়, সেটা—ছাইয়ের একটা অংশ অর্থাৎ চরম ফল। নিজের তাঁত চালাতে থাকলেও এ আগুন জ্বলতে থাকবে। বিদেশী আমাদের রাজা এটাও আগুন নয়, এটা ছাই। বিদেশীকে বিদায় করলেও আগুন জ্বলবে! এমন কি স্বদেশী রাজা হলেও দুঃখদহনের নিবৃত্তি হবে না। এমন নয় যে হঠাৎ আগুন লেগেছে, হঠাৎ নিবিয়ে ফেলব। হাজার বছরের ঊর্ধ্বকাল যে আগুন দেশটাকে হাড়ে মাসে জ্বালাচ্ছে, আজ স্বহস্তে সুতো কেটে কাপড় বুনলেই সে আগুন দু দিনে বশ মানবে একথা মেনে নিতে পারি নে। আজ দুশো বছর আগে চরকা চলেছিল, তাঁতও বন্ধ হয়নি, সেই সঙ্গে আগুনও দাউ দাউ করে জ্বলেছিল। সেই আগুনের জ্বালানি কাঠটা হচ্ছে ধর্মে কর্মে অবুদ্ধির অন্ধতা।"

দেখা যায় গান্ধীজী ও স্বাদেশিকদের মত ও পথের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মত ও পথের গুরুতর ব্যবধান এবং আজও যদি এই বিতর্ক উত্থাপিত হয় যে—আগে ইংরেজ হটিয়ে স্বাধিকার পেয়ে পরে দেশসংগঠন, না, দেশসংগঠনের কাজ পাকারকম হলে ইংরেজের অনায়াস অপসরণের পর নির্বিবাদ সমাজতন্ত্র লাভ—তাহ'লে সে বিতর্কের উপসংহার পাওয়া যাবে না এমন মনে হয় না, বিশেষতঃ যখন স্বাধীনতার পঁচিশ বৎসর পরেও দেখা যাচ্ছে সমাজতন্ত্র কথায় মানলেও কাজে সহজ হচ্ছে না। প্রসঙ্গতঃ লক্ষণীয় এই যে ধনতান্ত্রিকতার প্রসারবোধের দৃষ্টি নিয়ে ১৯২৯-৩০ খ্রীঃ পণ্ডিত নেহরু কংগ্রেস সভায় সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্য স্থিরভাবে ব্যক্ত করেছিলেন। আজ ১৯৭২এর ১৭ই সেপ্টেম্বর স্বাধীন ভারতের কর্ণধারকে বলতে শুনছি ছোট ছোট রায়তদের সমবায় পদ্ধতিতে যন্ত্রের সাহায্যে চাষের উন্নতি ঘটাতে হবে। রবীন্দ্রনাথ ১৯০৭-৮ খ্রীষ্টাব্দেই উপলব্ধি করেছিলেন যে এখনই অর্থাৎ স্বায়ত্তশাসনের আগেই জমিদাররা জমিদারি ছাড়লে ছোট কৃষকেরা মারা পড়বে, ঋণের দায়ে মহাজনেরা তাদের জমি গ্রাস ক'রে ক্ষুদে জমিদার বা প্রবল জোতদার হয়ে উঠবে এবং তাদের প্রজাপীড়ন হবে আরও সাংঘাতিক। এই বর্তমান সালেরই গত ২০এ মে প্রকাশিত 'আনন্দবাজারে'র একটি খবরে দেখেছি "খরা-

কবলিত জেলাগুলিতে জলের দামে জমি বিক্রি হচ্ছে ব'লে শুক্রবার মহাকবণে সংবাদ আসে। অভাবের জন্য অল্প জমির মালিকরা মহাজন এবং এক শ্রেণীব ব্যবসাযীব কাছে এই সব জমি বিক্রি করছেন ....আরও সংবাদ : অনেক মহাজন বন্ধকী জমি অল্প পয়সার বিনিময়ে বিক্রি ব'লে লিখিয়ে নিচ্ছেন।" এই জন্যেই কৃষকেরা জমিব ন্যায্য মালিক এই সত্যটি স্বীকাব ক'বেও ('রাযতেব কথা' ও চিঠিপত্র, দ্রঃ) তিনি তৎকালীন জমিদারদের উদাবদৃষ্টিসম্পন্ন হওয়াব এবং অশিক্ষিত কৃষককে শিক্ষিত কবাব পবিকল্পনা গ্রহণ করতে অনুবোধ কবেন ('পাবনা সম্মিলনীতে ভাষণ' দ্রঃ)। লক্ষণীয় এই যে ববীন্দ্রনাথেব ঐ সব প্রগতি-ভাবনার অর্ধশতাব্দী পবে ভূমিসংস্কাব আইন প্রবর্তিত যদ্যপি হযেছে তাব দু'দশকেবও মধ্যে তা কার্যকব হবে কিনা এবং অশিক্ষিত কৃষককে শিক্ষিত ক'বে তোলা যাবে কিনা সে বিষযে সংশয় পুবোমাত্রাই থেকে যাচ্ছে। সে যাই হোক, পবাধীনতাব তত্ত্বকে ববীন্দ্রনাথ যে ভাবে দেখেছিলেন, সামন্ততান্ত্রিক বিধিব্যবস্থাব সঙ্গে লডাইযে যেভাবে প্রবর্তিত হবার আহ্বান জানিযেছিলেন, তাতে তখনকাব কালে তাঁব একক অভিযাত্রীত্ব আজ বিস্মযেব সঙ্গে আমরা লক্ষ্য করছি এবং হযত তাঁবই মত ভাবছি "কী হযেছে, আব কী হতে পাবত"।

অসহযোগেব তুফানেব মধ্যেই হিন্দুমুসলিম দাঙ্গাব প্রতিক্রিয়ায় ডঃ কালিদাস নাগকে লেখা চিঠি বা 'হিন্দু-মুসলমান' প্রবন্ধে ববীন্দ্রনাথ দেখাতে চাইলেন যে মুসলমান যেমন ধর্মেব গোঁডামিতে নিজকে সাম্প্রদাযিক ক'বে বেখেছে, তেমনি হিন্দু নিজকে আচাবে-পবিবেষ্টিত ক'রে মুসলমানকে প্রত্যাখ্যান কবেছে। আহারে ব্যবহাবে এই আচাবেব বেড়া-ই তাব মধ্যে বেশি কণ্টকাকীর্ণ। "খিলাফত উপলক্ষ্যে মুসলমান নিজের মসজিদে এবং অন্যত্র হিন্দুকে যত কাছে টেনেছে, হিন্দু মুসলমানকে তত কাছে টানতে পারে নি।" এব সমাধান নির্দেশ কবতে ববীন্দ্রনাথ মুক্তবুদ্ধির বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির শিক্ষাব কথা বলেছেন। "যুবোপ সত্যসাধনা ও জ্ঞানের ব্যাপ্তিব ভিতর দিয়ে যেমন ক'রে মধ্যযুগের ভিতর দিযে আধুনিক যুগে এসে পৌঁছেচে, হিন্দুকে মুসলমানকেও তেমনি গণ্ডির বাইরে যাত্রা কবতে হবে।" এব আগে অর্থাৎ ১৯০৬-৭এ গ্রামসংগঠন-মূলক স্বাদেশিক কর্মযজ্ঞকেও মিলনেব একটা উপায় বলে তিনি মনে করেছিলেন। 'স্বামী শ্রদ্ধানন্দ' শীর্ষক আলোচনায তিনি দেখালেন যে হিন্দু মানেই একের সঙ্গে অন্যের পাকা পার্থক্য। সেই পাপ তাব নিজের সমাজেব অভ্যন্তরেই রয়েছে, 'অন্তরেব মধ্যে বহুকালের অভ্যস্ত ভেদবুদ্ধি, বাইবেও বহু দিনের গড়া অতিকঠিন ভেদের প্রাচীব।' রাষ্ট্রিক আন্দোলনে এ-ভেদ দূর হবে না, বরং বেড়েই চলবে। সমাজ ও ধর্মনীতির পরিবর্তনের জন্য "অতি নির্মমভাবে তাকে আক্রমণ করা চাই।"

অসহযোগ আন্দোলনের পরিণত অবস্থায় চরকা এবং খদ্দর যখন প্রায় প্রতিষ্ঠিত, অথচ রবীন্দ্রনাথ কোনোমতেই এর সপক্ষতা করছেন না ব'লে সমালোচনার সম্মুখীন, তখন চরকা ও স্বরাজসাধন প্রবন্ধ দুটিতে পরপর তিনি জাতিগঠনে চরকা-খদ্দরের অসম্পূর্ণতাব বিষয় পুনশ্চ তুলে ধবেছেন। প্রথমেই তিনি বলছেন এই গুরুব শাসন-মানা দেশে আর একটা প্রথাব শাসনে বা জড় অভ্যাসেব বন্ধনে মানুষ বাঁধা পড়ুক এটা তিনি চান না, সেজন্য বিদ্রোহ করছেন। তিনি যুক্তি-বিজ্ঞানেব পথিক। চরকা মান্ধাতাব আমলেব যন্ত্র। বিজ্ঞান ও যন্ত্রনির্ভর কল্যাণসম্পদের যুগে এ পশ্চাদপসরণ। তা ছাড়া মানুষেব সামগ্রিক উন্নতি কি এই একটি উপায়েই সিদ্ধ হবে? ব্যক্তিগতভাবে কাটা চবকাব স্থতোয অর্থনীতিক দুর্গতি দূব হবে, না, সমবায়েব মধ্য দিয়ে বহুমুখী প্রয়াসে সামগ্রিক উন্নতি সম্ভব। তা ছাড়া দেশে এমনিতেই তো হিন্দু-মুসলমানে বর্ণে বর্ণে পার্থক্য বযেছে, এব মধ্যে আবাব খদ্দবধাবী এবং খদ্দবধারী নয় এবকম নোতুন বিভেদেব সৃষ্টি হবে। এই শেষেব আপত্তিটি দীনবন্ধু এনড্রুজও তুলেছিলেন।

'স্ববাজ-সাধনে' বলা হযেছে যে স্ববাজ দুরূহ সাধনাব-বস্তু, চরকামন্ত্র এবং খদ্দব-তন্ত্রেব পথে সহজে ঐ সিদ্ধি আসবে না। ববীন্দ্রনাথ স্বীকাব করছেন যে সকলে মিলে চবকা চালালে অর্থেব দুর্গতি কিছুটা দূব হতেও পাবে, কিন্তু কৃষকেবা অবসব-সময়ে স্থতো কাটায দৃঢভাবে আত্মনিযোগ করবে কিনা, সে মানস-প্রস্তুতি তাদেব আছে কিনা সেটাই প্রশ্ন। আন্দোলন কবা, সভাসমিতিতে বা মিছিলে যোগ দেওযা সহজ, কিন্তু মনেব সংস্কাব দূব কবা সহজ নয়। আমাদেব আসল সমস্যাটা হিন্দু-মুসলমানেব। এবং সে সমস্যাব মূল আমাদেব মানসিকতায়, সংস্কাবে। এব পবিবর্তন দুরূহ, কিন্তু এব বদলে চবকা-কাটা হয়তো স্বাদেশিকদেব কাছে সহজ, তাই তাঁরা চরকা-কাটাব সপক্ষে বলছেন। রবীন্দ্রনাথেব মতে "চবকার সঙ্গে স্ববাজকে জডিত ক'বে স্ববাজ সম্বন্ধে দেশেব জনসাধারণের বুদ্ধিকে ঘুলিয়ে দেওযা হচ্ছে।" আমবা স্ববাজেব সমগ্র-মূর্তি চাই অর্থাৎ শিক্ষায, স্বাস্থ্যে, শিল্পে, আধুনিক বিজ্ঞানে পূর্ণাঙ্গ আর্থিক কল্যাণে অগ্রগতি চাই। একমাত্র চরকা তা দিতে পাবে না। পবিশেষে ববীন্দ্রনাথ বহু-চিন্তিত এবং স্বহস্তসাধিত·সেই গ্রামসংগঠনের আদর্শই তুলে ধবলেন—"ভারতবর্ষের একটিমাত্র গ্রামের লোকও যদি আত্মশক্তিব দ্বারা সমস্ত গ্রামকে সম্পূর্ণ আপন কবতে পাবে তা হলেই স্বদেশকে স্বদেশরূপে লাভ করবাব কাজ সেইখানেই আবম্ভ হবে······ সম্মিলিত আত্মকর্তৃত্বের চর্চা, তার পরিচয়, তাব সম্বন্ধে গৌরববোধ জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপ্ত হলে তবেই সেই পাকা ভিত্তিব উপর স্ববাজ সত্য হয়ে উঠতে পারে।"

চরকা স্বরাজ নিয়ে এই বাদ প্রতিবাদেব মধ্যে রবীন্দ্র সমালোচনার যাথার্থ্য স্বীকার ক'রে নিয়েও একটি কথা বলার থাকে। অথচ সেকথা স্বাদেশিকদের এবং তেমন ক'রে

মহাত্মাজীকেও বলতে শোনা যায় না। তা হ'ল এই যে, বিপ্লবী আন্দোলন মাত্রেই গাণিতিক পথে অগ্রসর হয় না, তার মধ্যে ভাবের বা আদর্শের ভূমিকা থাকে। সেই ভাববিশেষের সূত্রেই জনসাধারণের মধ্যে ঐক্য গড়ে ওঠে। এক্ষেত্রে চরকা ভাবের সেই প্রতীকের কাজ করেছে। একে আশ্রয় করেই তখন একসূত্রে সহস্র সহস্র মন বাঁধা পড়েছে। চরকার এই প্রতীক-মূল্য তার বহিরঙ্গ ও যুক্তিতর্কনিষ্ঠ কায়িক শ্রমের মর্যাদার বা আর্থিক সুবিধার মূল্য থেকেও গুরুতর। রবীন্দ্রনাথ কবি হয়ে কর্মের সপক্ষতা করেছেন, আর গান্ধীজী কর্মী হয়েও চরকার মাধ্যমে ভাবেরই বিস্তার ঘটিয়েছেন, যার ফলে পুলিশী নির্যাতন এবং মৃত্যুবরণ করতে স্বাদেশিকদের উৎসাহ স্তিমিত হয়নি। তবু একথাও মনে না রাখলে নয় যে চরকার ভাবকেন্দ্র শেষ পর্যন্ত শিক্ষিত ভদ্র সাধারণের মধ্যেই আবর্তিত হয়েছে, কৃষক-শ্রমিকদের সুবৃহৎ পরিধি স্পর্শ করতে পারেনি, যার জন্য অসহযোগ কারাবরণ এবং কাউন্সিল প্রবেশ পরিত্যাগ প্রভৃতি নাটকীয় ঘটনাবলীর সঙ্গে সঙ্গে কৃষক ও শ্রমিক স্বার্থের রক্ষণকল্পে ভিন্নতর সংগঠনও স্বতই গড়ে উঠতে থাকে।

॥ তৃতীয় পর্ব ॥

অতঃপর রবীন্দ্র-স্বদেশ-চিন্তার তৃতীয় পর্বে আমরা এসে পড়ছি। এ পর্যায়ের প্রধান লক্ষণ য়ুরোপীয় ও তদনুসরণে ভারতীয় ধনতান্ত্রিকতার বিপক্ষে তাঁর প্রতিক্রিয়া এবং মেহনতী জনতার প্রতি তাঁর প্রবর্ধিত সহানুভূতি। এর পূর্ব পর্যায়ে তাঁর সংগ্রাম ছিল মুখ্যত সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার উপর, তারও পূর্বে সাম্রাজ্যবাদ ও বিলিতিয়ানার উপর। যদিও এ কথা ঠিক যে দ্বিতীয় পর্যায়েই অর্থাৎ প্রথম মহাযুদ্ধ থেকেই তিনি পশ্চিমের রাষ্ট্রপরিপুষ্ট ধনতান্ত্রিকতার স্বরূপ ক্রমান্বয়ে উপলব্ধি ক'রে আসছিলেন এবং তা তাঁর কাছে পরিস্ফুট হ'ল য়ুরোপ আমেরিকা পরিভ্রমণের পর, বিশেষভাবে, দীনবন্ধু এন্‌ড্রুজএর সাহচর্যে এবং রোমাঁ রোলাঁ প্রমুখ মনীষীদের সঙ্গে পরিচয়ের পর থেকে। এ বিষয়ে সাক্ষ্য পাওয়া যাচ্ছে তাঁর 'মুক্তধারা' ও 'রক্ত-করবী' রচনায় এবং প্রায় একই সময়ে এল্‌ম্‌হার্স্টের সহযোগিতায় সুরুলে নূতন ক'রে গ্রাম-সংগঠনের উদ্যোগে। 'মুক্তধারা'য় কবি যন্ত্রসহায় রাষ্ট্রিকতার অমানবীয়তা দেখালেন, 'রক্তকরবী'তে দেখালেন ধনতান্ত্রিকতার কারাগারে আবদ্ধ লক্ষ লক্ষ কৃষক-শ্রমিকের প্রাণহীনতা। সেই ১৯২২-২৪এ যখন এই দানবের পদক্ষেপ বিষয়ে আমরা নিশ্চেতন ছিলাম তখনই কবির সূক্ষ্ম অনুভূতি এবং মনীষীর মুক্তচৈতন্যে এবিষয়ে প্রতিক্রিয়ার সঞ্চার হয়েছে। স্বদেশের পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করলে দেখতে পাই

আমাদেব বর্তমান সংগ্রাম দুই অসুবের সঙ্গে। একটি সহস্রাধিক বৎসবের সামন্ত-তান্ত্রিকতা অর্থাৎ জাতিবর্ণ রাজা-প্রজা এবং তদনুযায়ী ভূমিব্যবস্থা ও জীবিকা, অন্যটি ধনতান্ত্রিকতা ও তদনুযায়ী সংগঠিত নব্য বুর্জোয়া মানসিকতা। ধরতে গেলে এ এক অদ্ভুত জটিল পরিস্থিতি। প্রথমটি বৃদ্ধ হয়ে পডেছে, তবু তাব নখদন্ত প্রায় তেমনি সক্রিয় বয়েছে এবং স্থাবব হয়েও জীবিত আছে সমাজের কাঁধে ভব দিয়ে। দ্বিতীয়টি তরুণ এবং প্রাগ্রসব। অর্থবিনিয়োগ, নিতান্ত স্বল্পমূল্যে শ্রমক্রয়ে বহুগুণিত অর্থেব সৃষ্টি, ভোগ্যপণ্যেব উপব সামূহিক অধিকাব নিযে এ ক্ষতবিক্ষত সাধাবণ জনকে নোতুন অস্ত্রাঘাতে মৃতপ্রায় ক'রে তুলেছে। এরই মধ্যে দুশ' বছরের সাম্রাজ্যবাদী পীডন কেটে গেল। রবীন্দ্রনাথেব উপলব্ধিমতে, ইংবেজ এসেছে—বোধ হয ইতিহাসেব অজ্ঞেয নিয়মেই এসেছে এবং চিবকালের জন্য আসেনি। কিন্তু আমবা যদি আত্মসংগঠনে শক্তি অর্জন না কবি, ইংবেজ গেলেই কি আমবা মহান্ জাতিব যোগ্য স্বাধীনতা পাব। অতএব হাজাব বছরের অস্থিমজ্জায় মিশ্রিত এই বোগ এই সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থাব বিরুদ্ধে লডাই ক'বে নিশ্চেতন সাধারণ মানুষের মধ্যে চেতনাব সঞ্চাব ঘটাতে হবে, উচ্চবর্ণেব সঙ্গে নিম্নবর্ণেব, হিন্দুর সঙ্গে মুসলমানেব বিভেদ ঘোচাতে হবে। সর্বাংশে আধুনিক বৈজ্ঞানিক শিক্ষায শক্তিশালী, শিল্পবাণিজ্যে ঐশ্বর্যবান্ সাহিত্যাদি শিল্পকলায় রুচিমান্ এবং মানবিক ধর্মে বলিষ্ঠ ভেদবুদ্ধিহীন মহাজাতিই তাঁব অভীপ্সিত ছিল। কাব্যে প্রবন্ধে ভাষণে ১৯০৮-১০ থেকে পনেরো বছব জাতির আভ্যন্তরীণ সংকীর্ণতাব বিরুদ্ধে লেখনী ধাবণ করাব পব কবি-মনীষী-কর্মী ঝুঁকলেন নবাগত ধনতান্ত্রিক বস্তুসঞ্চযেব বিপক্ষে। এখন থেকে গান্ধীজী প্রমুখ স্বাদেশিকদেব আন্দোলন-পদ্ধতি নিযে তাঁকে খুবই কম চিন্তিত হতে দেখা যায, বস্তুতপক্ষে যা ঘটছে তা অপ্রতিবোধ্য পবিশেষে এই বিবেচনায় তিনি বাজনীতিক দাবি-দাওয়া এবং তার সঙ্গে অনিবার্য ভাবে বিজডিত হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা প্রভৃতি ব্যাপাবে অনেকটা উদাসীন হয়েই পডেছিলেন এবং কাব্য ও নাট্যের মধ্যস্থতায় আন্তর্জাতিক ভাববিনিময়ে ও শ্রীনিকেতনে আয়োজিত কর্মযজ্ঞে তিনি নিজ আদর্শকে তুলে ধবাব প্রয়াস করতে লাগলেন।

১৯৩০এ রাশিযা পবিদর্শনের পব রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিকোণ ধনতান্ত্রিক শোষণেব দিকে নিবদ্ধ হয় এমন অভিমত ঠিক হবে না। কাবণ, তাব পূর্বেই তিনি এবিষযে অবহিত। হয়ত পুনরুক্তি হবে, তবু এব সাক্ষ্যপ্রমাণ হিসাবে এ সম্পর্কে তাঁর বেশ কিছু পূর্ববর্তী অভিমতেব কযেকটি স্থান তুলে ধবছি :

> "সম্প্রতি পৃথিবীতে বৈশ্যরাজক যুগেব পত্তন হইযাছে। বাণিজ্য এখন আর নিছক বাণিজ্য নহে, সাম্রাজ্যের সঙ্গে একদিন তার গান্ধর্ব বিবাহ ঘটিয়া

গেছে। এক সময়ে জিনিসই ছিল বৈশ্যের সম্পত্তি, এখন মানুষ তাব সম্পত্তি হইয়াছে।" (লডাইযের মূল—১৯১৫)

"কল-বাহন বাণিজ্য যেখানেই গেছে সেখানেই আপনার কালিমায় কদর্যতায় নির্মমতায একটা লোলুপতার মহামাবী সমস্ত পৃথিবীতে বিস্তীর্ণ কবে দিচ্ছে। তাই নিয়ে কাটাকাটি-হানাহানিব আব অন্ত নেই, তাই নিযে অসত্যে লোকালয কলঙ্কিত এবং রক্তপাতে ধবাতল পঙ্কিল হযে উঠল।"

"সেই খিদিবপুবের ঘাট থেকে আবম্ভ ক'বে আব এই হংকঙেব ঘাট পর্যন্ত বন্দবে বন্দবে বাণিজ্যের চেহাবা দেখে আসছি। সে যে কী প্রকাণ্ড এমন করে তাকে চোখে না দেখলে বোঝা যায না।……লোহাব হাত দিযে মুখে তুলছে, লোহাব দাঁত দিযে চিবচ্ছে, লোহাব পাকযন্ত্রে চিবপ্রদীপ্ত জঠবানলে হজম করছে এবং লোহাব শিরা-উপশিবাব ভিতব দিয়ে তাব জগৎজোডা কলেববেব সর্বত্র সোনার বক্তস্রোত চালান করে দিচ্ছে।· সে যে কেবলমাত্র থাবা থাবা জিনিস খাচ্ছে তা নয, সে মানুষ খাচ্ছে—স্ত্রী পুরুষ ছেলে কিছুই সে বিচাব কবে না।…মুনাফাব নেশায উন্মত্ত হযে এই বিশ্বব্যাপী দ্যূতক্রীডায মানুষ নিজেকে পণ রেখে কতদিন খেলা চালাবে? এ খেলা ভাঙতেই হবে।" (জাপান যাত্রী—১৯১৬)

"ইংরেজ-ধনী বাংলাদেশেব বক্ত-নিংডানো পাটেব বাজারের শতকবা চার-পাঁচশো টাকা মুনাফা শুষে নিয়েও যে দেশেব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যেব জন্য এক পযসাও ফিবিযে দেয না, তাব দুর্ভিক্ষে বন্যায মাবী-মডকে যার কডে আঙুলেব প্রান্তও বিচলিত হয না, যখন সেই শিক্ষাহীন স্বাস্থ্যহীন উপবাসক্লিষ্ট বাংলা-দেশেব বুকেব উপর পুলিশেব জাঁতা বসিযে বক্তচক্ষু কর্তৃপক্ষ কডা আইন পাস কবেন তখন সেই বিলাসী ধনী স্ফীত মুনাফাব উপর আবামেব আসন পেতে বাহবা দিতে থাকে—বলে 'এই তো পাকা চালে ভাবতশাসন'।"

"যে দুঃখের কথাটা বলছি এটা জগৎজুডে আজ ছডিয়ে পডেছে। আজ মুনাফার আড়ালে মানুষেব জ্যোতির্ময় সত্য রাহুগ্রস্ত। এই জন্যই মানুষের প্রতি কঠিন ব্যবহার কবা, তাকে বঞ্চনা কবা এত সহজ হ'ল। তাই পাশ্চাত্ত্যে পলিটিক্‌সই মানুষেব সকল চেষ্টাব সর্বোচ্চ চূডা দখল ক'রে বসেছে। অর্থাৎ মানুষেব ফুলে ওঠা পকেটেব তলায মানুষেব চুপসে যাওয়া হৃদয় পডেছে চাপা। সর্বভুক্‌ পেটুকতার এমন বিস্তৃত আয়োজন পৃথিবীব ইতিহাসে আর কোনোদিন এমন কুৎসিত আকারে দেখা দেয় নি।"

(পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি—১৯২৫)

"লোভী মানুষ কোথা থেকে জঞ্জাল জড়ো ক'রে সেইগুলোকে আগলে রাখবার জন্যে নিগড়বদ্ধ লক্ষ লক্ষ দাসকে দিয়ে প্রকাণ্ড সব ভাণ্ডার তৈরি ক'রে তুলছে। সেই ধ্বংসশাপগ্রস্ত ভাণ্ডারের কারাগারে জড়বস্তুপুঞ্জের অন্ধকারে বাসা বেঁধে সঞ্চয়গর্বের ঔদ্ধত্যে মহাকালকে কৃপণটা বিদ্রূপ করছে।" (ঐ—১৯২৪)

"বীভৎস সর্বভুক্ পেটুকতার উদ্যোগে পলিটিক্স্ নিয়ত ব্যস্ত। তার গাঁটকাটা ব্যবসায়ের পরিধি পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়েছে।" (ঐ—১৯২৫)

উপরের উদ্ধৃতিগুলি এবং এই মধ্যপর্যায়ের আরও নানান্ আলোচনা এবং পশ্চিমের উগ্র নেশন্-বাদএর তীব্র সমালোচনা প্রভৃতি থেকে বেশ বোঝা যায় যে রবীন্দ্রনাথ য়ুরোপের ধনতান্ত্রিকতার স্বরূপ ঠিকই অনুধাবন করেছিলেন, আর সে সময় ভারতীয় স্বাদেশিকদের কেউই ইংরেজ অধিকারের মূলীভূত ব্যাপারটি ঠিক এই ভাবে ধরতে পারেন নি, এমনকি এ বিষয়ে চিন্তাও করেন নি। কিন্তু দেখা যায় এর জন্যে তিনি দায়ী করছেন য়ুরোপীয় জাতিগুলির চারিত্র্যে লোভরিপুর প্রবলতাকে, যেমন তিনি সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশ লুণ্ঠনের জন্য দায়ী করেছেন উগ্র জাতীয়তাবাদ বা "ব্যূহবদ্ধ অহংকার ও স্বার্থপরতার চর্চা"কে। পশ্চিমী রাষ্ট্রিকতার সঙ্গে ধনতান্ত্রিকতার গান্ধর্ব-বিবাহ হয়ে গেছে—এরকম মন্তব্যে তিনি ধনতন্ত্রকে বা সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রকে ইতিহাসসম্মত দৃষ্টিতে যদি বা দেখেছেন, তবু নৈতিক পতনকে বা চরিত্রকেই এসবের মূল কারণ ব'লে শেষ পর্যন্ত মনে করেছেন। এই অতিলোভজাত বর্বরতার বিনিপাত কামনা করেছেন মহাভারতের একটি বচন মাঝে মাঝে উদ্ধৃত ক'রে—

অধর্মেণৈধতে তাবৎ ততো ভদ্রাণি পশ্যতি।
ততঃ সপত্নান্ জয়তি সমূলস্তু বিনশ্যতি॥

অর্থাৎ অধর্ম অবলম্বন ক'রে সে বেড়ে ওঠে, অধর্মের সাহায্যেই তার ভালো হবে এমন মনে করে, অধর্ম অন্যায় আচরণের দ্বারা সে তার অভ্যুদয়ের বিরোধী শত্রুদের জয়ও করে, কিন্তু পরিণামে সমূলে বিনাশ পেয়ে থাকে। হয়ত বা এরকম নৈতিক ধারণা নিয়ে যুদ্ধারম্ভের সমকালীন 'শান্তিনিকেতন' ভাষণে এই যুদ্ধকে তিনি অভিনন্দিত করেছেন। ধনতান্ত্রিকতার কুফল উপলব্ধি করার মধ্যেও এই ধরনের নৈতিকতা বা আদর্শবোধের মিশ্রণ রবীন্দ্র-চিন্তার দ্বিতীয় পর্যায়ের বৈশিষ্ট্য, যদিচ এমনও বলা যায় যে, এই পর্যায়ের শেষের দিকেই অর্থাৎ ১৯২৪-২৫ খ্রীঃ তিনি এই বাস্তব পরিস্থিতিকে কিছুটা বৈজ্ঞানিক ভাবেও গ্রহণ করার অভিলাষী। এই দ্বিতীয় পর্যায়ে আরও দেখা যায়, মুনাফা-লোভের ফলে উদ্ভূত মানুষের দুর্বিপাক লক্ষ্য করলেও এবং অতি-লাভকে ঘৃণার চোখে দেখলেও নীতির দিক থেকে ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তি অর্জনের

অবকাশকে মান্য করেছেন, যেমন 'জমির স্বত্ব ন্যায়তঃ চাষীব' 'জমিদাব parasite মাত্র' এ তত্ত্ব স্বীকার ক'বেও প্রজাকল্যাণের জন্য সাময়িকভাবে জমিদারের প্রয়োজনও স্বীকাব করেছেন। সামন্ততান্ত্রিক বা ধনতান্ত্রিক এবকম পবিস্থিতির বিরুদ্ধে তাঁর প্রত্যক্ষ সংগ্রামেব পন্থা হ'ল সমবায-কেন্দ্রিক গ্রামসংগঠন। ঐ সংগ্রামে বিকৃত ধর্মতন্ত্রেব সহায়তায জনশোষণের মূলে আঘাত পডত এবং শিক্ষাব বিস্তারে জনচেতনা জাগ্রত হলে নোতুন সমাজ-নিযমেব চর্যায অভ্যস্ত সমাজে-বাষ্ট্রে ধনতান্ত্রিকতাব প্রসারও হযত সম্ভব হ'ত না। এ পথে সাফল্য হ'ত কিনা তা নিযে বিতর্ক কবা যেতে পারে, কিন্তু ববীন্দ্রনাথ সাম্রাজ্যবাদ ও শোষণেব বিরুদ্ধে নিশ্চেষ্ট বইলেন এমন মনে কবা যায না। কৃষক-সংগঠন ও গ্রামসংগঠনেব বিষযে আজ আমাদেব মনোযোগ আকৃষ্ট হচ্ছে কেন? যাই হোক, এখন তৃতীয পর্বেব সমীক্ষায় আসা যাক।

এ সম্বন্ধে কোন সংশয় নেই যে রুশ বিপ্লবের অভিঘাত বিষযে ইংবেজ সবকাবের সতর্ক নিষেধ সত্ত্বেও এই শোষিত সর্বহাবাব দেশ একেবাবে নিশ্চেতন ছিল না। অসহযোগ আন্দোলনেব প্রবল উচ্ছ্বাস মন্দীভূত হতেই কষক ও শ্রমিকদেব বিশিষ্ট দাবী-দাওযা নিযে কযেকটি সংগঠন গ'ডে উঠতে থাকে কংগ্রেস বেদীকে আশ্রয ক'বেই। কিছুকালেব মধ্যেই অপেক্ষাকৃত স্বাধীন সত্তা নিযে বিপ্লবী দৃষ্টিকোণ অবলম্বন ক'বে ভাবতীয় কম্যুনিস্ট পার্টিও জন্ম নেয। বাঙ্‌লায 'লাঙল', 'গণবাণী' 'নবযুগ' প্রভৃতি পত্রিকাব মধ্যস্থতায বিপ্লবমূলক সাম্যবাদ সোচ্চাব হযে ওঠে। এদিকে স্ববাজ্যদল এবং স্ববাজ্য-বিবোধী দলেব মধ্যে মতান্তব ও আপোষ, গান্ধীজীর চবকা ও অস্পৃশ্যতা-নিবাবণেব উপব জোর দিযে সংগঠনেব আহ্বান, গুপ্ত স্বদেশী, বেঙ্গল-অর্ডিন্যান্‌স্-বলে গণজাগবণ স্তব্ধ করাব জন্য শাসকদের প্রয়াস, এবং হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কেব ক্রমবর্ধমান অবনতি দেশকে সমস্যা-কণ্টকিত ক'বে তোলে। স্বাদেশিক আন্দোলন এবং বাজনীতিমূলক সংগঠন বিষযে রবীন্দ্রনাথ উদাসীন হয়ে পডলেও দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতি নিযে উদ্বেগবোধ এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রবন্ধে ও চিঠিপত্রে কার্যকর হস্তক্ষেপ যে করেন নি এমন কিন্তু নয়। এব মধ্যে দুটি বিষয় তাঁব গভীব উদ্বেগেব কাবণ হযেছিল দেখতে পাই। এক, হিন্দু-মুসলমান বিবোধ এবং দুই, কৃষকদেব দুর্গতি। দুটি ব্যাপাবই পুবাতন অথচ স্থায়ী রোগবিশেষ, সেজন্য পূর্বেকার মত একালেও ববীন্দ্রনাথেব চিন্তাব বিষয। দাঙ্গায কলঙ্কিত এবং হৃতগৌবব হিন্দু-মুসলমানের জন্য তাঁব একালেব উদ্বেগ 'কালান্তবে' মুদ্রিত কয়েকটি প্রবন্ধে ও পত্রে লিপিবদ্ধ হয়েছে তা পূর্বেই আমবা দেখেছি। নবজাগবিত কৃষকাশ্রযী আন্দোলনের প্রত্যক্ষ ফল যে প্রমথ চৌধুবী মহাশয়েব 'বাযতের কথা' প্রবন্ধ এবং রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক তার পাদপূবণ, তাতে সন্দেহ নেই। ববীন্দ্রনাথের লেখার মধ্যেই তাব পবিচয়

বযেছে। প্রবন্ধটিব প্রথমে মাটিব আশ্রযহীন প্রচলিত স্বদেশীয়ানাকে রবীন্দ্রনাথ তীব্রভাবে আক্রমণ করেছেন, আর মাঝখানে আক্রমণ কবেছেন সদ্য-আবির্ভূত কৃষক-সহানুভূতিশীল বিপ্লবেব আহ্বায়ক বুর্জোয়াদের। স্বল্পজমির কৃষকদেব উপব রবীন্দ্রনাথের সহানুভূতি এবং কার্যকব ব্যবস্থা ইতিমধ্যেই ঐতিহাসিক হয়ে পডেছে, কিন্তু 'বাযতেব কথা'য তিনি জমিদারি তুলে দেওয়াব মত অবাস্তব এবং কৃষকস্বার্থবিরোধী ব্যবস্থাব সমর্থন জানালেন না। বোধ হয়, প্রজাস্বত্ব সংরক্ষণেব পাকা ব্যবস্থা হ'লে তবেই এই অবাঞ্ছিত দায়িত্ব থেকে মুক্তি পাওয়া যেতে পারে এই তাঁব অভিমত ছিল। যাই হোক, প্রমথ চৌধুবী মশাযেব 'রায়তেব কথা' এবং রবীন্দ্রনাথেব প্রতিধ্বনিব পটভূমি হ'ল কৃষক সম্পর্কে নব্য স্বাদেশিকদেব সদ্য-উদ্ভিন্ন চৈতন্য, প্রথম বামপন্থী জাগবণ। প্রথম জোযার তটপ্রান্তে রূঢভাবেই আঘাত হানতে চায, সেইজন্যই 'পিষে ফেল' 'দলে ফেল' প্রভৃতি ভাষায প্রকাশ, যা ববীন্দ্রনাথের কাছে যুবোপীয স্থূলতার নকলনবিশি ব'লে প্রতিভাত হযেছিল। কিন্তু মজার কথা এই যে এই বামপন্থী মনোভাবেব পুবোবর্তী ও প্রধান প্রবক্তা রবীন্দ্রনাথ নিজেই। ১৯২৩-২৪এ লেখা 'বক্তকববী' ধনতান্ত্রিকতাব বিরুদ্ধে কবিব বিদ্রোহের অবিসংবাদী দলিল। একই সময়ে লেখা ক্ষুদ্রকায় 'বথযাত্রা' নাটকেও তিনি দাবী জানিযেছেন লাঞ্ছিত ও নিপীডিত মানুষকে বাষ্ট্রে ও সমাজে স্বাধিকাব দিতে। কেবল অস্পৃশ্যতা নিবাবিত হলেই এই শোষিত শ্রেণী তাব পূর্ণ গণতান্ত্রিক অধিকাব পাবে, এ ববীন্দ্রনাথ বিশ্বাস কবতেন না। তিনি বিশ্বাস কবতেন এই শ্রেণীকে দাবি জানিয়েই অর্থনীতিক ও সামাজিক স্বাধিকার আয়ত্ত কবতে হবে। সেই দাবি জানাবাব শক্তি আসবে শিক্ষা থেকে। রক্তকরবীরও পূর্বে 'মুক্তধাবা'য ববীন্দ্রনাথ যে প্রজাবিদ্রোহেব ছবি এঁকেছেন তাও সামগ্রিক অধিকাবেবই দাবি। সুতরাং এদেশে আধুনিক বামপন্থী মনোভাবেব উদ্বোধক হিসেবেও ববীন্দ্রনাথকে দেখা যায়। যদিও একথা ঠিক যে সশস্ত্র সংগ্রামেব সাহায্যে বিপ্লব এবং ইতিহাসানুগত শ্রেণী-সংঘাতের পোষক তিনি হতে পারেননি, অথবা বোধহয এমন কথা বলাই ভালো যে তিনি রাজনীতিক বিপ্লবেব সমর্থক ছিলেন কিনা এ নিযে বিতর্কের অবকাশ যথেষ্ট রয়েছে। কারণ, একদিকে যেমন তিনি 'অচলায়তনে' ম্লেচ্ছ ও নিম্নবর্ণের সঙ্গে উচ্চবর্ণের হিন্দুর রক্তের মিলন ঘটালেন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এবং 'রক্তকরবী'তে শ্রমিক-বিপ্লব দেখালেন, বহু কবিতায় ও গানে প্রত্যক্ষে-পরোক্ষে বাস্তব সংগ্রামের আহ্বান জানালেন, এমন কি মহাযুদ্ধকালীন ভাষণেও ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে যুদ্ধের সমর্থন করলেন, তেমনি অন্যপক্ষে তিনিই আবার সমবায়-চিন্তায়, 'কালান্তর' ও 'পল্লী-প্রকৃতিতে' পশ্চিমা আদর্শের 'মারামারি কাটাকাটি'র কোথাও কোথাও বিরুদ্ধতাও করলেন। যেমন রাজনীতিক গুপ্তহত্যার অসমর্থন প্রকাশ করলেন, তেমনি এর অন্তর্নিহিত

বীবত্বের প্রশংসাও করলেন। মানবধর্মের উপর নির্ভর রেখেও সংশয় প্রকাশ করলেন বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে এরকম সংশয়িত বিতর্কের ক্ষেত্রে আমরা যে সমাধান উপলব্ধি কবেছি তা হ'ল—রাষ্ট্রিক, সামাজিক, ধনতান্ত্রিক শোষণকে বা দুর্বলেব উপর বলবানেব আক্রমণকে রবীন্দ্রনাথ অন্যায় অধর্ম বলেই মনে করেছেন, এবং সমবায়মূলক কর্ম, অন্যবিধ সংগঠন, আন্তর্জাতিক প্রতিবাদ প্রভৃতিব আশ্রয়ে এব প্রতিবিধান নিষ্ফল হ'লে বীবত্বময় প্রত্যক্ষ সংগ্রামই বরণীয় ব'লে মনে কবেছেন।

সামন্ততান্ত্রিক সমাজস্থিতিব বিপক্ষে লেখনীধাবণেব পর বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে ববীন্দ্রনাথ যে সব কাবণে ধনতান্ত্রিকতাকে প্রতিপক্ষ ক'বে নোতুন সংগ্রামে অবতীর্ণ হলেন তা মোটামুটি এইবকম—(১) যুদ্ধাবম্ভে ও যুদ্ধান্তে জাপান, আমেরিকা ও যুবোপ পরিভ্রমণ, (২) রোমাঁ রোলাঁ প্রমুখ যুবোপেব প্রগতিশীল মনীষীদেব সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ও তাঁদেব সমাজতান্ত্রিক সংগঠনের দিকে কবির আকর্ষণ, (৩) স্বদেশে শিল্প-প্রসাবে আমেরিকাব ধনতান্ত্রিকতাব অন্ধ অনুসবণ এবং (৪) ধনতান্ত্রিক শোষণ বিষযে অবহিত এনড্রুজেব সাহচর্য। গান্ধীজীর ত্যাগ ও মানবপ্রেমে ববীন্দ্রনাথ মুগ্ধ হলেও বোমাঁ বোলাঁব ভাবাদর্শ ও কর্মপ্রণালীই ববীন্দ্রনাথকে কার্যকবভাবে প্রভাবিত কবে। অথবা স্বকীয মুক্তবুদ্ধিতে ববীন্দ্রনাথ যা পর্যবেক্ষণ ও সিদ্ধান্ত কবেছিলেন তাব সঙ্গে বোমাঁ বোলাঁব সিদ্ধান্তের মিল ঘটেছিল বহুলাংশে। সাম্রাজ্যবাদীদেব যুদ্ধ ও পবজাতি-শোষণেব স্বরূপ ববীন্দ্রনাথ বহু পূর্ব থেকেই উপলব্ধি ক'বে আসছিলেন, রোমাঁ রোলাঁব সংস্পর্শে এসে ধনতান্ত্রিকতা সহ এর পূর্ণাঙ্গ পবিচয তিনি পেলেন একথা বলা যায়।

ববীন্দ্রনাথ কর্তৃক সমবাযের প্রবল সপক্ষতা এবং মাটি, কৃষি ও শোষিত সামান্য-জনেব প্রতি ক্রমবর্ধিত পক্ষপাত তাঁব নূতন অর্থনীতিক দীক্ষাব ফল বলেই মনে কবি। তবে তা আমাদেব দেশ ও সমাজের পটভূমিতে, য়ুরোপেব বা রুশ বিপ্লবের আদর্শে প্রচলিত অবস্থাকে একেবাবে বিপর্যস্ত না ক'রে এবং ধনেব ব্যক্তিগত অধিকারকে বক্ষা ক'বে অথচ খর্ব ক'বে। তা হোক, এবং খাঁটি সমাজতান্ত্রিক অধ্যয়ন ররীন্দ্র-ভাবনাব মধ্যে যে অসংগতিই আবিষ্কাব করুক, তাঁর উদ্দেশ্য নিয়ে কোনো সংশয়েব অবকাশ নেই, এবং তিনি যে এ সমাজে জীবজন্তুব চেয়েও অবহেলিত মানুষকে বাঁচার অধিকার দেওয়াব জন্য সংগ্রাম করেছেন এ-ও দিবালোকেব চেয়ে স্পষ্ট। রবীন্দ্রনাথ ধনতন্ত্রকে সমর্থন করেননি-যে তার কারণ কিছুটা নৈতিক, কিছুটা ব্যাবহারিক, আর তাঁব চিন্তায় এই নৈতিকতাব স্পর্শ থাকাব জন্যেই তিনি শ্রেণী-পার্থক্যকে ঘৃণা ক'রেও শ্রেণী-সংঘাতের রক্তক্ষয়ী সমাধান সর্বত্র নির্দেশ কবেন নি। অবশ্যম্ভাবী বিপ্লব সম্পর্কে সতর্ক ক'বে পূর্বাহ্নে তার নিবারণকল্পে হিন্দু-মুসলমান শোষিত শ্রেণীকে শিক্ষায় ও সম্পদে বলীয়ান্ করার পরামর্শ দিয়েছেন। যেমন—

"পৃথিবীর প্রায় সকল সমাজেই একটা জায়গায় এই বাধা ঘটে। সে হচ্ছে অর্থোপার্জনেব কাজে। এইখানে মানুষের লোভ তার সামাজিক শুভবুদ্ধিকে ছাড়িয়ে চলে যায়। ধনে বা শক্তিতে অন্যের চেয়ে আমি বড হব, এই কথা যেথানেই মানুষ বলেছে সেইখানেই মানুষ নিজেকে আঘাত করেছে। ··ধনীব উপবে ববাবর এই একটি ধর্ম উপদেশ চ'লে আসছে যে, তুমি দান করবে। তার মানেই হচ্ছে ধর্ম এবং বিদ্যা প্রভৃতিব ন্যায় ধনেও কল্যাণেব দাবি খাটে, না খাটাই অধর্ম। কল্যাণের দাবি হচ্ছে স্বার্থের দাবিব বিপরীত এবং স্বার্থেব দাবিব চেযে তা উপবেব জিনিস। দানেব যে উপদেশ আছে তাতে ধনীর স্বার্থকে সাধাবণের কল্যাণের সঙ্গে জডিত কববাব চেষ্টা করা হযেছে বটে, কিন্তু কল্যাণকে স্বার্থেব অনুবর্তী কবা হয়েছে, তাকে পুবোবর্তী কবা হয় নি। সেইজন্য দানেব দ্বাবা দাবিদ্র্য দূব না হযে তা পাকা হযে ওঠে।

"ধর্মেব উপদেশ ব্যর্থ হযেছে ব'লেই, সকল সমাজে ধন ও দৈন্যেব দ্বন্দ্ব একান্ত হযে বযেছে বলেই, যাঁবা এই অকল্যাণকব ভেদকে সমাজ থেকে দূব কবতে চান তাঁদেব অনেকেই.জববদস্তিব দ্বাবা লক্ষ্যসাধন কবতে চান। তাঁবা দস্যুবৃত্তি ক'বে, বক্তপাত ক'বে, ধনীর ধন অপহবণ ক'বে সমাজে আর্থিক সাম্য স্থাপন কবতে চেষ্টা কবেন। এ সমস্ত চেষ্টা বর্তমান যুগে পশ্চিম মহাদেশে প্রায় দেখতে পাওযা যায। ···জনসাধাবণ যদি নিজেব অর্জন-শক্তিকে একত্র মেলাবাব উদ্যোগ করে তবে এই কথাটা স্পষ্ট দেখিয়ে দিতে পাবে যে, যে মূলধনেব মূল সকলেব মধ্যে তাব মূল্য ব্যক্তিবিশেষেব মূলধনেব চেয়ে অসীমগুণে বেশি। এইটি দেখাতে পাবলেই তবে মূলধনকে নিবস্ত কবা যায, অস্ত্রেব জোবে কবা যায না। মানুষেব মনে ধনভোগ কবাব ইচ্ছা আছে, সেই ইচ্ছাকে কৃত্রিম উপাযে দলন ক'বে মেরে ফেলা যায় না। সেই ইচ্ছাকে বিরাটভাবে সার্থক কবাব দ্বাবাই তাকে তার সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত করা যেতে পাবে। · কিন্তু যেখানে মূলধন ও মজুবির মধ্যে অত্যন্ত ভেদ আছে সেখানে ডিমক্র্যাসি পদে পদে প্রতিহত হতে বাধ্য। তাই যুনাইটেড স্টেটস্‌-এ বাষ্ট্রচালনার মধ্যে ধনেব শাসনেব পদে পদে পবিচয় পাওয়া যায। টাকাব জোবে সেখানে লোকমত তৈরি হয়, টাকাব দৌরাত্ম্যে সেখানে ধনীর স্বার্থেব সর্বপ্রকাব প্রতিকূলতা দলিত হয।
('সমবায' ২য়)

নে কবি মূলধনিকদের উপর নৈতিক ও ব্যবহারিক দুদিক থেকেই বিতৃষ্ণা য়েছেন। কিন্তু একটা কথা; গায়ের জোরে মূলধন বা means of produc-

tionকে লোকায়ত্ত করার চেয়ে সমবায়ের সাহায্যে মূলধনিকদের সঙ্গে উৎপাদন বিষয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তিনি লোকায়ত সম্পদেব বিজয় ঘোষণা করেছেন। কিন্তু কেমন ক'বে তা হতে পারে যদি বাষ্ট্র প্রতিকূল হয় এ প্রশ্নটা এব মধ্যে থেকে যাচ্ছে—একথা আমবা পূর্বেই বলেছি। আব যদি বাষ্ট্রই লোকায়ত হয, ধনতান্ত্রিকতাব অনুগত ভৃত্য না হয, তাহ'লে ধনতান্ত্রিকতাব প্রসাবেব তো কোনো প্রশ্নই উঠতে পাবে না। তাহ'লে প্রতিকূল অবস্থায প্রকৃত ডেমোক্র্যাসিব প্রতিষ্ঠায বিপ্লব বা coup d'étatই কি প্রাথমিক প্রযোজন নয় ? যদি বলা যায যে পক্ষপাতহীন কোনো বাষ্ট্রে ধনতান্ত্রিকতাও থাকবে সমবাযতান্ত্রিকতাও থাকবে তাহ'লে অত্যন্ত বিরুদ্ধ ব্যাপাবই হতে হয এবং এই বিরুদ্ধতাব পবিণাম ধনতান্ত্রিকতাব দ্বাবা সমবাযেব পূর্ণগ্রাস। বর্তমান ভাবতে মিশ্র অর্থনীতিব পবীক্ষায প্রত্যাশিত সুফল যে ফলছে না এ বিষয়ে বোধ হয় আমবা-সকলেই একমত। মৌলিক শিল্পগুলিকে বাষ্ট্রায়ত্ত কবাব দাবি সেইজন্য প্রবল হয়ে উঠেছে। তা ছাডা দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখতে হবে সোভিয়েট দেশে লক্ষ্মীকৃপাবঞ্চিত সাধাবণ জনেব লক্ষ্মীলাভ সমবায অবলম্বনে সম্ভব হয়েছিল, কিন্তু তা বাষ্ট্রক্ষমতা দখলেব আগে নয, কায়েমি স্বার্থেব অনন্যসহাযকে দূব ক'বে তবেই। এ তত্ত্ব ববীন্দ্রনাথ বুঝবেন না এমন নয। কিন্তু তবু যে তিনি শোষক বন্ধু বাষ্ট্রেব স্বরূপ বিম্বিত না ক'বেই (যেমন তিনি স্বদেশী আন্দোলনের সময আন্দোলনের দ্বাবা প্রথমে বিদেশী শাসকদের বিতাডিত কবার সপক্ষতা কবেন নি) সমবায় অবলম্বনে দবিদ্রেব অর্থনীতিক উন্নতি কল্পনা কবেছেন তার কাবণও স্পষ্ট। যুবোপীয ধাঁচেব কোনো বাষ্ট্রপদ্ধতিই তাঁব কাম্য-ছিল না। বাষ্ট্রেব স্থানে তিনি আদর্শ 'সমাজ'কে অভিষিক্ত করতে চেয়েছিলেন। আমরা পূর্বেই দেখেছি তাঁব এই সমাজেব-আকৃতি-প্রকৃতি ভাবতীয বা পূর্বেকাব চীনীয় সমাজেরই আধুনিক সংস্করণ। যুরোপীয় রাষ্ট্রপদ্ধতিব উপব তাঁর তীব্র বিতৃষ্ণা 'Nationalism'-এব ভাষণগুলিতে এবং অন্যত্র পরিস্ফুট। আর তাঁর সমবায়নীতি বিচ্ছিন্ন কোনো ব্যাপাব নয়, তা ঐ সমাজ-সংগঠনেরই অংশ মাত্র। রবীন্দ্রনাথ বোধ হয় চিন্তা কবেছিলেন যে বাষ্ট্রের প্রকৃতি যেমনই হোক না কেন, অর্থাৎ তা যদি শোষকসহায় শাসক গোষ্ঠীর উদ্ভাবিত যন্ত্রমাত্রও হয়, সমাজ বলবান্ হয়ে উঠলে তা অনায়াসেই সরে যেতে বাধ্য হবে। আমরা পূর্বেই দেখেছি রবীন্দ্র-নির্দেশিত সমাজে পুলিশী শাসনের কোনো স্থান নেই। 'আমরা নই বাঁধা নই দাসের রাজার ত্রাসের দাসত্বে।' এরকম ক্ষেত্রে আবও একটি প্রশ্ন অনিবার্যভাবেই এসে পড়ে। রবীন্দ্রনাথ কি তাহ'লে লেনিন্ এর মত ক্রমে withering away of the state-এর ধারণায় এসে পড়েন ? কারণ, যার জন্য state-এব প্রয়োজন তা লেনিন্-এর অভীষ্ট সমাজে থাকছে না, রবীন্দ্রনাথেরও নয়। তবু দেখা যায়, একেবারে পূর্ণাঙ্গ কম্যুনিজ্ম্ এর

অভিব্যক্তিতে সমাজ ও ব্যক্তির চাওয়া-পাওয়া যেমন নির্দ্বন্দ্ব হয়ে মিলে যাচ্ছে, ব্যক্তি-বিশেষেব যোগ্যতা বা শক্তির উৎকর্ষের ক্ষেত্রেও সামাজিক প্রয়োজনগত সাম্য বিঘ্নিত হচ্ছে না, রবীন্দ্রানুমত সমাজে ততদূর হচ্ছে কিনা সন্দেহ। কাবণ, ধনসম্পদের ব্যক্তি-গত মালিকানার বোধকে নীতিগতভাবে অস্বীকার কবাব প্রযোজন এ সমাজ স্বীকার করছে না। এসব বিষয়ে ববীন্দ্রনাথ ধর্মনীতিব উপব একটু বেশি জোব দিযেছেন (অবশ্য, গান্ধীজীব 'অছি'তত্ত্বে যেমন পুবোপুবি ধর্মনীতিব উপব নির্ভর কবা হয়েছে, ববীন্দ্রক্ষেত্রে তেমন নয়)। ববীন্দ্রনাথ মনে কবতেন সংস্কৃতির বিকাশের প্রযোজনে ব্যক্তিগত প্রাপ্তি ও সঞ্চয় সাহাযা করবে। এবং দেশ সামাজিক শাসনের অন্তর্গত হ'লেও বৈচিত্র্য বিভেদ অর্থাৎ স্ব স্ব পথে ব্যক্তিব বিকাশ স্বীকাব কবতেই হবে, আব শাসন যেন এমন না হয যাতে ব্যক্তি নিজকে বিদলিত মনে কবতে পাবে। ব্যক্তিব স্পর্ধাকে নিয়ন্ত্রিত কবাব কথা ববীন্দ্রনাথ বলেছেন, কিন্তু তাঁব সমাজ-কল্পনায এমন কোনো নির্দেশ নেই যাতে ব্যক্তিব বিকাশ ব্যাহত না হয অথচ তাব চাহিদাব সঙ্গে সামাজিক প্রয়োজনেব সম্পূর্ণ মিল থাকে। তাছাড়া ববীন্দ্রনাথ সমাজপতি প্রভৃতিব নির্বাচনে চাবিত্রিক আদর্শেব উপবেও বিশেষ জোব দিয়েছেন। ফলতঃ তাঁব আদর্শ সমাজ কিছুটা প্লেটনিক হযেও পড়েছে।

খুঁটিনাটি পর্যালোচনায ববীন্দ্রনাথকে বৈজ্ঞানিকভাবে সমাজতন্ত্রবাদী স্বীকাব না কবা গেলেও তাঁব চিন্তায সমাজতন্ত্রেব উপকবণ যে প্রচুর বযেছে তা অস্বীকাব করাব উপায নেই। আমবা সেই হিসেবেই ববীন্দ্রনাথকে দেখছি, কাল দেশ পবিবেশ মূল ব্যক্তিত্ব প্রভৃতিব পটভূমিতে তাঁব সমাজমুখী মানসপ্রকৃতিব ও কর্মধাবাব যে পবিচয আমরা পাচ্ছি তা-ই আমাদেব কাছে অপ্রত্যাশিত বিস্ময়কব, এবং বর্তমান গ্রন্থ বহুল পরিমাণে সেই বিস্ময়েব দ্বাবাই অনুপ্রাণিত।

এখন ধনতান্ত্রিকতাব প্রসাববোধে ববীন্দ্র-বক্তব্য শোনা যাক। 'সমবায়' বিষয়ে পূর্বেও আমবা উল্লেখ কবেছি। বর্তমানে ধনতন্ত্র ও শ্রেণী-পার্থক্যেব বিষযে ববীন্দ্রনাথের সচেতনতার ভিত্তিতে তাঁব প্রতিক্রিয়া দেখা যেতে পাবে। এ বিষয়ে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ হ'ল 'সমবায় নীতি', ১৯২৮এ লেখা। প্রবন্ধটিব বক্তব্য হ'ল মুষ্টিমেয়ের হাতে পুঞ্জীভূত ধনসম্পদ সমাজে যে অসাম্য নিয়ে আসে এবং বহুলাংশের দুঃখদুর্বিপাকেব কারণ হয়, তাব সহজ প্রতিকার হ'ল পূর্বাহ্লেই সমবায পদ্ধতিতে ধনের অর্জন ও বিভাগ। ভাবতবর্ষে ধনতান্ত্রিকতা যেহেতু তেমন প্রবল নয়, সেইহেতু সমবাযের প্রতিকূলতার ক্ষেত্রও সীমিত। অতএব, এখনই প্রতিষেধক পন্থা অবলম্বনীয়। প্রবন্ধটিতে য়ুরোপীয় ধনতন্ত্র সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথেব সচেতনতা লক্ষণীয়। অত্যন্ত সহজ ভাষায় তিনি এর মূল স্বরূপ প্রায় যথাযথভাবেই বর্ণনা করেছেন। যেমন,—

"আজকালকার দিনে অর্থশক্তি বিশেষ ধনীসম্প্রদায়ের মুঠোর মধ্যে আটকা পড়েছে। তাতে অল্পলোকের প্রতাপ ও অনেক লোকের দুঃখ। অথচ বহুলোকের কর্মশক্তিকে নিজের হাতে সংগ্রহ করে নিতে পেরেছে বলেই ধনবানের প্রভাব। তার মূলধনের মানেই হচ্ছে বহু লোকের কর্মশ্রম তার টাকার মধ্যে রূপক মূর্তি নিয়ে আছে। সেই কর্মশ্রমই হচ্ছে সত্যকার মূলধন, এই কর্মশ্রমই প্রত্যক্ষভাবে আছে শ্রমিকদের প্রত্যেকের মধ্যে।"

রবীন্দ্রনাথ বলছেন, পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে শ্রমিকেরা এই শ্রম যদি নিজেদের মধ্যে একত্রিত ক'রে মেলায় তাহ'লেই অর্জিত ধন সকলের মধ্যে বিভক্ত হয়ে ছড়িয়ে পড়ে। এইভাবে মূলধনিকদের ভাগে সস্তাদরে যেমন খুশী শ্রম কিনে নেওয়ার উপায় থাকে না, তাদের কারবার গুটোতে হয়। এই পদ্ধতির সুবিধা এই যে এতে কোন রক্তপাতের প্রয়োজন হয় না। আমরা পূর্বেই বলেছি, সীমিত আকারে সমবায়ের দ্বারা নির্ধনের কোনো উপকার হয় না এমন নয়। কিন্তু সার্থকনামা পূর্ণাঙ্গ সমবায়ের জন্য রাষ্ট্রের আনুকূল্য অবশ্য প্রয়োজন। প্রবন্ধটিতে রবীন্দ্রনাথ আর একটি উল্লেখযোগ্য কথা আমাদের শুনিয়েছেন। তা হ'ল আধুনিক বিজ্ঞান-নির্ভর যান্ত্রিক শিল্পের সমর্থন। এই অংশে তিনি গান্ধীজীর অনাধুনিক প্রগতি-বিরোধী চিন্তার প্রতিবাদই করেছেন, যেমন করেছেন পূর্বে তাঁর 'চরকা' 'স্বরাজ সাধন' প্রভৃতি প্রবন্ধে—

"কেউ কেউ বলেন, মানুষের ব্যবহার থেকে যন্ত্রগুলোকে একেবারে নির্বাসিত করলে তবে আপদ মেটে। একথা একেবারেই অশ্রদ্ধেয়।... ...এ কথা মাঝে মাঝে শোনা যায় যেরকম নিতান্ত স্বল্পোপকরণ ছিল তেমনি আবার যদি হতে পারে তাহ'লে দারিদ্র্যের গোড়া কাটা যায়। তার মানে, সম্পূর্ণ অধঃপাত হলে আর পতনের সম্ভাবনা থাকে না। কিন্তু তাকে পরিত্রাণ বলে না।.... ইতিহাসে দেখা গেছে কোনো কোনো জাতের মানুষ নূতন সৃষ্টির পথে এগিয়ে না গিয়ে পুরানো সঞ্চয়ের দিকেই উল্টো মুখ করে স্থাণু হয়ে বসে আছে, তারা মৃতের চেয়ে খারাপ, তারা জীবন্মৃত। এ কথা সত্য, মৃতের খরচ নাই। কিন্তু তাই ব'লে কে বলবে, মৃত্যুই দারিদ্র্যসমস্যার ভালো সমাধান? ... কিন্তু যে-প্রয়োজনে রেড়িতেলের প্রদীপ একদিন সন্ধ্যাবেলায় জ্বালাতে হয়েছে সেই প্রয়োজনেরই উৎকর্ষ-সাধনের জন্য বিজলি-বাতি। আজ একে যদি ব্যবহার করি তবে সেটা বিলাস নয়, যদি না করি, সেটাই দারিদ্র্য।.... যে মানুষ সেদিন গোরুর গাড়িতে চলেছিল সে যদি আজ মোটর গাড়িতে না চড়ে তবে তাতে তার দৈন্যই প্রকাশ পায়। যা

এক কালেব সম্পদ তাই আরেক কালের দারিদ্র্য। সেই দারিদ্র্যে ফিরে যাওয়াব দ্বারা দাবিদ্র্যেব নিবৃত্তি শক্তিহীন কাপুরুষেব কথা।”

ববীন্দ্রনাথ আধুনিক শিল্পে-বিজ্ঞানে ভারতেব পূর্ণাঙ্গ দীক্ষা চান, এরই সহায়তায় দাবিদ্র্যেব বিনাশ চান, অথচ মুনাফালোভীদের মুনাফাকে নিবস্ত কবতে চান।

ধনতান্ত্রিকতাব বিরুদ্ধে বক্তকরবীতে ববীন্দ্রনাথ শ্রমিক-বিপ্লব দেখিয়েছেন ঠিকই, কিন্তু তাব সঙ্গে ধনতন্ত্রেব আত্মবিপ্লবও যোগ কবেছেন। এতে এই মনে হয় যে ধনতন্ত্রেব উচ্ছেদকল্পে ববীন্দ্রনাথেব স্বকীয় অনুভব ও পথনির্দেশ বয়েছে। তাঁব ধাবণায় ইতিহাসের নিযমে লুব্ধ মানুষেব এই নিষ্ঠুব স্বার্থপরতা একদিন নিজেই নিজেকে মারবে। মানুষেব নৈতিক চবিত্র তাব পশুস্বভাবেব উপব জযী হবেই। যেমন—“সেই ধ্বংসশাপগ্রস্ত ভাণ্ডাবেব কাবাগাবে জডবস্তুপুঞ্জেব অন্ধকারে বাসা বেঁধে সঞ্চয়গর্বেব ঔদ্ধত্যে মহাকালকে কৃপণটা বিদ্রূপ কবছে, এ বিদ্রূপ মহাকাল কখনোই সইবে না। আকাশেব উপব দিযে যেমন ধূলানিবিড আঁধি ক্ষণকালেব জন্য সূর্যকে পবাভূত ক'বে দিযে তারপবে নিজেব দৌবাত্ম্যেব কোনো চিহ্ন না বেখে চলে যায, এসব তেমনি কবেই শূন্যেব মধ্যে বিলুপ্ত হযে যাবে” (পশ্চিম যাত্রীব ডাযাবি)। অথবা, “এই-যে গাযেব জোবে দেনা-পাওনাব স্বাভাবিক পথ বোধ কবা, এই জোব একদিন আপনাকেই আপনি মাববে। এই বকম অবস্থা ছোটো-বডো নানা কৃত্রিম উপাযে পৃথিবীর সর্বত্রই পীডা সৃষ্টি কবে বিনাশকে আহ্বান কবছে। সমাজে যাবা আপনাব প্রাণকে নিঃশেষিত ক'বে দান কবছে প্রতিদানে তাবা প্রাণ ফিবে পাচ্ছে না, এ অন্যায ঋণ চিবদিনই জমতে থাকবে এ কখনোই হতে পাবে না।” আবাব—“অভ্রভেদী ঐশ্বর্যেব চূর্ণীভূত পতনের কালে/দবিদ্রেব জীর্ণ দশা বাসা তাব বাঁধিবে কঙ্কালে” “দানবেব মূঢ অপব্যয গ্রন্থিতে পাবে না কভু ইতিবৃত্তে শাশ্বত অধ্যায” ইত্যাদি বহু। মনে বাখতে হবে এধরণেব ‘ভগ্নজানু প্রতাপেব’ ছবি আঁকায কবিব নীতিবোধ খানিকটা প্রভাব বিস্তাব করেছে ঠিকই, এ মর্মবেদনাক্লিষ্ট মহাকবিব অভিশাপও, তবু এই পবিণামদর্শনেব মধ্যে কবিব ইতিহাসবোধ যে বহুল পরিমাণে কাজ কবেছে এব পবিচযও যথেষ্ট। বস্তুত ‘মহাকাল’ বলতে কবি পতন-উত্থানেব নিযামক ইতিহাসেব অদৃশ্য কার্যকারণ সূত্রকেই নির্দেশ কবেছেন। কাবণ, এ ববীন্দ্রনাথেব অজানা হতে পাবে না যে—“ন কালো দণ্ডমুদ্যম্য শিবঃ কৃন্ততি কস্যচিৎ” (কাল নিজে অস্ত্রধাবণ কবে কাবো মাথা কাটতে আসে না—মহাভাবত), মানুষেব মধ্য দিযেই কালেব কাজ চলে। যাই হোক—শহব নয়, গ্রাম, বাষ্ট্র নয়, সমাজ, ভিক্ষা নয়, আত্মশক্তিলাভ, পুবাতন উপকবণ নয়, আধুনিক বিজ্ঞানবিদ্যাব দান. বিক্ষিপ্ত হত্যা নয, সংগঠন, কাপুরুষতা নয, জীবনপণ, রক্তাক্ত সংঘর্ষ নয, সামবাযিক প্রতিকাব—এই সব স্বকীয় ধাবণা নিয়ে ববীন্দ্রনাথ আমাদের

পরিচিত রাজনীতিক ও সমাজনীতিক কোনো কোনো মতের প্রায় বিরোধী এবং কোনো কোনো মতের খুবই কাছাকাছি। সব মিলিয়ে তিনি স্বতন্ত্র এবং নিজেই একটা বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠান। তিনি দেখেছিলেন এবং শুনেছিলেন অনেক কিছুই, কিন্তু নিজ মুক্তবুদ্ধি অনুযায়ী নিজমতে সামগ্রিক একটা দিক ঠিক ক'রে নিয়েছিলেন, যা থেকে বিচ্যুত হয়ে পরধর্ম গ্রহণ করতে চান নি। খুঁটিনাটি বিচার-বিবেচনায় তিনি সমালোচনার ঊর্ধ্বে না হলেও, তাঁর অনুভবের এই উত্তুঙ্গ মৌলিকতা বিস্ময়কর নিশ্চয়ই। এ বিষয়ে সবচেয়ে প্রকট ও প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত হ'ল তাঁর গ্রাম-স্বরাজ সংগঠনের উদ্যোগ, বিশ শতকের গোড়া থেকে আমৃত্যু। তাঁর অধ্যয়ন, তাঁর অভিজ্ঞতা, চিন্তা ও কর্মকুশলতা তখনকারদিনের বহু স্বাদেশিকের চেয়ে বেশি বই কম ছিল না এবং গরমিলের ক্ষেত্রে নেতাদের কারও মতের সঙ্গে মিল করার জন্যও তিনি আগ্রহশীল ছিলেন না।

রবীন্দ্রনাথের রাশিয়া-পরিদর্শন ও তজ্জন্য প্রকাশিত মতামত বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের যুক্তিবুদ্ধি ও নিজমতানুবর্তিতার কথা ভাবতে হবে। রাশিয়া পরিদর্শনের পূর্বেই রবীন্দ্রনাথ কিভাবে সামন্ততান্ত্রিকতা ও ধনতান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন ও সংগ্রামের উদ্দীপনা জাগিয়েছেন তা আমরা এতক্ষণ দেখেছি। রুশ-বিপ্লবের তেরো বৎসর পরে মস্কো গিয়ে রবীন্দ্রনাথ যা দেখলেন এবং শুনলেন তাতে তাঁর প্রাথমিক মনোভাব হ'ল তাঁর অভিলষিত সমাজ-সাধনার সিদ্ধির রূপ দর্শন এবং তাঁর বিস্ময় ও স্বদেশের জন্য দুঃখবোধ। রবীন্দ্রনাথ কতকটা pragmatic দৃষ্টি নিয়ে কৃতকার্যতার বিচারে বলশেভিকদের উদ্যোগ সম্পর্কে বিস্ময়মিশ্র শ্রদ্ধা প্রকাশ করলেন। 'রাশিয়ার চিঠি'তে প্রকাশিত একটি মন্তব্য দৃষ্টে এই অনুমান হয় যে পূর্বে রবীন্দ্রনাথ বলশেভিকদের সম্পর্কে ও সেখানকার ব্যবস্থাদি সম্পর্কে ভুল সংবাদ বা পরস্পরবিরোধী সংবাদ পেয়েছিলেন এবং সত্যভাষণে পরাধীন দেশে বিপদের আশঙ্কাও তিনি করছিলেন। রেখে ঢেকে সোভিয়েটের প্রশংসা করলে সুবুদ্ধির পরিচয় দেওয়া হবে, সত্য কথা বললে শাসকদের এবং আরও কারো কারো বিরাগভাজন হওয়ার সম্ভাবনা থাকছে, এটি অনুধাবন ক'রে তিনি স্পষ্ট সত্য কথাকেই শ্রেয় বিবেচনা ক'রে বললেন— "আমার পৃথিবীর মেয়াদ সংকীর্ণ হয়ে এসেছে, অতএব আমাকে সত্য হবার চেষ্টা করতে হবে, প্রিয় হবার নয়।"

রবীন্দ্রনাথের লেখা প'ড়ে বেশ বোঝা যায় বলশেভিকদের ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে বহু বিরোধী সমালোচনা তাঁর কর্ণগোচর হয়েছিল, এবং তাঁকে রাশিয়া পরিদর্শনে যেতে অনেকে নিষেধও করেছিলেন, নতুবা তিনি এমন কথা লিখতে পারতেন না যে— "ধনশক্তিতে দুর্জয় পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রাঙ্গণদ্বারে ঐ রাশিয়া আজ নির্ধনের

শক্তিসাধনার আসন পেতেছে সমস্ত পশ্চিম মহাদেশের ভ্রূকুটিকুটিল কটাক্ষকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা ক'রে, এটা দেখবার জন্যে আমি যাব না তো কে যাবে? ওরা শক্তিশালীর শক্তিকে ধনশালীর ধনকে বিপর্যস্ত ক'রে দিতে চায়, তাতে আমরা ভয় করব কিসের, রাগই বা করব কেন? আমাদের শক্তিই বা কী, ধনই বা কত? আমরা তো জগতের নিরন্ন নিঃসহায়দের দলের।" অপিচ "সোভিয়েটরা রুশসম্রাটকৃত অপমান এবং আত্মকৃত অপমানের হাত থেকে দেশকে বাঁচিয়েছে—অন্যদেশের ধার্মিকেরা ওদের যত নিন্দাই করুক আমি নিন্দা করতে পারব না। ধর্মমোহের চেয়ে নাস্তিকতা অনেক ভালো।" বলশেভিক শাসন সম্পর্কে মিথ্যা এবং অতিরুক্ত অভিযোগ যে তাঁর কানে এসে পৌঁছেছিল ঐরকম উক্তি থেকে তা অনুমান করা যায়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ঐসব বিরুদ্ধবাদীদের সমালোচনা যে তাহা মিথ্যা তা নিম্নলিখিতভাবে জানিয়েছেন—"তাদের সম্বন্ধে ক্রমাগতই উল্টো উল্টো কথা শুনেছি। আমার মনে তাদের বিরুদ্ধে একটা খটকা ছিল। কেননা গোড়ায় ওদের সাধনা ছিল জবরদস্তির সাধনা।" বস্তুতঃ সমস্ত 'রাশিয়ার চিঠি' এমনভাবে লেখা যে মনে হয় তিনি প্রচলিত ভুল তথ্য সংশোধন কল্পেই এত জোর দিয়ে লিখছেন। তা ছাড়া পূর্বেকার কোনো কোনো রচনায়, যেমন সমবায়নীতি-বিষয়ক লেখায় তিনি যে রুশ-বিপ্লবের নিন্দা করেছেন সেও রাশিয়ার নব উদ্‌যোগ এবং বিপ্লব বিষয়ে মিথ্যা প্রচার শু'নে। বস্তুতঃ রুশবিপ্লবে 'মারামারি কাটাকাটি' প্রয়োজনের অতিরিক্ত হয়নি, প্রতিপক্ষকে কোথাও উৎসাদিত করা হয় নি এবং কোনো একটি ক্ষেত্রেও যে ফরাসী বিপ্লবের আতিশয্য ও অন্ধের অবিবেচনা স্থান পায়নি তা ইতিহাসের পাঠক জানেন। রবীন্দ্রনাথ পূর্বে জানতেন না, পরে জেনে নিয়েছিলেন, তাই তিনি ধনগরিমার ইতরতা দূর করা এবং শিক্ষা-বিস্তার প্রভৃতির দিক থেকে বলশেভিকদের নৈপুণ্যের কথা এত উচ্ছ্বাস সহকারে বলেছেন এবং যেন লিখে ব'লে শেষ করতে পারছেন না এমন ধারণার পরিচয় দিয়েছেন। সমবায়নীতির প্রসার কল্পে তিনি রুশ-বিপ্লব বা সাধারণভাবে য়ুরোপীয় চিত্তের মারমুখী মনোভাব সম্পর্কে যাই বলুন বিপ্লবোত্তর সাফল্য দৃষ্টে রাশিয়ার চিঠিতে তিনি বিপ্লবকে প্রকারান্তরে সমর্থনই জানাচ্ছেন দেখি। কারণ তিনি দেখেছেন, এ কেবল ভাঙার ব্যাপার নয়, গঠনের বিস্ময়কর প্রয়াস, চারদিকের প্রতিকূলতার মধ্যেও। যেমন—

"সনাতন ব'লে পদার্থটা মানুষের অস্থিমজ্জায় মনে প্রাণে হাজারখানা হয়ে আঁকড়ে আছে, তার কত দিকে কত মহল, কত দরজায় কত পাহারা, কত যুগ থেকে কত ট্যাক্সো আদায় ক'রে তার তহবিল হয়ে উঠেছে পর্বত-প্রমাণ। এরা তাকে একেবারে জটে ধরে টান মেরেছে—ভয় ভাবনা সংশয়

কিছুই মনে নেই। সনাতনেব গদি দিযেছে ঝাঁটিয়ে, নূতনের জন্যে একেবারে নূতন আসন বানিয়ে দিলে। পশ্চিম মহাদেশ বিজ্ঞানেব জাদুবলে দুঃসাধ্য সাধন কবে, দেখে মনে মনে তারিফ কবি। কিন্তু এখানে যে প্রকাণ্ড ব্যাপাব চলছে সেটা দেখে আমি সবচেযে বেশি বিস্মিত হয়েছি। শুধু যদি একটা ভীষণ ভাঙচুবেব কাণ্ড হ'ত তাতে তেমন আশ্চর্য হতুম না, কেননা, নাস্তানাবুদ কববাব শক্তি এদেব যথেষ্ট আছে। কিন্তু দেখতে পাচ্ছি, বহুদূর ব্যাপী একটা ক্ষেত্র নিযে এবা একটা নূতন জগৎ গডে তুলতে কোমর বেঁধে লেগে গেছে।"

অথবা আরও স্পষ্টভাবে—

"কিন্তু আমাদেব আজ বলবাব সময এসেছে যে, অশক্তেব শক্তি এখনই যদি না জাগে তাহ'লে মানুষেব পবিত্রাণ নেই। কাবণ, শক্তিমানেব শক্তিশেল অতিমাত্র প্রবল হযে উঠেছে, একদিন ভূলোক উত্তপ্ত হযে উঠেছিল, আজ আকাশকে পর্যন্ত পাপে কলুষিত ক'বে তুললে। নিরুপায আজ অতিমাত্র নিরুপায—সমস্ত সুযোগ সুবিধা আজ কেবল মানবসমাজেব এক পাশে পুঞ্জীভূত, অন্যপাশে নিঃসহাযতা অন্তহীন।" এবং অন্যত্র "এই বিপ্লব মানুষেব সবচেযে নিষ্ঠুব ও প্রবল বিপুর বিরুদ্ধে বিপ্লব"।

সুতবাং রুশ-বিপ্লব বিষযে ববীন্দ্রনাথেব আন্তবিক অসমর্থন ছিল এমন কথা বলাব উপায নেই।

পাঠক লক্ষ্য কববেন, বাশিযাব চিঠিতে বিপ্লবোত্তব বলশেভিক উদ্‌যোগেব বিববণী বাদ দিয়ে যে সব সাধাবণ মন্তব্য ও স্বদেশকথা বা নিজকথা বযেছে তাব মধ্যে পূর্বে বলেন নি এমন নূতন কথা প্রায নেই বললেই চলে। সেই নিবক্ষব নিবন্নেব শক্তিব উদ্‌বোধনেব বিষয, সেই শাস্ত্র-প্রথামূলক ধর্মতন্ত্রেব অত্যাচাব, সামন্ততান্ত্রিক প্রজাশোষণ, গ্রামেব ও কৃষকেব উন্নতি, স্বজাতিস্বার্থকে অতিক্রম ক'বে পৃথিবীব শোষিত মানুষেব দিকে দৃষ্টি, জন-শিক্ষাব ব্যবস্থা প্রভৃতি। কবিব আত্মশক্তিমূলক প্রবন্ধ থেকে কালান্তর-এব লেখা পর্যন্ত কুডি-পঁচিশ বছব ধবে তিনি এই সব কথাই ব'লে এসেছেন। আসলে সোভিয়েট কার্যকলাপেব মধ্যে ববীন্দ্রনাথ তাঁব নিজধাবণারই এবং কর্মোদ্যমেরই ব্যাপক প্রতিচ্ছবি দেখতে পেলেন। এই জন্যই রাশিযাব নবজাগৃতিব বিববণেব সঙ্গে তাঁর স্বদেশেব জন্য চিন্তা, অশ্রুপাত এবং নিজ সীমিত উদ্‌যোগকে মিলিয়ে দেখার প্রবণতাই আমাদের মনোযোগ বিশেষভাবে আকর্ষণ করে। প্রথম চিঠিতেই ববীন্দ্রনাথ বলছেন —"আমরা শ্রীনিকেতনে যা কবতে চেযেছি এবা সমস্ত দেশ জুডে প্রকৃষ্টভাবে তা-ই করছে। আমাদেব কর্মীরা যদি কিছুদিন এখানে এসে শিক্ষা করে যেতে পারত

তাহলে ভারী উপকার হত। প্রতিদিনই আমি ভারতবর্ষের সঙ্গে এখানকার তুলনা ক'বে দেখি আব ভাবি কী হয়েছে আব কী হতে পাবত। ···কয়েকবৎসব পূর্বে ভাবতবর্ষেব অবস্থার সঙ্গে এদের জনসাধারণের অবস্থাব সম্পূর্ণ সাদৃশ্য ছিল—এই অল্পকালেব মধ্যে দ্রুতবেগে বদলে গেছে—আমরা পড়ে আছি জডতার পাঁকের মধ্যে আকণ্ঠ নিমগ্ন।"

স্বদেশের সঙ্গে বাশিযাব সাদৃশ্য ও পার্থক্য দর্শন, সোভিয়েট সমাজতান্ত্রিক কর্ম-প্রণালীব সঙ্গে তাঁব পল্লী-স্ববাজেব প্রণালীব তুলনা ঐ চিঠিগুলির সর্বত্র ছড়িযে বযেছে এবং আমবা যদিও মনে কবতে পাবি যে বাষ্ট্রক্ষমতা দখলে এসেছিল ব'লেই সে দেশে সমাজতান্ত্রিক উদ্‌যোগ সাফল্যলাভ কবেছে, সুতবাং বিদেশি শাসন দূব কবা তো আমাদেবও প্রাথমিক কর্তব্য ছিল, তবু আজকেব দিনে স্বাধীনতাব পঁচিশ-ছাব্বিশ বৎসব অতীত হলেও সমাজতান্ত্রিক পদক্ষেপ যে সহজ হযনি তা দেখে এই চিন্তাই অধিকতব সমীচীন হয যে স্বদেশী আন্দোলনেব সঙ্গে পুবোপুবি গ্রাম-সংগঠনেব কাজে নামলে সনাতনী সামন্ততান্ত্রিক মনোভাব এবং ধনতান্ত্রিক দুর্গতি থেকে বক্ষা পাওযার পথ সুগম হ'ত, শ্রেণীচবিত্রের ব্যাপক প্রসাব ঘটত না।

সোভিযেট সম্পর্কে বিবেচনায রবীন্দ্রনাথ ওদেব দু'একটি ত্রুটিও লক্ষ্য কবেছিলেন, যদিও অভিযোগ কবেননি, কাবণ, চাঁদেব আলোর ঔজ্জ্বল্যেব কাছে কলঙ্ক কিছু নয়, এবং 'প্রযোগেব দ্বাবাই মতেব বিচাব হতে পাবে, এখনো পরীক্ষা শেষ হয় নি।' তবু যে-যে ব্যাপাবে ববীন্দ্রনাথের খটকা লেগেছিল সেগুলির উল্লেখে ও তাঁর মতামত-বর্ণনে তাঁব স্বকীয় সমাজতান্ত্রিক পদ্ধতিব পবিচয় পবিস্ফুট হতে পাবে। এরকম একটি হ'ল শিক্ষাবিধি সম্পর্কে, যেমন "শিক্ষাবিধি দিযে এরা ছাঁচ বানিয়েছে—কিন্তু ছাঁচে ঢালা মনুষ্যত্ব কখনো টেঁকে না"। পবে নিজেই বিচাব ক'রে এর সমাধানকল্পে বলছেন—"শিক্ষাকে আপন বিশেষ মতেব একান্ত অনুবর্তী ক'রে কতকটা গায়েব জোবে কতকটা মোহমন্ত্রেব জোবে একঝোঁকা করে তুলেছে, তবুও সাধারণের বুদ্ধির চর্চা বন্ধ কবেনি। যদিও সোভিযেট নীতিপ্রচাব সম্বন্ধে এবা যুক্তির জোবের উপবেও বাহুবলকে খাড়া ক'বে রেখেছে, তবুও যুক্তিকে একেবাবে ছাডেনি এবং ধর্মমূঢ়তা ও সমাজপ্রথাব অন্ধতা থেকে সাধাবণেব মনকে মুক্ত বাখবাব জন্যে প্রবল চেষ্টা কবছে·· ··· মানুষকে এবা দেহেব দিকে নিপীড়িত করেছে, মনের দিকে নয। যাবা যথার্থই দৌবাত্ম্য কবতে চায় তাবা মানুষের মনকে মারে আগে—এরা মনেব জীবনীশক্তি বাড়িয়ে তুলেছে। এইখানেই পরিত্রাণের রাস্তা রযে গেল।" সুতবাং ববীন্দ্রনাথের মতামত এই দাঁড়ায় যে এবকম শিক্ষাবিধি দেশকাল-বিচারে সমর্থনযোগ্য। এবই সঙ্গে সংলগ্ন অন্য আর একটি বিষয় হ'ল সোভিয়েট সমাজে ব্যষ্টিব স্থান, ব্যক্তিগত

সম্পত্তির বিনাশে ব্যক্তিত্বের বিকাশ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে কিনা, এবিষয়ে তাঁর অভিমত। রবীন্দ্রনাথ বলছেন—"সাধাবণ মানুষের পক্ষে আপন সম্পত্তি আপন ব্যক্তিরূপের ভাষা—সেটা হাবালে সে যেন বোবা হয়ে যায়। সম্পত্তি যদি কেবল আপন জীবিকাব জন্যে হ'ত, আত্মপ্রকাশের জন্যে না হ'ত তাহলে যুক্তির দ্বারা বোঝানো সহজ হ'ত যে, ওটা ত্যাগেব দ্বাবাই জীবিকাব উন্নতি হ'ত। আত্মপ্রকাশেব উচ্চতম উপায, যেমন বুদ্ধি, যেমন গুণপনা, কেউ কাবো কাছ থেকে জোব ক'বে কেড়ে নিতে পাবে না।··· সোভিয়েটরা এই সমস্যাকে সমাধান কবতে গিযে তাকে অস্বীকাব কবতে চেয়েছে। সেজন্যে জববদস্তিব সীমা নেই। একথা বলা চলে না যে মানুষেব স্বাতন্ত্র্য থাকবে না, কিন্তু বলা চলে যে স্বার্থপবতা থাকবে না।" ববীন্দ্রনাথ স্বীকাব কবছেন যে ব্যক্তিব অপরিমিত ধনসঞ্চয় সমাজেব ক্ষতিসাধন করে। অথচ সভ্যতা সংস্কৃতির জন্য ব্যক্তিব প্রকাশ বাধামুক্ত হওয়া উচিত। ব্যক্তি ও সমাজেব এই দ্বন্দ্বেব সমাধানকল্পে তিনি পূর্ব থেকেই সমাজশাসনেব পবিকল্পনা কবেছিলেন। তারই পুনরুল্লেখ ক'বে রাশিযাব চিঠিতে বললেন—"এব একটি মাঝামাঝি সমাধান ছাডা উপায় আছে বলে মনে কবি নে—অর্থাৎ ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকবে, অথচ তাব ভোগেব একান্ত স্বাতন্ত্র্যকে সীমাবদ্ধ করে দিতে হবে।" অন্যত্র বলছেন—"যদিও সোভিযেট মূলনীতি সম্বন্ধে এবা মানুষেব ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে অতি নির্দযভাবে পীড়ন কবতে কুণ্ঠিত হযনি, তথাপি সাধারণ-ভাবে শিক্ষার দ্বাবা চর্চার দ্বাবা ব্যক্তিব আত্মনিহিত শক্তিকে বাডিয়েই চলেছে—ফ্যাসিস্টদের মত নিযতই তাকে পেষণ করেনি।" কিন্তু ব্যক্তিগত ধনসম্পদ্ যে জাতীয ধনসম্পদ্ ব'লে গণ্য ও ব্যবহৃত হওযা উচিত সে বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ নানাভাবে নিজ মত ব্যক্ত করেছেন সমাজ, সমবায, পল্লী সম্পর্কে আলোচনাগুলিতে। মুনাফার মতলবকে তিনি অতিমাত্রায ঘৃণা কবেছেন। ১৯৩৪এ বাসন্তী কটন মিলেব উদ্বোধন প্রসঙ্গে ববীন্দ্রনাথ ডিরেক্টাবদেব সতর্ক ক'বে দিয়েছিলেন যে এটি যেন মুনাফা-লোটার ব্যবসায়ে পবিণত না হয়। তিনি আশা প্রকাশ কবেছিলেন, "তাঁহারা যেন লক্ষ্মীদেবীব এমন একটি পূজাবেদী নির্মাণ কবিতে পাবেন, যেখানে তাঁহাদের অর্জিত অর্থ জাতীয় অর্থ বলিয়া বিবেচিত হইবে।" বলশেভিকদের বহুকথিত পার্টি বা শ্রমিক-নায়কত্ব প্রতিবাদীমহলে একনায়কত্বরূপে সমালোচিত হয়েছিল। যাই হোক, তবু ডিক্টেটবশিপ তো বটে। ববীন্দ্রনাথ যে সময় সোভিয়েট পরিদর্শনে গিয়েছিলেন সে সময় স্ট্যালিনেব নেতৃত্বে বাশিযাব সুদৃঢ আভ্যন্তরীণ সংগঠনেব সময়। সেইজন্য দেশব্যাপী ঐক্যস্থাপনেব ও পার্টিকে অব্যাহত রাখার জন্য বিধি-বিধানের কঠোরতার প্রযোজন হয়েছিল। এইটি লক্ষ্য ক'বে ববীন্দ্রনাথ নীতিগতভাবে ডিক্টেটরশিপেব নিন্দা ক'রেও এব আত্যন্তিকতা থেকে মুক্তির পথও দেখিয়েছেন—"আর একটা

তর্কের বিষয় হচ্ছে ডিক্‌টেটরশিপ্ অর্থাৎ রাষ্ট্র ব্যাপারে নায়কতন্ত্র নিয়ে। কোনো বিষয়েই নায়কিয়ানা আমি নিজে পছন্দ করিনে। ক্ষতি বা শাস্তির ভয়কে অগ্রবর্তী ক'রে, অথবা ভাষায় ভঙ্গীতে বা ব্যবহারে জিদ প্রকাশের দ্বারা, নিজের মত প্রচারের রাস্তাটাকে সম্পূর্ণ সমতল করার লেশমাত্র চেষ্টা আমি কোনোদিন নিজের কর্মক্ষেত্রে করতে পারি নে।...এই নায়কতা শাস্ত্রের মধ্যেই থাক্, গুরুর মধ্যেই থাক, আর রাষ্ট্রনেতার মধ্যেই থাক, মনুষ্যত্বহানির পক্ষে এমন উপদ্রব কিছুই নেই।......সেই আপদের বহু অত্যাচার রাশিয়ায় আজ ঘটছে সে কথাও আমি বিশ্বাস করি। এর নঙর্থক দিকটা জবরদস্তির দিক, সেটা পাপ, কিন্তু সদর্থক দিকটা দেখেছি, সেটা হ'ল শিক্ষা, জবরদস্তির একেবারে উল্টো। রাশিয়াতেও সম্প্রতি নায়কের প্রবল শাসন দেখা গেল। কিন্তু এই শাসন নিজেকে চিরস্থায়ী করবার পন্থা নেয়নি। একদা সে পন্থা নিয়েছিল জারের রাজত্ব, অশিক্ষা ও ধর্মমোহের দ্বারা জনসাধারণের মনকে অভিভূত ক'রে এবং কসাকের কশাঘাতে তাদের পৌরুষকে জীর্ণ ক'রে দিয়ে। বর্তমান আমলে রাশিয়ায় শাসনদণ্ড নিশ্চল আছে ব'লে মনে করিনে। কিন্তু শিক্ষাপ্রচারের প্রবলতা অসাধারণ। তার কারণ, এর মধ্যে দলগত ক্ষমতালিপ্সা বা অর্থলোভ নেই। একটা বিশেষ অর্থনৈতিক মতে সর্বসাধারণকে দীক্ষিত ক'রে জাতি বর্ণ ও শ্রেণী নির্বিশেষে সকলকেই মানুষ ক'রে তোলবার একটা দুর্নিবার ইচ্ছা আছে।" ফলতঃ দেখা যায়, কোনো নায়কত্ব নীতির দিক থেকে না মেনেও শ্রমিক-নায়কত্বে শিক্ষার ক্ষেত্রে সর্বসাধারণের মুক্তবুদ্ধির জাগরণের আয়োজনের জন্য রবীন্দ্রনাথ একে অভিনন্দিতই করেছেন। উপরের বক্তব্য লক্ষ্য করলেই দেখা যায়, এদেশের শাস্ত্র প্রথা ধর্মতন্ত্রের নায়কত্ব ও জবরদস্তির কথা তাঁর মনে ছিল। তার চেয়ে মানুষের জ্ঞান বুদ্ধিকে মুক্ত করছে যে-একনায়কত্ব তা তাঁর কাছে বরণীয় বলেই মনে হয়েছে। মার্ক্সীয় অর্থ-নীতির সমালোচনাকে সামনে রেখে এবং বলশেভিকদের একমুখী প্রয়াসকে লক্ষ্য ক'রে রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছেন যে "অর্থনৈতিক মতটা সম্পূর্ণ গ্রাহ্য কিনা সে কথা বলবার সময় আজও আসেনি" এবং "রাশিয়ার অবস্থা যুদ্ধকালের অবস্থা, অন্তরে বাহিরে শত্রু। রাশিয়া যে কাজে লেগেছে এ হচ্ছে যুগান্তরের পথ বানানো, পুরাতন বিধি বিশ্বাসের শিকড়গুলোকে তার সাবেক জমি থেকে উপড়ে দেওয়া, চিরাভ্যাসের আরামকে তিরস্কৃত করা।" সুতরাং অতিশয়ের মুখে কড়া আইনের শাসনে প্রতিপক্ষকে বাড়তে না দেওয়া, 'স্বাধীন আলোচনার পথ জোর করে অবরুদ্ধ করা' প্রভৃতি ঘটছে। বস্তুতপক্ষে রবীন্দ্রনাথ বলশেভিক তত্ত্ব ও শাসনপদ্ধতি সম্পর্কে কিঞ্চিৎ দ্বিধাগ্রস্ত হয়েও কার্যক্রমের আশ্চর্য সার্থকতায় সন্দেহমুক্ত ও দ্বিধাহীন হয়ে সমগ্রভাবে তাদের সমর্থনই করেছেন। এই ব্যবস্থার ব্যতিক্রমে রাশিয়ার অদৃষ্টে বুর্জোয়া

ডেমোক্রেসিতে প্রত্যাবর্তন এবং পরিণামে ক্যাপিট্যালিস্ট ডেমোক্রেসিব মহাপঙ্কে নিপতন সুনিশ্চিত ছিল। ববীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধাসমন্বিত বিস্ময়মিশ্র উচ্ছ্বসিত প্রশংসা রাশিয়াব চিঠির পাতায় পাতায় ছড়িযে রয়েছে। স্বদেশ সম্পর্কে তাঁব চিন্তাভাবনাব ও উদ্‌যোগের সমধর্মিতা অনুভব কবছেন, রাশিযার চিঠিব ববীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে এইটিই আমাদের দেখাব কথা, থিওবির কোন্ অংশে মিলছে না, তা নয়। পরিশেষে সোভিযেটে জডবাদ ও ধর্ম নিশ্চিহ্ন করার প্রতিবাদে ববীন্দ্রনাথ। তাঁব অভিমত হ'ল আমাদেব দেশে যথার্থ ধর্ম নেই, আছে ধর্মতন্ত্র, কতকগুলো আচাববিচাব এবং মধ্যযুগেব প্রথাব দাসত্ব। অন্যান্য ধর্মপ্রণালীও সাম্প্রদাযিকতায় অবরুদ্ধ। বল-শেভিকদেব মানবতাবাদেই ববঞ্চ যথার্থ ধর্ম প্রতিফলিত হযেছে। ববীন্দ্রনাথ লিখছেন—"আমি নিজেব চোখে না দেখলে কোনোমতেই বিশ্বাস কবতে পাবতুম না যে, অশিক্ষা ও অবমাননাব নিম্নতম তল থেকে আজ কেবলমাত্র দশ বৎবেব মধ্যে লক্ষ লক্ষ মানুষকে এরা শুধু ক খ গ ঘ শেখায়নি, মনুষ্যত্বে সম্মানিত কবেছে। শুধু নিজেব জাতকে নয়, অন্য জাতেব জন্যেও এদেব সমান চেষ্টা। অথচ সাম্প্রদাযিক ধর্মেব মানুষেবা এদেব অধার্মিক ব'লে নিন্দা কবে। ধর্ম কি কেবল পুঁথিব মন্ত্রে? দেবতা কি কেবল মন্দিবেব প্রাঙ্গণে? মানুষকে যাবা কেবলই ফাঁকি দেয, দেবতা কি তাদেব কোনোখানে আছে?" ববীন্দ্রনাথেব গ্রন্থাদিব পাঠকেব অবশ্যই জানা আছে তিনি কোন্ ধর্মপথেব পথিক এবং প্রচলিত ধর্মপ্রণালীব কতদূব সমর্থক।

কবিব বাশিয়া পবিদর্শনেব লক্ষণীয় অপব বৈশিষ্ট্য হ'ল তাঁব নবীকৃত স্বদেশ-ভাবনা। নিম্নতম স্তব পর্যন্ত শিক্ষাব বিস্তাব, পুবাতন প্রথার অন্ধ মোহেব নাশ, ধনতন্ত্রের ইতবতাব তিরোভাব, অধঃপাতিত মানুষের মনুষ্যত্ব-অর্জন বিজ্ঞান-সহায়তায সাধাবণেব অর্থনীতিক কল্যাণসাধনেব উদ্‌যোগ, স্বজাতিব স্বার্থেব উপরে সমস্ত মানুষেব স্বার্থেব বিষয চিন্তা—এসব তো তাঁরও পূর্ব-পবিকল্পিত আদর্শ। স্বদেশী কাজেব ক্ষেত্রে ববীন্দ্রনাথ বিপ্লব ঘটানোকে সার্থক পথ ব'লে মনে কবতেন না। তাঁর অধ্যযন-অনুসাবে সমাজ-সংগঠনেব মধ্য দিযে অভিপ্রেত সিদ্ধ হবে। "বিপ্লবেব দ্বাবা এই পূর্ণতা ঘটবে না।" মূলতত্ত্ব নিযে তাঁব সঙ্গে বলশেভিক মতবাদের যে পার্থক্যই থাকুক না কেন, প্রযোগের ক্ষেত্রে তেমন কোনো পার্থক্য তিনি অনুভব করেন নি, তাই বাশিয়া-পবিদর্শনে নিজেব সীমিত পবিধির দুর্বল প্রয়াসেব কথাই তাঁব মনে হয়েছে, এবং স্বদেশেব জন্য পুনঃপুনঃ তাঁকে দীর্ঘশ্বাস মোচন কবতে হয়েছে।

জীবনেব শেষ দশ-পনেবো বৎসব ববীন্দ্রনাথ শ্রীনিকেতনের পল্লী সংগঠনেই কায়-মনবাক্য নিয়োগ কবেন। উত্তবোত্তর বেশি পবিমাণে। জাপানের চীন আক্রমণ বা

ব্রিটিশ শাসনের অত্যাচার অবিচারেব প্রতিবাদে তিনি শেষ পর্যন্ত সবাক্ থাকলেও প্রচলিত স্বদেশী আন্দোলন বিষয়ে তাঁকে কিছুটা নীরবতাপালন করতেই দেখা যায়। ক্রমবর্ধমান কংগ্রেস-লীগ দ্বন্দ্ব, ১৯৩৫-এব নূতন শাসননীতি, ১৯৩৭-এর নির্বাচন প্রভৃতি যেসব ব্যাপাব নিয়ে দেশ টলমল কবেছে তা ববীন্দ্রচিত্তকে তেমন আন্দোলিত কবেছিল কি না সন্দেহ। তবু স্থানে স্থানে নিজ গ্রাম-সংগঠন বিষযে জনচিত্ত আকর্ষণ কবতে গিযে পুবাতন অভিযোগ আপনা থেকেই প্রকাশিত হযে পডেছে, যেমন—"যখন দেশকে মা বলে আমবা গলা ছেড়ে ডাকি, তখন মুখে যাই বলি, মনে মনে জানি, সে মা গুটিকয়েক আদুবে ছেলেব মা। এই কবেই কি আমবা বাঁচব? শুধু ভোট দেবাব অধিকাব পেযেই আমাদেব চবম পবিত্রাণ?" অথবা "পাশেই প্রত্যক্ষ মবছে দেশেব লোব বোগে উপবাসে, আব আমি পবের উপব সমস্ত দোষ চাপিযে মঞ্চেব উপর চডে দেশাত্মবোধেব বাগ্‌বিস্তাব করছি, এত বডো অবাস্তব অপদার্থতা আব কিছু হতেই পাবে না।" শেষ পর্যন্ত স্বাদেশিকদেব সঙ্গে ববীন্দ্রনাথেব মিলল না এবং তিনি নিজ উদ্‌যোগেই অটল রইলেন, বাইবেব সাহায্যেব দিকে দৃক্‌পাত না কবেও, শ্রীনিকেতনকে কেন্দ্র ক'বে নগণ্য দবিদ্রেব পল্লীগুলিব শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাস্তাঘাট উন্নযন, সমবাযকেন্দ্রিক মিলন প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি নিযে। শ্রীনিকেতনের কাজ নিয়ে তিনি কী পবিমাণ আগ্রহশীল ও উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন শেষ কয বৎসব, তাব পবিচয় রযেছে মযমনসিংহে প্রদত্ত ভাষণে এবং অন্য একটি ঘটনায। ঐ ভাষণেব শেষে তিনি বলছেন—"আমি আজ যা বলছি তা আমাব প্রাণ দিযে, আয়ু ক্ষয কবে। আমাব যে স্বল্পাবশিষ্ট আয়ু তাই আমি দিচ্ছি আমাব প্রতি নিশ্বাসে। এব পরিবর্তে আমি চাই সত্যিকাব কর্মী। পল্লীপ্রাণেব বিচিত্র অভাব দূব কববাব জন্যে যাবা ব্রতী তাদেব পাশে আমি আপনাদেব আহ্বান করছি। তাদের আপনাবা একলা ফেলে বাখবেন না, অসহায ক'বে বাখবেন না, তাদেব আনুকূল্য করুন। কেবল বাক্যরচনায আপনাদেব শক্তি নিঃশেষিত হলে, আমাকে যতই প্রশংসা করুন, ববমাল্য দিন, তাতে উপযুক্ত প্রত্যর্পণ হবে না। আমি দেশেব জন্যে আপনাদেব কাছে ভিক্ষা চাই। শুধু মুখেব কথায় আমাকে ফিবিযে দেবেন না। আমি চাই ত্যাগেব ভিক্ষা, তা যদি না দিতে পাবেন তবে জীবন ব্যর্থ হবে, দেশ সার্থকতা লাভ কবতে পাববে না, আপনাদের উত্তেজনা যতই বডো হোক না কেন। আমাব স্বল্পাবশিষ্ট নিশ্বাস ব্যয় কবে এ কথা বলছি—আপনাদেব মনোরঞ্জনেব জন্যে, স্তুতিলাভেব জন্যে কিছু বলছি না—দেশেব জন্যে আমাব ভিক্ষাপাত্র ভবে দিন ত্যাগ দিয়ে, কর্মশক্তি দিয়ে।" ববীন্দ্রনাথের এই ব্যাকুলতা অ-পূর্বদৃষ্ট, এ তাব ১৯২৬-এব কথা, অসহযোগ আন্দোলনের ফলাফল এবং পরবর্তী ঘটনাবলী দৃষ্টে যখন তাঁর ধ্রুব ধাবণা হয়েছে যে ও-পথে কিছু হবে না, স্বাধীনতা পেলেও তার ফল

পাওয়া যাবে না। আব একটি দৃষ্টান্ত হ'ল ববিবাসরীয় সভার সভ্যদের পবম দুঃখে তিবস্কৃত করা, সে ১৯৩৭ খৃস্টাব্দে। কবি ভাষণ আবম্ভ কবলেন—"আমি এখানে কবি নই। এ কবির ক্ষেত্র নয়। সাহিত্য নিয়ে আমি এখানে কাববাব কবিনে। ····· আজ আপনাবা সাহিত্যিকবা এখানে এসেছেন, আপনাদেব সহজে ছাডছি নে—আপনাদের দেখে যেতে হবে আমাদেব এই অনুষ্ঠান। দেখে যেতে হবে দেশের উপেক্ষিত এই গ্রাম, বাপ-মায়ের তাডানো সন্তানের মতো এই গ্রামবাসীদের, এই উপেক্ষিত হতভাগাবা কেমন কবে ছিন্নবস্ত্র নিযে অর্ধাশনে দিন কাটায······" ইত্যাদি, (পূর্বেই উদ্ধৃত)।

বাশিয়ার উন্নতিদৃষ্টে রবীন্দ্রনাথ পল্লীকেন্দ্রিক সমাজগঠনে অধিকতর আস্থাবান্ হন। শ্রীনিকেতনেব সভায প্রদত্ত ভাষণ কযেকটিতে তা-ই লক্ষিত হয। এগুলিতে কবি আবও সহজ বাস্তব দৃষ্টি নিযে লক্ষ্য কবেছেন যে গ্রামীণ সম্পদ শোষণ ক'বে শহবগুলি গ্রাম থেকে পৃথক হযে উঠেছে, যেমন হয়েছে শহববাসী শিক্ষিত ভদ্রলোক গ্রামবাসী নিবন্ন নিবক্ষব "ছোটলোকদেব" থেকে। আধুনিক বিজ্ঞানেব দান যন্ত্রেব কল্যাণ থেকে কৃষি ও গ্রাম বঞ্চিত হচ্ছে, অথচ শহবের আশ-পাশে যে সব পাটকল ধানকল প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে, তা জীবিকাব লোভ দেখিয়ে দবিদ্র কৃষকদের শহরের দিকে আকর্ষণ ক'রে যান্ত্রিক দাসত্বে আবদ্ধ কবে ফেলছে, যাব ফলে পল্লীব সমাজ-জীবন বিশৃঙ্খল হযে উঠছে, মানুষেব জীবনেব ধাবা যাচ্ছে শুকিযে। শহরেব সমৃদ্ধিব কোনো অংশ গ্রামে প্রবেশ কবছে না, শোষিত গ্রামগুলি ক্রমশঃ বিশুষ্ক হয়েই পডছে। গ্রাম থেকে শহবেব, অন্যভাষায় গ্রামবাসী থেকে শিক্ষিত ও ব্যবসায়ী শহববাসীব শ্রেণীগত পার্থক্যই একালের ভাষণগুলিতে ববীন্দ্রনাথেব আলোচ্য এবং তিনি গ্রামীণ মানুষেব অর্থাৎ কৃষকেব নবজীবনেব পথপ্রদর্শক। লক্ষণীয এই যে এবকম আলোচনায তিনি ঠিক অর্থনীতি-বাজনীতির সূত্র ধবে কোনো কথা বলছেন না এবং কৃষকজীবন-সমস্যাব তাত্ত্বিক কোনো বিচাবধাবাও উপস্থাপিত কবছেন না। বাশিয়াব নবজন্ম দৃষ্টে তাব প্রশংসায় পঞ্চমুখ হযেও এবং বিগত জাবশাসিত রুশ-জীবনের সঙ্গে ভাবতীয জীবনধাবার সাদৃশ্য অধ্যযন ক'বেও স্বদেশে সেই জীবনদৃষ্টির প্রয়োগ বিষয়ে তাঁব সমর্থনেব অভাবই দেখা যাচ্ছে, যদিও সামন্ততান্ত্রিক পুবাতন ও ধনতান্ত্রিক আধুনিক দুর্বিপাক বিষযে পূর্বেকার মত আজও তিনি সমানভাবে সচেতন। তাব কাবণ, মানুষে মানুষে শ্রেণীগত পার্থক্যেব বিষয়টিকে তিনি বস্তুগতভাবে দেখতে চান না, দেখতে চান মানবিক সম্বন্ধ-বিভ্রাটেব দিক থেকে। তাঁব ধাবণায এইটেই শহর-কেন্দ্রিক আধুনিক জীবনের এবং শোষিত পল্লীজীবনেব সবচেয়ে বড ক্ষতি। এবং যেন মানবিক সম্বন্ধ পুনঃস্থাপিত হ'লে শিক্ষিত ও ধনী ব্যবসায়ীদেব ত্যাগবোধ জাগবে, গ্রামত্যাগ ক'রে মানুষ শহবে যাবে

না, আর স্বার্থত্যাগেব ফলে সামাজিক সামঞ্জস্য স্থাপিত হবে। অবশ্য ভাঙনেব মুখে এ আপনা থেকে হবে না, সমাজ-সংগঠনের কাজই এই দুঃসাধ্য সাধন করবে। 'পল্লী-প্রকৃতি' পুস্তিকায ধৃত গ্রামবাসীদেব উদ্দেশ্যে ভাষিত কয়েকটি লেখায় তৎকালীন স্বাদেশিক বৈদেশিক সমস্ত পরিস্থিতি বিষয়ে কবিব সচেতন মনোভাব প্রকাশিত হ'লেও তাব নিবাকবণ যে সর্বাঙ্গীন সুস্থ সমাজগঠনেব উপাযেই সম্ভব, এমন ধাবণা থেকে বোঝা যায তিনি তাঁব পূর্বেকাব মৌলিক 'বাষ্ট্র নয, সমাজ' 'শহব নয়, গ্রাম' এই লক্ষ্যে শেষ পর্যন্ত অবিচল। গ্রাম বা কৃষক-জীবন-কেন্দ্রিক বাঙলাব মূল সমস্যা 'পল্লীসেবা' প্রবন্ধে দেখছেন এইভাবে : "মোট কথাটা হচ্ছে দেশেব যে অতিক্ষুদ্র অংশে বিদ্যা বুদ্ধি ধন মান, সেই শতকবা পাঁচ পবিমাণ লোকেব সঙ্গে পঁচানব্বই পবিমাণ লোকেব ব্যবধান মহাসমুদ্রেব ব্যবধানের চেয়ে বেশি। আমবা এক দেশে আছি, অথচ আমাদেব এক দেশ নয।" অথবা যেমন—"শক্তিবিস্তাবেব সঙ্গে সঙ্গে যদি মানুষী সম্বন্ধ-বিকাশেব অনুকূল ক্ষেত্র কেবলই সংকীর্ণ হতে থাকে তবে সেই শক্তি শক্তিশেল হযে উঠে মানুষকে মাবে, মাববাব অস্ত্র তৈবী কবে, মানুষেব সর্বনাশ করবাব ষড়যন্ত্র কবে, অনেক মিথ্যাব সৃষ্টি কবে, অনেক নিষ্ঠুবতাকে পালন কবে, অনেক বিষবৃক্ষের বীজ বপন কবে সমাজে।" 'উপেক্ষিতা পল্লী' প্রবন্ধেও ববীন্দ্রনাথ ধনবৈষম্যকে স্বীকাব ক'বেও নৈতিকতার অভাবকে এব জন্যে দাযী কবেছেন এবং বিপ্লবেব সম্ভাবনায সতর্কও ক'বে দিযেছেন। যেমন—"মানুষের শক্তি জযী হয়েছে প্রকৃতিব শক্তির উপবে, তাতে লুঠেব মাল যা জমে উঠল তা প্রভূত। এই জযেব ব্যাপাবে প্রথম গৌবব পেল মানুষেব বুদ্ধিবীর্য, কিন্তু তাব পিছন পিছন এল দুর্বাসনা। তাব ক্ষুধা তৃষ্ণা স্বভাবেব নিযমেব মধ্যে সন্তুষ্ট রইল না, সমাজে ক্রমশই অস্বাস্থ্যেব সঞ্চাব করতে লাগল ‥ বর্তমান সভ্যতায দেখি এক জায়গায এক দল মানুষ অন্ন উৎপাদনেব চেষ্টায নিজেব সমস্ত শক্তি নিযোগ কবেছে, আব এক জাযগায আব-এক দল মানুষ স্বতন্ত্র থেকে সেই অন্নে প্রাণধাবণ কবে। চাঁদেব যেমন এক পিঠে অন্ধকার অন্য পিঠে আলো, এ সেই বকম। এক দিকে দৈন্য মানুষকে পঙ্গু ক'বে বেখেছে—অন্য দিকে ধনের সন্ধান, ধনের অভিমান, ভোগবিলাস সাধনের প্রয়াসে মানুষ উন্মত্ত। · টাকা জমছে অথচ তাব মূল্য যাচ্ছে কমে, উপকবণ-উৎপাদনেব ক্রটি নেই অথচ তা ভোগে আসছে না। ধনের উৎপত্তি এবং ধনের ব্যাপ্তিব মধ্যে যে ফাটল লুকিযে ছিল আজ সেটা উঠেছে মস্ত হয়ে।……সমাজে যারা আপনাব প্রাণকে নিঃশেষিত কবে দান কবছে প্রতিদানে তাবা প্রাণ ফিবে পাচ্ছে না, এ অন্যায় ঋণ চিবদিনই জমতে থাকবে এ কখনো হতেই পাবে না। ····কেন না, শুধু কেবল ঋণই যে পুঞ্জীভূত হচ্ছে তা নয়, শাস্তিও উঠছে জমে।" বক্তপাতেব মধ্য দিয়ে এর সমাধান হবে ব'লে রবীন্দ্রনাথ পূর্বাহ্লেই সতর্ক করে দিচ্ছেন। রাশিয়ার বিপ্লবোত্তর

মানবিক পটভূমি দৃষ্টেও এবং রাশিয়াপক্ষে বিপ্লব প্রয়োজনীয় ছিল, প্রায় এরকম ধারণা প্রকাশ ক'রেও, স্বদেশের পক্ষে বিপ্লবের পথকে বরণীয় মনে করছেন না, নৈতিক সংস্কার-সাধনকেই এবং সম্ভবতঃ সামাজিক নিয়ন্ত্রণকেই বৈষম্যের প্রতিষেধক ব'লে মনে করছেন। এই প্রবন্ধে আরও দেখা যায়, কোনো রীতির রাষ্ট্রগঠনকেই তিনি মর্যাদা দিতে চান না। রাষ্ট্রসম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ঘৃণা তাঁর সমাজভাবনার একটি স্থায়ী স্বভাব। যেমন—"একদা যে ধর্মসাধনায় রিপুদমন ক'রে মৈত্রীপ্রচারই সমাজের কল্যাণের মুখ্য উপায় ব'লে গণ্য হয়েছিল আজ তা পিছনে সরে পড়েছে, আজ এগিয়ে এসেছে যান্ত্রিক ব্যবস্থার বুদ্ধি। তাই দেখতে পাই একদিকে মনের মধ্যে রয়েছে রাষ্ট্রজাতিগত বিদ্বেষ, ঈর্ষা, হিংস্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা, অপর দিকে অন্যোন্যজাতিক শান্তিস্থাপনের জন্য গড়ে তোলা লীগ অফ নেশনস্। আমাদের দেশেও এই মনোবৃত্তির ছোঁয়াচ লেগেছে, যা-কিছুতে একটা জাতিকে অন্তরে বাহিরে খণ্ডবিখণ্ড করে, যে সমস্ত যুক্তিহীন মূঢ় সংস্কার মনের শক্তিকে জীর্ণ করে দিয়ে পরাধীনতার পথ প্রশস্ত করতে থাকে, তাকে ধর্মের নামে, সনাতন পবিত্র প্রথার নামে সযত্নে সমাজের মধ্যে পালন করব, অথচ রাষ্ট্রিক স্বাধীনতা লাভ করব ধার-করা রাষ্ট্রিক বাহ্যবিধির দ্বারা, পার্লামেণ্টিক শাসনতন্ত্র নাম-ধারী একটা যন্ত্রের সহায়তায়—এমন দুরাশা মনে পোষণ করি।" সমাজব্যবস্থায় মানবিক সম্পর্ক এবং উচ্চনীতির আরোপ রবীন্দ্রনাথের লেখায় বহুপূর্ব থেকেই পাওয়া যায়। মানবচরিত্রে লোভরিপুর তাড়নার উল্লেখ তাঁর প্রথমদিককার সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আলোচনায়, স্বদেশবিষয়ক পাশ্চাত্ত্যবিরোধী প্রবন্ধে, nationalism-বিষয়ক বক্তৃতায়, ভ্রমণলিপিতে, কালান্তরে, রাশিয়ার চিঠিতে, কোথায় নয়? কিন্তু শ্রীনিকেতন সংগঠনের মধ্যে এই ধরনের নৈতিকতার উপর জোর, যা তাঁর শিলাইদহ-পতিসর সংগঠন ব্যাপারে পাওয়া যাচ্ছে না, তা খানিকটা বিতর্কের সৃষ্টি করে বৈকি। রবীন্দ্রনাথ কি শেষের দিকে গান্ধীজীর মত নিঃশেষে নৈতিক হয়ে উঠলেন না কি? অথবা সুভাষচন্দ্রের অভিযোগই সত্য যে রবীন্দ্রনাথ অসহযোগ আন্দোলনের সময় গান্ধীজীর মতের প্রতিবাদ করলেও পরে তিনি তাঁর সমর্থনই করতে লাগলেন? কিন্তু না, এখানেও সেই পুরাতন অভিমতেরই পুনরুল্লেখ দেখতে পাচ্ছি—আগে সামন্ততান্ত্রিক অন্তঃশত্রুর সঙ্গে সংগ্রাম, পরে সামাজিক বিধি ব্যবস্থা পাকা ক'রে সুনির্দিষ্ট সমাজ-শাসন প্রবর্তন। কিন্তু পশ্চিমের অনুকরণে 'এহ বাহ্য' রাষ্ট্রগঠন কোনোক্রমেই নয়। মনে হয়, ব্রিটিশরাজের ১৯৩৫ এর শেষ শাসন-সংস্কার এবং তদনুযায়ী ভাবী নির্বাচন প্রভৃতির বিষয় মনে রেখেই রবীন্দ্রনাথ "পার্লামেণ্টিক শাসনতন্ত্র নামধারী" প্রভৃতি কথা বলেছেন। তা ছাড়া প্রচলিত স্বাদেশিকতা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ ১৯৩০ এর পরেও দু'একবারের জন্য হলেও তেমনি জোরের সঙ্গে প্রতিবাদ জানাচ্ছেন, এ আমরা দেখেছি। লক্ষণীয় এই যে এই সময়

গান্ধীজীর কংগ্রেস ত্যাগ ক'রে গ্রামোদ্যোগ বিষয়ে আত্মনিয়োগকে রবীন্দ্রনাথ অর্থপূর্ণ ব'লে বিবেচনা করেছেন।

এই তৃতীয় পর্বে দেশচিন্তার সমসূত্রে যে কাব্যধারার অগ্রগতি চলেছে তার মধ্যে ধ্বনিত হয়েছে কবির নিতান্ত সহজ মানুষপ্রীতি, মেহনতী মানুষ বিষয়ে তাঁর স্পষ্ট সচেতনতা। এসময় কবি প্রায়শই ভ্রমণ করেছেন অবহেলিত অন্ত্যজদের প্রাঙ্গণের পাশ দিয়ে, সাঁওতাল পল্লীতে অথবা পাঞ্জাব বোম্বাই গুজরাটের কলকারখানার শ্রমিক অঞ্চলে। ঠিক এমনটি এর আগে আর দেখা যায়নি। কবিজীবনের সাহিত্যিক চলিষ্ণুতার এই সব কথায় আমরা আসছি একটু পরেই দ্বিতীয় অধ্যায়ে। এখন আমরা প্রথম অধ্যায়ের বক্তব্যের অর্থাৎ চিন্তায় ও কর্মে সমাজমুখী রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে আমাদের অধ্যয়নের সারসংক্ষেপ করছি।

রবীন্দ্রনাথের মৌলিক স্বদেশচিন্তা ও পথনির্দেশকে তিনটি পর্বে বিভক্ত ক'রে দেখা উচিত। এই তিনটি পর্ব সামগ্রিক দৃষ্টিতে অচ্ছেদ্য হলেও চিন্তা অনুভব ও কার্যক্রমের স্বগত ও কালোচিত পরিণামে অল্পবিস্তর ভিন্ন।

প্রথম পর্ব: বিস্তৃতিকাল ১৮৯০-১৯১০ খ্রীঃ। প্রধানভাবে লক্ষিত ও আলোচিত বিষয়: ইংরেজ-চরিত্র, ভারতবাসীর সঙ্গে শাসক ইংরেজের সম্পর্ক-বিরুদ্ধতা, সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র, প্রাচীনাশ্রিত জাতীয়তা ও সামাজিকতার সমর্থন, নবসমাজ-সংগঠনের আহ্বান ও স্বকীয় উদ্যোগ, বঙ্গভঙ্গ-উদ্দীপিত স্বাদেশিক আন্দোলনে যোগ-দান অথচ বয়কট ও গুপ্ত স্বদেশী বিষয়ে মতানৈক্যের ফলে আন্দোলনের পথ ত্যাগ ও পল্লীসমাজ সংগঠনে বা গ্রাম-স্বরাজ প্রবর্তনে আত্মনিয়োগ, হিন্দু-মুসলিম অনৈক্যের উদ্ভব ও সেবিষয়ে চিন্তা ও পথনির্দেশ, বাস্তব সংগঠনের মধ্যস্থতায় হিন্দু-মুসলিম উচ্চবর্ণ-নিম্নবর্ণ ও জমিদার-কৃষক সমস্যার সমাধানের আগ্রহ।

দ্বিতীয় পর্ব: বিস্তৃতিকাল ১৯১০-১৯২৫ খ্রীঃ। প্রধানভাবে লক্ষিত ও আলোচিত বিষয়: প্রাচীনাশ্রয়ী জাতীয়তার প্রতি পূর্বেকার আস্থার শিথিলতা ও য়ুরোপীয় প্রগতির প্রতি পক্ষপাত, গভীর মানবিকতা ও হিন্দুয়ানির বা সামন্ততান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার প্রবল বিরোধিতা, সাম্রাজ্যবাদিদের পরস্পর সংগ্রামে সাম্রাজ্যবাদের বিলোপ প্রত্যাশা এবং তদর্থে মহাযুদ্ধকে অভিনন্দন, শিলাইদহ-পতিসর অঞ্চলে ব্যাপক গ্রাম-স্বরাজ সংগঠনের উদ্যোগ, নিপীড়িত ও সংগ্রামী মানুষের উপর শ্রদ্ধা অর্পণ, য়ুরোপীয় দেশগুলির উগ্রজাতীয়তা ধনতান্ত্রিক লোভ ও স্বার্থপরতার প্রতিবাদ, পশ্চিমী রাষ্ট্রতন্ত্রে অনাস্থা, অসহযোগ আন্দোলনের প্রতিক্রিয়া—চরকা-কেন্দ্রিক স্বাদেশিকতার বিরোধিতা, পরিবর্তে শাস্ত্রপ্রথাসহায় শ্রেণীশোষণের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের আহ্বান,

য়ুরোপীয়-যন্ত্রবিজ্ঞান-নির্ভর জনকল্যাণসাধনের ও আধুনিক বৈজ্ঞানিক শিক্ষা বিস্তারের সপক্ষতা, প্রাগ্রসর ধনতন্ত্রেব পদক্ষেপ বিষয়ে আশঙ্কা।

তৃতীয় পর্ব : বিস্তৃতিকাল ১৯২৫-১৯৪০ খ্রীঃ। প্রধানভাবে লক্ষিত ও আলোচিত বিষয় : নিপীড়িত সাধাবণ মানুষের উপব উত্তরোত্তর প্রবলতব প্রীতি, বিশেষভাবে ধনতান্ত্রিকতাব প্রতিবাদ ও বিমূঢ় শ্রমিক ও কৃষক জীবনেব দিকে লক্ষ্য স্থাপন, শ্রীনিকেতনে নূতন ধারায পল্লীসংগঠন, স্বদেশী আন্দোলনেব প্রতি ঔদাসীন্য, অথচ ইংবেজ শাসনের অন্যায অবিচাবেব প্রতিবাদ, বিপ্লবোত্তব রাশিযাব সাংগঠনিক উদ্যমের নিতান্ত প্রশংসা এবং স্বকৃত উদ্‌যোগেব সঙ্গে এব তুলনা, সামন্ততান্ত্রিক ও ধনতান্ত্রিক শোষণেব সমাধানে এদেশে ঠিক বিপ্লবে অনাস্থা এবং সমাজকেন্দ্রিক গ্রামের উন্নতিবিধানে গভীরভাবে আত্মনিযোগ। শ্রেণী-সংঘাত-সচেতনতা, শিক্ষাবিস্তাব, সমবাযেব ও আধুনিক যন্ত্রবিজ্ঞানেব উপব নির্ভবশীলতা।

ববীন্দ্রনাথেব সমাজদর্শনেব ফলশ্রুতি হ'ল মানবিক সম্পর্কেব নিঃশেষ উন্নতিবিধান ও সমবাযভিত্তিক অর্থনীতিক ও অন্যবিধ সহযোগিতা। তাঁব মতে ভাবতে সামাজিক অসাম্য ও অর্থনীতিক অসাম্য এ দুই পবস্পব সংসক্ত। জাতিবর্ণবিভাগকে পরিকল্পিত ধর্মেব সঙ্গে যুক্ত ক'বে বহুকাল ধবে মুষ্টিমেয উচ্চবর্ণ নিম্নবর্ণের অগণিত মানুষকে অর্থনীতিক মনুষ্যত্বেব অধিকাব থেকে নিঃশেষে বঞ্চিত কবে বেখেছে। আধুনিক শিক্ষিত ভদ্রলোক ও শহববাসী গ্রামবাসী কৃষকেব উৎপাদনেব উপর নির্ভর ক'রে দাঁড়িযে আছে, অথচ প্রতিদানে এদেব সভ্যজীবনেব প্রাথমিক অধিকাব দিচ্ছে না, কেননা এবা 'চাষাবেটা' 'ছোটলোক'। মানুষে মানুষে এই গুরুতব শ্রেণীভেদ, এই সামন্ততান্ত্রিক শোষণই ভাবতেব দৃঢ়মূল আভ্যন্তবীণ শত্রু, বহিরাগত ইংবেজ নয।

উচ্চসম্প্রদায়-নিম্নসম্প্রদাযেব মত হিন্দু-মুসলমান জল-অচল পার্থক্যও ভাবতেব সমস্যা। হিন্দু-মুসলমানেব দুই মেরু বিভেদকে দ্বৈজাতিক সর্বনাশ হিসেবে রবীন্দ্রনাথই প্রথম দেখেন। ববীন্দ্রনাথেব মতে এই সমস্যাব তীব্রতা ও সংকটাবস্থা বাজনীতিক আন্দোলনের ফলেই উদ্ভূত। রাজনীতিক বোঝাপডায হিন্দু-মুসলমানের স্থায়ী মিলন ঘটতে পাবে না, পাবে সামাজিক ঐক্যে, মৌখিক ভ্রাতৃ সম্বোধনে নয়, সমাজস্বীকৃত বাস্তব ভ্রাতৃভাবে। তিনি শিক্ষায় ও পদমানে হিন্দুব সঙ্গে মুসলমানের সমকক্ষতা চেয়েছিলেন।

উচ্চশ্রেণীর সঙ্গে নিম্নশ্রেণীব ও হিন্দু-মুসলমানেব সীমাহীন পার্থক্য ঘুচিয়ে সাম্য আনতে ববীন্দ্রনাথ একটি বিশেষ উন্নয়ন-পবিকল্পনার আদর্শ প্রচাব করেছিলেন এবং নিজেও যথাসাধ্য সেই আদর্শে সংগঠনেব কাজে নেমেছিলেন। তিনি এব নাম দিয়েছিলেন স্বদেশী সমাজ, প্রকৃতি বিচারে একে গ্রাম-স্ববাজ পবিকল্পনাও বলা যেতে পাবে। তখনকার ভারতে শ্রমিক-সমস্যা উল্লেখ্য কোনো ব্যাপার ছিল না। কৃষক ও

ভূমিহীন কৃষি-শ্রমিকের সমস্যাই গুরুতর ছিল। এরা প্রায়শঃ গ্রামবাসী, এদের অবস্থাব উন্নয়নেই ভারতের শতকরা আশি ভাগ মানুষের মানোন্নয়ন। এই উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথ শিক্ষিত কর্মীদের আহ্বান জানিয়েছিলেন। তাঁর পরিকল্পনাব মধ্যে ছিল শিক্ষাবিস্তার, স্বাস্থ্যবিধান, কূপ-পুষ্করিণী পথঘাট নির্মাণ, সমবায়-ভিত্তিতে কৃষি ও বাণিজ্যের দ্বারা আর্থিক মানোন্নয়ন, পল্লীর স্বকীয় বিচারব্যবস্থা আমোদপ্রমোদ প্রভৃতি।

রবীন্দ্রনাথের ধাবণা ছিল এরকম সংগঠনে বিশেষতঃ শিক্ষার সহায়ে মূঢ়ম্লানমূকদের মানসিক শক্তির উদ্বোধন ঘটবে, তখন শিক্ষিত বুদ্ধির প্রয়োগে এবং দাবির দ্বারা তাবা তাদের প্রাপ্য ন্যায়বিচার আদায় ক'রে নিতে পাববে। বলপ্রয়োগে বা বিপ্লবেব দ্বারা সামাজিক একীকরণের তত্ত্বে রবীন্দ্রনাথ আস্থাবান্ ছিলেন না, কোনো শ্রেণী বা দলের একনায়কতাও তাঁব অভিপ্রেত ছিল না। যে-কোনো বিষয়ে তিনি একীকরণেরই বিরোধী ছিলেন। কাবণ তাঁর মতে বৈচিত্র্য ও পার্থক্য সভ্যতার উন্নতির ভিত্তি। তাঁর 'সমাজে' ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলোপসাধনও তাঁর অভীপ্সিত ছিল না। তাঁর অভিমতে ধনী থাকবে। কিন্তু তার ধনসম্পদ সমাজ-নিয়ন্ত্রিত হবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি বলেছেন যে ইংবেজ আমলেব পূর্বে পূর্বে যে সব জমিদাব ছিলেন তাঁরা সমস্ত অর্থ নিজ ভোগবিলাসে ব্যবহাব কবতেন না, দীঘি-পুষ্কবিণী, বাস্তাঘাট, সাধাবণ শিক্ষা ও লোক-শিক্ষাব ব্যবস্থা প্রভৃতি সাধাবণেব কাজ তাঁদেব অবশ্যকরণীয ছিল। এই সংগঠন চালু কবাব উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথ যে সংবিধান বচনা করেন তা একান্তভাবে গণতান্ত্রিক।

রবীন্দ্রনাথ, রাজনীতিক আন্দোলনের সাহায্যে প্রথমে স্বাধীনতা পবে দেশেব কাজ —এ আদর্শে প্রত্যয়বান্ ছিলেন না। তাঁব মতে স্বাদেশিকতা হ'ল দেশেব মাটি ও মানুষেব সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগসাধন, অগণিত নিরন্ন নিরক্ষব মানুষের উদ্ধাব সাধনের প্রয়াস। তাঁব গ্রাম-সংগঠনে বৈদেশিক রাজশক্তি সম্পর্কে ঔদাসীন্য লক্ষণীয়। তাঁর অধ্যযনে সংগঠনেব. মধ্য দিয়ে সাধাবণ মানুষেব মনে শক্তির আবির্ভাব ঘটলে বিদেশী শাসন আপনা থেকেই স্খলিত হয়ে পড়বে, নতুবা ইংবেজ আমাদের স্বাধিকাব দিলেও দেশ বাস্তব স্বাধীনতাব মুখ দেখতে পাবে না, সে স্বাধীনতা হবে কতিপয় শিক্ষিত ও ধনী ব্যক্তির স্বাধীনতা। তাঁর মতে সংগঠনের মাধ্যমে সামাজিক অসাম্য এবং হিন্দু-মুসলিম বিরোধের সমাধান আপনা থেকেই হয়ে যাবে।

দেশ-পরিচালনে রবীন্দ্রনাথ রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব পছন্দ করতেন না, বিশেষতঃ পশ্চিমী কায়দার রাষ্ট্র। তাঁর মতে রাষ্ট্র একটা যান্ত্রিক সংগঠন, জীবন্ত দেশচালক হতে হবে সমাজকে। এই জন্য রাষ্ট্রক্ষমতালাভের স্বপক্ষে রাজনীতিক আন্দোলনও তাঁর অনভিপ্রেত ছিল। গান্ধীজী প্রবর্তিত অসহযোগ আন্দোলন, চরকা, খাদি প্রভৃতি পদ্ধতির তিনি তীব্র সমালোচনা করেন, যদিও গান্ধীজীর নৈতিক ব্যক্তিত্বে তিনি

বিশেষভাবে শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। রাজনীতিক আন্দোলনে দেশের গঠনমূলক দিক উপেক্ষিত হচ্ছে বলে তিনি মনে করেছেন।

সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় অসহিষ্ণুতা প্রকাশের পর রবীন্দ্রনাথ আধুনিক ধনতান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন। এর নিষ্ঠুর অমানবিকতা তাঁকে পীড়িত করে। তিনি মনে করেন উত্তরোত্তর অধিকতর মুনাফা সঞ্চয়েব ফলে ধনতন্ত্র এমন অবস্থার সৃষ্টি করবে যে নিজেব জটিল জালে নিজেই বদ্ধ হয়ে মরবে। বিপ্লবের দ্বারা ধনতন্ত্রের ও ঐ তান্ত্রিকদেব উচ্ছেদের চেয়ে গঠনমূলক প্রয়াসের দ্বারা উক্ত বিষের নিবারণ তিনি বিহিত করেছেন। সমবায়াত্মক প্রযাসই তাঁব মতে ধনতন্ত্র অপসারণের অস্ত্র। এক্ষেত্রেও তিনি সক্রিয় কৃষক-শ্রমিক-উৎপাদনকারী সংগঠনকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ আধুনিক বিজ্ঞানের দানকে গ্রহণ করাব পক্ষপাতী ছিলেন এবং সমবায়ের সঙ্গে কৃষিতে যন্ত্রের ব্যবহাবের কথাও পুনঃ পুনঃ বলেছেন।

জমিদারি-প্রথাকে রবীন্দ্রনাথ অযৌক্তিক ব'লে মনে করেছেন এবং তিনি এ তত্ত্বে বিশ্বাসী যে জমিব অধিকাব ন্যায়তঃ কৃষকেব। কিন্তু প্রজাস্বার্থসংরক্ষণের জন্য যতদিন পাকাপাকি কোনো ব্যবস্থা না হয ততদিন জমিদাবিকে মন্দের ভালো হিসেবে রাখতে চেয়েছেন।

যদিও অহিংসার উপব তাঁব বিশেষ কোনো প্রীতিপক্ষপাত ছিল না, তবু গুপ্ত স্বদেশীকে তিনি কার্যকর পন্থা ব'লে মনে কবেননি। অবশ্য গুপ্ত স্বদেশীব সাহসিকতার দিকটি তাঁব দ্বারা প্রশংসিতই হয়েছে। তিনি অন্যায় উৎপীড়নকেই হিংসা ব'লে মনে করেছেন, এই অন্যায়ের সশস্ত্র প্রতিবোধকে নয়।

সমস্ত বিষয় পর্যালোচনে দেখা যায়, আধুনিক রাজনীতি-বিজ্ঞানের দিক থেকে রবীন্দ্রনাথকে সমাজতন্ত্রবাদী ব'লে অভিহিত না করা গেলেও এবং তাঁর পরিকল্পনার কয়েকটি বিষয়ে প্রশ্নেব অবকাশ থেকে গেলেও তাঁব ভাবনা ও ধাবণায় সমাজতন্ত্রের উপাদান যথেষ্ট পবিমাণে রয়েছে। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিকোণ মৌলিক এবং কোনো ইজ্‌ম্-এর প্রভাব থেকে মুক্ত। পুরোপুবি সমাজতান্ত্রিক না বলা গেলেও তাঁকে শোধনবাদী বা সোস্যাল ডেমোক্র্যাট আখ্যাতেও অভিহিত করা যায় না, কারণ, তিনি পুরাতনকে ভেঙে নূতন সমাজবিন্যাস গ'ড়ে তোলার কথা প্রবন্ধে ও কাব্যে নাটকে নানাভাবে বলেছেন। এ বিষয় আমবা একটু পবেই আলোচনার মধ্যে দেখব। বস্তুতঃ, ভাবে বিপ্লবের কথা, চিন্তায় ও ভাষণে সংগঠনের পথ প্রদর্শন, সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থাকে ভাঙবার কথা অথচ ধনতান্ত্রিকতাব ক্ষেত্রে সমবায় ও ঐক্যমূলক প্রতিরোধ ব্যবস্থা, নৈতিক সংগ্রামে আস্থা অথচ প্রয়োজনে অন্যায়ের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণের আগ্রহ প্রভৃতি নিয়ে তিনি বিমিশ্র সোস্যালিস্ট এবং নিতান্তই স্বকীয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

কবিকৃতি

'পূর্বচিন্তা'য় আমরা 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ'কে কবির অজ্ঞাত সমাজ-উদ্বোধিত কবিতা ব'লে নির্ণয় করেছি। বলেছি, এই স্থবির সমাজ—জড়ত্বে বাঁধা, প্রথানুসরণের গতানুগতিকতায় দিনগত-পাপক্ষয়ে আবদ্ধ সমাজই কবিকে আশ্রয় ক'রে নিজকে ঐ কবিতায় ব্যক্ত করেছে। এই অচল সমাজের অনুরূপ সীমিত-অর্থবাহী কবিভাষাও গৌণভাবে এই বিদ্রোহের কারণ হয়েছে। রবীন্দ্র-পূর্ব আধুনিক বাঙ্‌লায় বিশেষভাবে মহাকাব্য বা আখ্যানকাব্যের কাল। এ কাব্যের সার্থকতার পরিচয় বস্তু-ঘটনা-চরিত্রের প্রচলিত সমাজ-স্বীকৃত মানদণ্ডে, বক্তব্যের সুচারু রূপায়ণে। মধুসূদন একাংশে বিদ্রোহ যদ্যপি করলেন, সামগ্রিকভাবে ভাষারীতিকে অগ্রসর ক'রে নিয়ে গেলেন না। সংকেত ও ব্যঞ্জনার আশ্রয়ে সীমাহীন অর্থের ও শ্রেণীহীন মানুষের প্রকাশ তাঁর কাব্যে নেই। তখনকার বহির্মুখ রচনায় তা থাকতেও পারে না।*

কাব্যরচনায় ব্যক্তিমানস ও সমাজ বা জাতির দ্বান্দ্বিক প্রকাশের বিষয় ভেবে দেখতে হবে। আমরা এমন মনে করি না যে ব্যক্তিস্বভাব পুরোপুরি সমাজ-নিয়ন্ত্রিত। আমরা মনে করি কাব্যরচনা কবি-ব্যক্তির কয়েকটি বিশেষ গুণের উপর নির্ভরশীল হয়েও তা নৈসর্গিক। সমাজ এবং ব্যক্তি নিয়েই নিসর্গ, এ দুয়ের মিলিত ও অমিলিত সাজাত্য ও বৈপরীত্য, প্রাধান্য ও অপ্রাধান্যের সূক্ষ্ম ক্রিয়াশীলতার উপরেই কবিশিল্পীদের প্রকাশবৈচিত্র্য। এঁরা সামাজিক না হলে সামাজিক অগণিত মানুষের রসাস্বাদনের প্রশ্ন ওঠে না। মনে পড়ে, বঙ্কিমচন্দ্র একটি প্রবন্ধে কবি ও কাব্যকে নিগূঢ় প্রাকৃতিক নিয়মের বশবর্তী ব'লেই নির্ধারণ করেছেন। তিনি বলেছেন—

> "সকলই নিয়মের ফল। সাহিত্যও নিয়মের ফল। বিশেষ বিশেষ কারণ হইতে, বিশেষ বিশেষ নিয়মানুসারে বিশেষ বিশেষ ফলোৎপত্তি হয়। জল উপরিস্থ বায়ু এবং নিম্নস্থ পৃথিবীর অবস্থানুসারে কতকগুলি অলঙ্ঘ্য নিয়মের অধীন হইয়া, কোথাও বাষ্প, কোথাও শিশির, কোথাও হিমকণা বা বরফ, কোথাও কুজ্ঝটিকারূপে পরিণত হয়। তেমনি সাহিত্যও দেশভেদে, দেশের অবস্থাভেদে, অসংখ্য নিয়মের বশবর্তী হইয়া রূপান্তরিত হয়।······তবে ইহা

* তুলনীয় রবীন্দ্রোক্তি—"তখন হেম বাঁড়ুজ্জে এবং নবীন সেন ছাড়া এমন দেশপ্রসিদ্ধ কবি ছিলেন না, যাঁরা নূতন কবিদের কোনো একটা কাব্যরীতির বাঁধা পথে চালনা করতে পারতেন। কিন্তু আমি তাঁদের সম্পূর্ণই ভুলে ছিলুম।" ('কড়ি ও কোমল'-এর ভূমিকা)

বলা যাইতে পারে যে, সাহিত্য দেশের অবস্থা এবং জাতীয় চরিত্রের প্রতিবিম্ব মাত্র। যে সকল নিয়মানুসারে দেশভেদে রাজবিপ্লবের প্রকারভেদ, সমাজবিপ্লবের প্রকারভেদ, ধর্মবিপ্লবের প্রকারভেদ ঘটে, সাহিত্যের প্রকারভেদ সেই সকল কারণেই ঘটে।" (বিদ্যাপতি ও জয়দেব)

এই সম্পর্ক-নির্ণয়ের মধ্যে একথাও মনে রাখতে হবে যে সামান্য কবি এবং মহাকবির মধ্যে যেমন ব্যক্তিত্বের তেমনি সমাজসৌহার্দ্যের অর্থাৎ এককথায় নৈসর্গিক শক্তির পার্থক্য রয়েছে। মহাকবির আবির্ভাব কালেভদ্রে, হয়তো বা বহুকথিত অবতারদের মত তাঁরাও সাহিত্য ও সমাজের মুহূর্তবিশেষে প্রকাশিত হন। রবীন্দ্রনাথ এরকম মহাকবি, তাই তাঁর সমাজসংস্রবও অধিকতর ব্যাপক।

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আন্তরিক উপলব্ধিও স্মরণীয়। সাহিত্য-আলোচনায় এক জায়গায় তিনি বলছেন—"মানুষের হৃদয়ও সাহিত্যে আপনাকে সৃজন করিবার, ব্যক্ত করিবার চেষ্টা করিতেছে। এই চেষ্টার অন্ত নাই, ইহা বিচিত্র। কবিগণ মানবহৃদয়ের এই চিরন্তন চেষ্টার উপলক্ষ্যমাত্র।·· বিশ্বের নিশ্বাস আমাদের চিত্তবংশীর মধ্যে কী রাগিণী বাজাইতেছে সাহিত্য তাহাই স্পষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেছে। সাহিত্য ব্যক্তিবিশেষের নহে, তাহা রচয়িতার নহে, তাহা দৈববাণী।" শিল্পী সাহিত্যিকের মধ্যস্থতায় মানবসমাজের নৈসর্গিক নিয়মের এই যে আত্মপ্রকাশ, তা মহাকবিদের ক্ষেত্রেই পরিস্ফুট, এ বিষয়টিও রবীন্দ্রনাথ অন্যত্র বোঝাবার প্রয়াস করেছেন, যেমন—"এই যেমন এক শ্রেণীর কবি হইল, তেমনি আর এক শ্রেণীর কবি আছে যাহার রচনার ভিতর দিয়া একটি সমগ্র দেশ, একটি সমগ্র যুগ, আপনার হৃদয়কে, আপনার অভিজ্ঞতাকে ব্যক্ত করিয়া তাহাকে মানবের চিরন্তন সামগ্রী করিয়া তোলে। এই দ্বিতীয় শ্রেণীর কবিকে মহাকবি বলা যায়। সমগ্র দেশের সমগ্র জাতির সরস্বতী ইঁহাদিগকে আশ্রয় করিতে পারেন, ইঁহারা যাহা রচনা করেন তাহাকে কোনো ব্যক্তিবিশেষের রচনা বলিয়া মনে হয় না।" দেখতে হবে, কবি নিজের রচনা সম্পর্কেও ব্যক্তির তত্ত্ব মানেন নি। নিজেকে মিডিয়ামরূপেই দেখেছেন। 'অন্তর্যামী' কবিতায় এবিষয়ে তাঁর বিখ্যাত ছন্দোময় ভাষণ হ'ল—

আমি যাহা কিছু চাহি বলিবারে
বলিতে দিতেছ কই।
অন্তরমাঝে বসি অহরহ
মুখ হতে তুমি ভাষা কেড়ে লহ,
মোর কথা লয়ে তুমি কথা কহ
মিশায়ে আপন সুরে। * * *

যে কথা ভাবিনি বলি সেই কথা,
যে ব্যথা বুঝি না জাগে সেই ব্যথা,
জানি না এনেছি কাহার বারতা
কারে শুনাবার তবে। * * *

আমি কি গো বীণাযন্ত্র তোমাব,
ব্যথায় পীড়িয়া হৃদয়ের তাব
মূর্ছনাভরে গীতঝংকাব
ধ্বনিছ মর্মমাঝে ?

আমাব মাঝাবে কবিছ রচনা
অসীম বিবহ, অপার বাসনা,
কিসেব লাগিযা বিশ্ববেদনা
মোব বেদনায বাজে ?

কবি এখানে 'তুমি' সম্বোধনে যাব উপব কর্তৃত্ব আবোপ কবছেন, তা অপ্রাকৃত অলৌকিক কোনো ব্যাপাব নয়, তা ঐ নৈসর্গিক শক্তিই, কবিব্যক্তিত্বকে আশ্রয় ক'বে দেশকালেব প্রতিরূপ হিসেবে কবিব প্রকাশেব মধ্যে নিজেবও প্রকাশ ঘটাচ্ছে। 'অন্তর্যামী' কবিতায় উপলব্ধ অথচ কবিব নিজেব প্রায অগোচর এই তত্ত্বেব ব্যাখ্যায় কবি অন্যত্র বলেছেন—

"কাব্যরচনা সম্বন্ধেও সেই বিশ্ববিধানই দেখিতে পাই*—অন্তত আমাব নিজের মধ্যে তাহা উপলব্ধি কবিয়াছি। যখন যেটা লিখিতেছিলাম তখন সেইটেকেই পরিণাম বলিযা মনে কবিযাছিলাম। ····আজ জানিয়াছি, সে-সকল লেখা উপলক্ষ্য মাত্র—তাহাবা যে-অনাগতকে গড়িয়া তুলিতেছে সেই অনাগতকে তাহাবা চেনেও না। তাহাদেব রচয়িতাব মধ্যে আর একজন কে রচনাকাবী আছেন, যাঁহাব সম্মুখে সেই ভাবী তাৎপর্য প্রত্যক্ষ বর্তমান। ···

বলিতেছিলাম বসি একধাবে
আপনাব কথা আপন জনাবে,
শুনাতেছিলাম ঘবেব দুযাবে
ঘবেব কাহিনী যত ,

---

* বঙ্কিমচন্দ্রের অধ্যয়ন তুলনীয়

তুমি সে ভাষারে দহিয়া অনলে
ডুবায়ে ভাসায়ে নয়নের জলে
নবীন প্রতিমা নব কৌশলে
গড়িলে মনের মতো।

এই শ্লোকটার মানে বোধ করি এই যে, যেটা লিখিতে যাইতেছিলাম সেটা সাদা কথা, সেটা বেশি কিছু নহে—কিন্তু সেই সোজা কথা, সেই আমার নিজের কথার মধ্যে এমন একটা সুর আসিয়া পড়ে, যাহাতে তাহা বড়ো হইয়া ওঠে, ব্যক্তিগত না হইয়া বিশ্বের হইয়া ওঠে।...

আমি ক্ষুদ্র ব্যক্তি, যখন আমার একটা ক্ষুদ্র কথা বলিবার জন্য চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিলাম, তখন কে একজন উৎসাহ দিয়া কহিলেন, 'বলো, বলো, তোমার কথাটাই বলো। ঐ কথাটাব জন্যেই সকলে হাঁ করিয়া তাকাইয়া আছে।' এই কথা বলিয়া তিনি শ্রোতৃবর্গেব দিকে চাহিয়া চোখ টিপিলেন, স্নিগ্ধ কৌতুকেব সঙ্গে একটুখানি হাসিলেন এবং আমাবই কথার ভিতর দিয়া কী-সব নিজের কথা বলিয়া লইলেন।"

দেশকাল যে মহাকবির অগোচবে তাঁর মধ্যে ক্রিয়াশীল হয় তার সাক্ষ্যপ্রমাণের আর বেশি প্রয়োজন বোধ হয নাই। অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র কবি—রবীন্দ্রসমকালীন অক্ষয় বড়াল বা দেবেন্দ্রনাথ সেন, দ্বিজেন্দ্রলাল বা সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতির মধ্যে সেই সময়কাব দেশকাল বা সামাজিক অভিলাষেব আংশিক প্রকাশ ঘটেছে মাত্র, ববীন্দ্রনাথ তাঁর সর্বগ্রাসী শক্তি নিয়ে আমাদের অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ একাকার ক'বে বিদ্যমান। কাব্যের মধ্যে তাঁর সেই গভীবতা ও ব্যাপ্তিব সংকেতিত প্রকাশ, অনুভবীর কাছেই তা বেদ্য। আব প্রবন্ধাদিতে ঐ গভীব কল্পনাস্রোতবাশির উচ্ছলিত প্রবাহ। আমরা পূর্ব-অধ্যাযে সেই প্রবাহস্বরূপ ব্যক্ত কবতে চেষ্টা কবেছি, এখন মূলস্রোতেব গভীরতা, ঐ ব্যক্তিকবিব মধ্য দিয়ে প্রকাশিত সমাজস্বরূপেব পরিমাপ কবতে প্রয়াসী হচ্ছি।

ববীন্দ্রনাথের প্রথম যৌবনেব লেখায় পরিস্ফুট হতে চেয়েছে কবিচিত্তের মানুষ-সম্পর্কের অভিলাষ ও তার ইতিবৃত্ত। 'ধবায় আছে যত মানুষ শত শত আসিছে প্রাণে মোর' অথবা 'তোমবা তুলিবে ব'লে সকাল বিকাল নব নব সংগীতের কুসুম ফোটাই'—এ সব হ'ল এ ধবনেব মানবিক মনোভাবের কেন্দ্রীয় বাক্য। বৌঠাকুরাণীর হাট, প্রকৃতির প্রতিশোধ, কড়ি ও কোমল, রাজর্ষি, মায়ার খেলা প্রভৃতি কবির প্রাথমিক মানবিকতা, স্নেহ সখ্য প্রণয়ের বিচিত্র জাল-বোনার পরিচয় দেয়। হোক প্রাথমিক, তবু এগুলির মধ্যে কবির অন্তর-ধর্মের, তাঁর ভাবী প্রত্যয়ের একটা আভাস

ফুটে উঠেছে। সেই প্রত্যয় হ'ল, মানুষই চরম সত্য, অভিযাত্রী সংগ্রামী মানুষের মধ্য দিয়েই মহামানবসত্যের প্রকাশ। এই তাত্ত্বিক মানবিকতার উপলব্ধি তাঁর গীতাঞ্জলি রচনাকালে এবং তার পর থেকে ক্রমাগত বর্ধিত। একালের প্রাথমিক স্তরের রচনায় মানবীয় সম্পর্কগুলির প্রতি নিতান্ত প্রীতিপক্ষপাতের মধ্যে পরবর্তী পরিণাম হয়ত সূচিত হচ্ছে। মানবসম্বন্ধ-বশ্যতা তাঁব কবিপ্রকৃতিসিদ্ধ, অথচ এর মধ্যে দেশকালের মর্মগত আকাঙ্ক্ষাও স্ফুরিত হচ্ছে এমন অধ্যয়ন বোধ হয় অসংগত হবে না।

'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' সম্পর্কে মন্তব্যে কবির অনুভূত কারাগারকে আমবা নির্দিষ্ট অর্থেব দ্বাবা সীমিত সাহিত্যিক অবরুদ্ধতা এবং সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার লৌহ-বেষ্টন ব'লে ব্যাখ্যা করেছি। একদা যে অমানবীয় শৃঙ্খলবন্ধন বিষয়ে স্বদেশী আন্দোলনেব দিক্‌ভ্রম ধবিয়ে দিতে রবীন্দ্রনাথকে মন্তব্য কবতে হয়েছিল—"চিত্তবাজ্যে যেখানে বুদ্ধিকে মানি সেখানে আমাব স্ববাজ, সেখানে আমি নিজেকে মানি, অথচ সেই মানাব মধ্যে সর্বদেশের ও চিবকালের মানবচিত্তকে মানা আছে। অবুদ্ধিকে যেখানে মানি সেখানে এমন একটা সৃষ্টিছাড়া শাসনকে মানি যা না-আমাব, না-সর্বমানবেব। সুতরাং সে একটা কাবাগাব, সেখানে কেবল আমাব মতো হাত-পা-বাঁধা এক কারায় অবরুদ্ধ অকালজবাগ্রস্তদেব সঙ্গেই আমার মিল আছে, বাইবের কোটি কোটি স্বাধীন লোকদেব সঙ্গে কোনো মিল নেই। বৃহতের সঙ্গে এই ভেদ থাকাটাই হচ্ছে বন্ধন। ……বিচাবহীন বিধান লোহার চেয়ে শক্ত, কলেব চেয়ে সংকীর্ণ। যে বিপুল ব্যবস্থাতন্ত্র অতি নিষ্ঠুব শাসনের বিভীষিকা সর্বদা উদ্যত রেখে বহু যুগ ধ'বে বহু কোটি নবনাবীকে যুক্তিহীন ও যুক্তিবিরুদ্ধ আচারের পুনরাবৃত্তি কবতে নিয়ত প্রবৃত্ত বেখেছে সেই দেশ-জোড়া মানুষ-পেষা জাঁতাকল কি কল হিসাবে কারও চেয়ে খাটো ? বুদ্ধিব স্বাধীনতাকে অশ্রদ্ধা ক'বে এতো বড়ো সুসম্পূর্ণ সুবিস্তীর্ণ চিত্তশূন্য বজ্রকঠোর বিধিনিষেধের কারখানা মানুষেব বাজ্যে আর কোনোদিন আর কোথাও উদ্ভাবিত হয়েছে ব'লে আমি তো জানিনে ('সমস্যা'-কালান্তর)।" এই এক দিক, আর এক দিক হ'ল ধনতন্ত্র কর্তৃক লক্ষ লক্ষ মানুষের অজগর-গ্রাস—"আজ ধূমকেতু উড়িয়ে কলের শৃঙ্গ বাজল, মানুষকে দলে দলে তার স্নিগ্ধ সমাজস্থিতি থেকে লোভ দেখিয়ে বের করে নিলে। মানুষ আবার ফিরল তার প্রথম আবম্ভেব অবস্থায়—সেই আরণ্যক যুগের বর্বর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যই প্রবল দেহ নিয়ে আজ দেখা দিল, আপন স্বতন্ত্র ভোগের দুর্গ বেঁধে মানুষ অন্যকে শোষণ ও নিজেকে পোষণ কবতে লাগল, তখনকার কালের দস্যুবৃত্তি দেহান্তর ধারণ করলে (পল্লীপ্রকৃতি)।" এ হ'ল মনীষী ও কবির পরিণত প্রৌঢ় মানবিকতার প্রকাশ, মুক্তবুদ্ধির আলোকে ভাস্বর, অভিজ্ঞতা-অধ্যয়নে সমৃদ্ধ,

ধ্রুব ও আন্তরিক। প্রভাত-সংগীত, কড়ি ও কোমল, বিসর্জন প্রভৃতির মধ্যে এই সুকঠোর তীব্র অনুরাগেব কোনো পরিচয় পাওয়া যায় না, সেখানকার মানুষ-সম্পর্ক নিঃশেষে মধুর, প্রিয়জনকে ঘিরে বিচিত্র আশা-অভিলাষে দোলায়িত। কচিৎ সামাজিক বাস্তবতাকে স্পর্শ করেই তা ব্যক্তিক মনোলোকে অন্তর্হিত। সমাজস্পর্শী কবিতা, যেমন 'মানসী' পুস্তকে ধৃত 'দুরন্ত আশা'—নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গের সগোত্র। এই কবিতার বাস্তব-পরিবেশ-সান্নিধ্য অত্যন্ত স্পষ্ট এবং 'ইহার চেয়ে হতেম যদি আরব বেদুয়িন' প্রভৃতির বিদ্রোহ বোম্যান্টিক হলেও তা ভূমিহীন নভোবিহার নয়। বলা যেতে পারে রবীন্দ্রনাথের রোম্যান্টিকতা নিশ্চল রক্ষণশীল জাতের নয় ব'লেই বাস্তব সমাজকেও অনায়াসে স্পর্শ করতে পেরেছে। তবু একালে এই ১৮৮০ থেকে '৮৯ এর মধ্যে রবীন্দ্রনাথের যথার্থ কবিস্বরূপের অস্ফুট অবস্থা। তাঁর বিখ্যাত নিসর্গ-চেতনারও তাই। প্রবল ও বেগবান্ রোম্যান্টিক অভিলাষের প্রাবল্য কবির পদ্মাতীর নিবাসের কিছু পব থেকেই। কি নিসর্গ কি মানুষ এই সময় থেকেই কবিব সর্বগ্রাসী কল্পনা ও চিন্তার অন্তর্ভুক্ত হয়ে একাল থেকেই তাঁর মহাকবিজীবনের যাবতীয় সম্ভাবনা সূচিত করেছে। তবু ১৮৮০ থেকে '৯০ এব পূর্ব পর্যন্ত কবির যে মানবানুরাগ তাও হয়ত বা দেশ ও সমাজেব ব্যাপক মানবিক অভিলাষ থেকে বিচ্যুত নয়।

বাঙ্‌লা সাহিত্যের মধ্যযুগে আত্মপ্রকাশের ও প্রতিষ্ঠার অভিলাষ নিয়ে দেবতা ও মানুষের মধ্যে দ্বন্দ্ব চলেছিল। বৈষ্ণব ধর্মে দেবতাকে একান্ত প্রিয় মানুষ ক'রে নিয়ে এই দ্বন্দ্বের সমাধান যদ্যপি কবা হ'ল, তবু—দেবতা নয়, মানুষ—এবকম সত্যোপলব্ধি সামন্ততান্ত্রিক সংস্কারে ব্যাহত হ'ল। অবশেষে পশ্চিম থেকে আগত নবজীবনবাদের দীক্ষায় শিক্ষিত মহলে শুদ্ধ মানবতাবাদেব উজ্জীবন ঘটল। এর মধ্যে প্রথম ধাপ হ'ল রঙ্গলাল-মধুসূদন-হেমচন্দ্রেব ইতিহাস-পুরাণকে আশ্রয় ক'বে গডা বৃহৎ মানুষের সুবৃহৎ কথাকাহিনী। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁব প্রবন্ধে ও দীনবন্ধু নাট্যে কৃষকজীবনকে স্পর্শ করলেও আত্যন্তিক ভাবে করেন নি, আবাব বিহারীলালেই প্রথম অন্তরঙ্গ মানবিক প্রেমগীতের আভাস পাওয়া গেলেও তা ব্যক্তিসীমাকে ত্যাগ ক'রে ব্যাপকতায় উধাও হয়নি। একমাত্র রবীন্দ্রনাথেই তা হয়েছে, দেশের সাধারণ মানুষ, এমন কি পৃথিবীরও নির্যাতিত মানুষ তাঁর চিন্তা, কর্ম ও ভাবুকতায় ক্রমশঃ অগ্রাধিকার পেয়েছে। মুক্তবুদ্ধি-দীপ্ত ভাব ও কল্পনার অধিকারী রবীন্দ্রনাথের এই ক্রমপরিণামী আশ্চর্য মানুষপ্রীতির উদ্বোধক হিসেবে যদি কারুর নাম করতে হয় তাহ'লে প্রথমতঃ করতে হবে রামমোহনের, দ্বিতীয়তঃ বিবেকানন্দের। রামমোহন যুক্তিবুদ্ধি দিয়ে হিন্দুমুসলমান পার্থক্যের বিনাশ ঘটাতে চেয়েছিলেন, বিবেকানন্দ হিন্দুধর্মকে অক্ষুণ্ন রেখে তার কাঠামোতেই শিক্ষা-দীক্ষায় অন্নেবস্ত্রে লাঞ্ছিত শূদ্রের মনুষ্যত্বে উন্নয়ন চেয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ প্রচলিত

হিন্দুধর্মকেই পার্থক্যের জন্য দায়ী করলেন এবং বিজ্ঞানভিত্তিক সামাজিক দৃষ্টি নিয়ে সংগঠনমূলক বিপ্লব চাইলেন। রবীন্দ্রনাথের রোম্যান্টিক স্বভাব চলিষ্ণু বলেই কল্পনা ও উচ্ছ্বাসে ঊর্ধ্বায়িত খাঁটি বিপ্লবী মনোভাবের সঙ্গে যুক্তিতর্কনিষ্ঠ কৃষক গ্রামসংগঠন পদ্ধতির বিরোধ রইল না। রবীন্দ্র-সমকালে গান্ধীজীর অস্পৃশ্যতা দূরীকরণেব আন্দোলন ববীন্দ্র-প্রার্থিত সামগ্রিক উন্নয়নেব আংশিক ব্যাপার মাত্র ছিল, এজন্য ববীন্দ্র-চিত্তকে তা প্রভাবিত কবতে পারেনি। বস্তুতঃ ১৯০৫ থেকে আরম্ভ ক'রে তাঁর জীবৎকাল পর্যন্ত জাতীয়তাধর্মী এবং সামাজিক যে সব আন্দোলন ঘটেছে তাব পার্শ্ববর্তী হয়েও রবীন্দ্রনাথ তাঁর সুগভীব ব্যাপক ও বাস্তব মানবিকতা নিয়ে গৌরীশৃঙ্গের মত সমুন্নত ও পৃথক থেকে গেছেন। তখনকাব পোলিটিক্যাল ক্ষমতা করায়ত্ত করাব সংগ্রামী বজ্র-বৃষ্টি-কুহেলিকার মধ্যে তাঁর সত্তা দুর্নিরীক্ষ্য থাকলেও আজকেব সমাজ-মুখী জাতীয়তার দিনে তাঁব প্রকৃত স্বরূপ ভাস্বর হয়ে উঠেছে।

ববীন্দ্রনাথের কবিকৃতি দ্বিধা বিভক্ত হয়ে আমাদের কাছে ধরা দিয়েছে। একদিকে তিনি সূক্ষ্ম কলাসৌন্দর্য ও রূপরসের-স্রষ্টা, অন্যদিকে মহাজীবনের দ্রষ্টা। নিসর্গে যে এত আকর্ষণ, এত বহস্যময়তা রয়েছে এবং প্রাকৃত বাঙ্‌লা ভাষার ইন্দ্রজালরচনা-সামর্থ্য যে এতদূব পর্যন্ত অগ্রসর হতে পারে, এ দেখিযে তিনি যেমন আমাদের সাহিত্যিক দুরাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ কবে দিযেছেন, তেমনি পুরাতন প্রথাসিদ্ধ গতানুগতিক দীন জীবনযাত্রাকে ধিক্কার দিয়ে নূতন সমাজে নূতন জীবনেব আশ্বাসে আমাদেব আশাতীতভাবে পুবস্কৃতও করেছেন। তাঁব শত শত কবিতায় নাট্যে গানে প্রবন্ধে নবজীবনের প্রতি আগ্রহ ও দিক্‌-নির্দেশ বযেছে, কখনো সংকেতে কখনো স্পষ্টভাবে। যত দিন যায়, যত তাঁব অনুভব প্রৌঢ় হয়ে ওঠে, ততই তিনি পুরাতনকে ভেঙে নূতন জীবনেব পক্ষপাতী হয়ে ওঠেন। ফাল্গুনী, বলাকা, মহুয়া, মুক্তধারা, রক্ত-করবী, তাসের দেশ, কালের যাত্রা প্রভৃতিতে প্রৌঢ় রবীন্দ্রনাথেব উত্তবোত্তর নবসমাজ দর্শনের আকাঙ্ক্ষা প্রতিবিম্বিত। আর শেষ জীবনে এদেশের মেহনতী সাধারণ মানুষই তাঁর চিত্তকে অধিকার ক'রে তাঁর অনুভূতি ও চিন্তার মধ্যস্থতায় 'আমার দিকে ফিরে তাকাও' এই নৈতিক দাবি আমাদের গোচবে এনেছে।

রবীন্দ্রনাথ কিন্তু আন্তর্জাতিক মানুষের জন্য তেমন বিলাপ করেন নি, যেমন করেছেন স্বদেশেরই হতভাগ্যদের জন্যে। তিনি নিঃশেষ প্রগতিপথিক ছিলেন ব'লে য়ুরোপের সমকালীন প্রগতিচিন্তার ধারা তাঁর মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, আর তার সাহায্যে এদেশীয় গতানুগতিকতাকেই তিনি সংশোধিত করতে চেয়েছেন, তবে যেখানে মানুষ-নিগ্রহের প্রশ্ন সেখানে তিনি তাঁর উদার ব্যক্তিত্বকে প্রসারিত করতে দ্বিধা করেন নি। য়ুরোপীয বাণিজ্যিক রাষ্ট্রস্বার্থ ও উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে সাহসিক ভাষণে তাঁর

নিতান্ত স্বদেশ-প্রীতিরই পরিচয়ও পাওয়া যাচ্ছে। এককালে কাব্যে কবিতায় তাঁর প্রাচীন ভারতীয় জীবনাদর্শের প্রতি পক্ষপাত (চৈতালি, নৈবেদ্য) ঐ সাম্রাজ্যবাদের প্রতিঘাতেই সূচিত হয়েছিল, যদিও নিতান্ত প্রাচীনাসক্তি প্রগতিপরিপন্থী হচ্ছে জেনে আধুনিক সমস্যাবলীর আধুনিক নিরাকরণেই তিনি মনোনিবেশ করেছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দের মত তাঁর সপক্ষেও বলা যায় তাঁর য়ুরোপীয় সারস্বত ভাবসাযুজ্য স্বদেশের পরিবর্তনেই নিয়োজিত হয়েছে।

আমরা পূর্বচিন্তায় ও প্রথম অধ্যায়ে দেখিয়েছি যে রবীন্দ্রনাথ অধ্যাত্মে নিলীন কবি কোনো কালেই ছিলেন না। নিসর্গ এবং মানুষই তাঁর কাব্যের প্রেরণামূল। নিসর্গ-অনুভূতিতে তিনি কোনো কোনো ক্ষেত্রে রহস্য-ভাবুক হয়ে উঠেছেন, ফলতঃ ঐ অংশে তিনি কবি-মিস্টিক, সাধক-মিস্টিক নন। এ নিয়ে অন্যত্রও আমরা যুক্তিতর্কনিষ্ঠ আলোচনা করেছি, তার পুনরুত্থাপন করতে চাই না। মননক্ষেত্রের মত অনুভূতিব ক্ষেত্রেও আমবা তাঁর মানবিক ও সামাজিক প্রকাশ-সাদৃশ্যকে তিনটি পর্বে বিভক্ত ক'বে দেখছি এবং অনুধাবন করছি যে তাঁব সমাজচিন্তা ও মানবিক কাব্যানুভব পৃথক্ কোনো ব্যাপার নয়, তা একই মূলস্কন্ধের দুই শাখা মাত্র। অতএব :

॥ প্রথম পর্ব ॥

১৮৯০ এর পর থেকে ব্যক্তি ও কবি রবীন্দ্রনাথের নোতুন জীবন, শিলাইদহ বাস ও জমিদাবির তদারকিতে গড়াই, পদ্মা, ইছামতী, বড়াল, নাগর প্রভৃতি নদীপথে মধ্য-উত্তরবঙ্গেব পল্লী-অঞ্চল ভ্রমণ। এখন থেকেই নদীবেষ্টিত সমতল বাঙ্‌লাব প্রাকৃতিক পবিবেশ এবং গ্রামীণ কৃষক জীবনের সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গ সম্বন্ধের প্রারম্ভ। এখন থেকেই বাস্তব মাটির পৃথিবীর মধ্যে অনাদি জীবনরহস্যের সূত্র কল্পনা এবং সে 'মাটির কাছাকাছি' মানুষের অন্তরঙ্গ জীবনধারার পরিচয়ে কবিচিত্তের নোতুন ভাববিক্রিয়া। এর পূর্বকালের কাব্য-নাটকে মানবিক সম্পর্কের সাধারণ অভিব্যক্তি মাত্র, এবং ক্বচিৎ সৌন্দর্যসর্বস্বতাও। একমাত্র 'বিসর্জন' নাটকে রবীন্দ্রচিত্তের একটি স্থায়ী সমাজ-ভাবনা একালেই আমাদের প্রগতিমূলক বিবেক ও সহানুভব উদ্বোধিত করেছে—তা হ'ল যান্ত্রিক প্রথার দাসত্ব থেকে মানুষধর্মেব মুক্তি। এরই সমসূত্রে অচলায়তন, কালান্তরের প্রবন্ধাবলী, এমন কি 'তাসের দেশ' পর্যন্ত বিবেচ্য। পদ্মাতীর সংস্পর্শে বহির্বিশ্বহীন আত্মকেন্দ্রিকতা থেকে কবির নিঃশেষ মুক্তি। শহর ও পারিবারিক পরিবেশের বাইরে মাটির পৃথিবী এবং গ্রামীণ মানুষের যে বৃহৎ বিচিত্র ব্যাপার রয়েছে সে বিষয়ে কবির ঔদাসীন্য ঘুচল জমিদারি পরিচালন উপলক্ষ্যে। আর কবির ব্যক্তিগত

চৈতন্যকে আশ্রয় ক'রে দেশ ও সমাজ কবির অগোচরে চিত্তাকর্ষকভাবে আত্মপ্রকাশ করতে লাগল। 'অহল্যার প্রতি' কবিতায় কবির প্রথম নিসর্গ- ও পৃথিবী-চেতনা। এর পর 'যেতে নাহি দিব' 'সমুদ্রের প্রতি' 'বসুন্ধরা'য় কবিকণ্ঠে একে একে অশ্রুতপূর্ব রহস্যকথা শোনা যেতে লাগল। মানুষ যে কেবল নিজের বিরহমিলন নিজের দুঃখসুখ নিয়ে সম্পূর্ণ নয়, নিসর্গ ও মানবসমাজ নিয়েই তার অস্তিত্বের চরিতার্থতা এ রবীন্দ্রনাথই সাহিত্যের মধ্য দিয়ে আমাদের প্রথম শোনালেন। কবির এই প্রবৃত্তির পরিস্ফুট মানবানুগ প্রকাশ হ'ল কয়েকবৎসর পরে লেখা 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতা। নূতন পরিবেশে নবপরিচিতির প্রারম্ভের কথাচিত্র পাই একালের লেখা ছোটো গল্পগুলিতে এবং ছিন্নপত্রাবলীর মধ্যে। রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা, পোস্টমাস্টার, সম্পত্তি-সমর্পণ, মুক্তির উপায়, ছুটি, শাস্তি, সমাপ্তি, মেঘ ও রৌদ্র, সমস্যাপূরণ, অতিথি, উলুখড়ের বিপদ প্রভৃতি গল্পগুলি রবীন্দ্রনাথের পল্লীর মানুষ ও সমাজ সম্পর্কে অভিজ্ঞতার উত্তরোত্তর পরিচয় দেয়। পল্লীগ্রামের ঈর্ষা, দলাদলি, চক্রান্ত, মিথ্যা মোকদ্দমা, পুরাতন সংস্কারে আসক্তি এবং সেই সঙ্গে দাম্পত্যপ্রীতি, বাৎসল্য, সরলতা, ন্যায় ও ধর্মের প্রতি পক্ষপাত প্রভৃতি—একদিকে সংকীর্ণতা অন্যদিকে উদারতার বিচিত্র ও বাস্তব পরিচয় এই গল্পগুলির মধ্যে মিলবে। তাঁর এইসব ছোটগল্পের সাহিত্যিক আকর্ষণ—'অখ্যাত জীবনেও ঘটনার বিস্ময়' নিশ্চয়ই, কিন্তু এদের সমাজচিত্রমূল্যও উপেক্ষণীয় নয় এবং একথা বলা চলে যে রবীন্দ্রনাথই জাতিনির্বিশেষে গ্রামজীবনের সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠতা গড়ে তুললেন এই গল্পগুলির মধ্যস্থতায়। অন্তরঙ্গভাবে লিখিত ছিন্নপত্রাবলীর মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রমনের সমাজমুখী প্রকাশের স্বরূপ নানান্ স্থানেই উজ্জ্বল হয়ে ফুটেছে এবং এর কিছু আমরা পূর্বাধ্যায়ে দৃষ্টান্ত হিসেবে উপস্থাপিতও করেছি। ছিন্নপত্রের সঙ্গে সোনার তরী, চিত্রা, চৈতালির ও গ্রামভিত্তিক ছোটগল্পগুলির সাহিত্যিক সাজাত্যই এর একমাত্র লক্ষণীয় বস্তু নয়, জমিদার রবীন্দ্রনাথের যথার্থ পরিচয়ও এর মধ্যে লভ্য। আর বিশেষভাবে লক্ষণীয় হ'ল কবির বিশিষ্ট চলিষ্ণু ও মানবমুখী বাস্তবতা-সম্পৃক্ত এক আশ্চর্য রোম্যান্টিক ধর্ম। তাঁর রোম্যান্টিকতা ব্যাপক ও সর্বগ্রাসী ছিল ব'লেই নিসর্গ-আত্মীয়তা মৃত্তিকা-প্রীতি ও গ্রামীণ নিরন্ন নিরক্ষর মানুষের জন্য নিবিড় আকর্ষণ একাধারেই সম্ভব হয়েছে। ১৮৯৪এর মার্চে লেখা 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতায়ই কবির বাস্তব মানুষ-সৌহার্দ্যের স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া গেল। 'চিত্রা'র 'দুই বিঘা জমি' বা 'পুরাতন ভৃত্য' এর পরের লেখা। 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতাটির মর্মবাণী হৃদয়ংগম করতে কেবল যে 'রাজনীতির দ্বিধা' 'রাজা ও প্রজা' প্রভৃতি সাম্রাজ্যবাদী ও শাসক-চরিত্রের পরিচায়ক প্রবন্ধ, ছিন্নপত্রাবলীর ৭৭ এবং ৭৯ সংখ্যক পত্র, এবং 'মেঘ ও রৌদ্র' গল্পেরই স্বরূপ জানা প্রয়োজন এমন নয়, কবির

চিঠিপত্রে নানান্ স্থানে মর্মরিত কৃষক-প্রজা সম্পর্কে তাঁর হৃদয়বেদনার পরিচয়ই বিশেষভাবে অনুধাবনীয়। কবিতাটির "বেদনারে করিতেছে পরিহাস স্বার্থোদ্ধত অবিচার" প্রভৃতি পঙ্‌ক্তি ইংরেজ শাসকের অত্যাচারকে নির্দেশ করছে যদিবা, নিম্নলিখিত পঙ্‌ক্তিগুলি নিঃসন্দেহে সহস্র শতাব্দী বাহিত কৃষকজীবনের সামন্ততান্ত্রিক দুর্বিপাক সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। কবি যেন প্রত্যক্ষ থেকেই লিখছেন—

"ওই যে দাঁড়ায়ে নতশির
মূক সবে—ম্লান মুখে লেখা শুধু শত শতাব্দীর
বেদনার করুণ কাহিনী, স্কন্ধে যত চাপে ভার
বহি চলে মন্দগতি, যতক্ষণ থাকে প্রাণ তার—
তারপরে সন্তানেরে দিয়ে যায় বংশ বংশ(ধরি,
নাহি ভর্ৎসে অদৃষ্টেরে, নাহি নিন্দে দেবতারে স্মরি,
মানবেরে নাহি দেয় দোষ, নাহি জানে অভিমান,
শুধু দুটি অন্ন খুঁটি কোনোমতে কষ্টক্লিষ্ট প্রাণ
রেখে দেয় বাঁচাইয়া। সে অন্ন যখন কেহ কাড়ে,
সে প্রাণে আঘাত দেয় গর্বান্ধ নিষ্ঠুর অত্যাচারে
নাহি জানে কার দ্বারে দাঁড়াইবে বিচারের আশে"—ইত্যাদি

এই প্রত্যক্ষতার প্রতিধ্বনি পরে তাঁর নবসমাজগঠনের আহ্বানের মধ্যেও নানা স্থানে ফুটেছে, যেমন ১৯১৫ খ্রীঃ ভাষিত লোকহিত প্রবন্ধের একাংশে শিক্ষিত শ্রেণীর উপর অভিযোগ ক'রে—"আমাদের ভদ্রসমাজ আরামে আছে, কেননা আমাদের লোক-সাধারণ নিজেকে বোঝে নাই। এইজন্যই জমিদার তাহাদিগকে মারিতেছে, মহাজন তাহাদিগকে ধরিতেছে, মনিব তাহাদিগকে গালি দিতেছে, পুলিস তাহাদিগকে শুষিতেছে, গুরুঠাকুর তাহাদের মাথায় হাত বুলাইতেছে, মোক্তার তাহাদের গাঁট কাটিতেছে, আর তাহারা কেবল সেই অদৃষ্টের নামে নালিশ করিতেছে যাহার নামে সমন জারি করিবার জো নাই।" কবি এই সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে ভাষা দেওয়ার জন্য যে আহ্বান জানিয়েছেন তার সার কথা হ'ল এদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার, যাতে তারা নির্ভয়ে অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে পারে এবং নিজের জোরে মনুষ্যত্ব অর্জন করতে পারে। এরই বাস্তব সংগঠনের স্বরূপ আমরা পূর্ব অধ্যায়ে বিস্তৃত করেছি। এই দিক থেকে ১৯০৪ এর স্বদেশী-সমাজ গঠনের আহ্বানের বীজ ১৮৯৪ খ্রীস্টাব্দেই আমরা দেখছি। একালের অন্যান্য কবিতার সঙ্গে তুলনায় এই কবিতাটিতে কল্পনার পরিবর্তে বাস্তব সংস্পর্শ এবং আর্টের পরিবর্তে আন্তরিক সহানুভূতির গভীরতা লক্ষণীয়। কবিতাটিতে কৃষক প্রজাদের দুর্গত অবস্থার সঙ্গে স্বার্থসীমায় বদ্ধ তখনকার শিক্ষিত বা

বুর্জোয়া শ্রেণীর পার্থক্যও দেখানো হয়েছে—"স্বার্থমগ্ন যে জন বিমুখ বৃহৎ জগৎ হ'তে" প্রভৃতি বাক্যে, আর কিছু পরেই কবি সংগঠনের পথ প্রস্তুত ক'রে কর্মক্ষেত্রে নিজেও যে নামলেন, তার দৃষ্টান্তে কবিতাটিব নিতান্ত আন্তরিকতা প্রমাণিত হয়। বস্তুতঃ রবীন্দ্রনাথের সমাজমুখী ব্যক্তিত্বের বিকাশের প্রথম পর্বেব সঙ্গে 'এবার ফিরাও মোরে' সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য রেখেছে, কবিকল্পনা ও মনস্বীর মননের ঐক্য প্রমাণিত করেছে, সুতরাং এটিই একালের সাংগঠনিক সংগ্রামেব কেন্দ্রীয় কবিতা। আত্মনিলীনতা অতিক্রম ক'রে দেশ ও সমাজের অভিমুখীন হওযাকে রবীন্দ্রনাথ যে তাঁর নিজ জীবনেব গুরুতব ও কাম্য পরিবর্তন ব'লে অনুভব করেছেন তাব পরিচয় বয়েছে পববর্তী 'অন্তর্যামী' কবিতায়। এতে কাব্যবচনায ও জীবনপথে দৈবাধীনতা অর্থাৎ দুর্জ্ঞেয় সমাজ-ইতিহাসের নৈসর্গিক নিয়মেব অধীনতা ব্যক্ত হযেছে—এবিষয়টি আমবা প্রারম্ভেই নির্দেশ কবেছি।

কবিচিত্তে লাঞ্ছিত সাধাবণ মানুষেব অভিঘাতের এই প্রতিক্রিয়ার পব এবং তাঁব প্রকৃত গ্রাম-সংগঠন ও কৃষক-সংগঠনেব আহ্বানের মধ্যে জাতীযতাব উদ্বোধনেব সূত্রে একটি সাহিত্যিক অধ্যায়ের সূচনা হয় যাতে কবি কিছুদিন প্রাচীন ভারতেব বৈদিক ও বৌদ্ধ যুগেব সবল ও উদাব-জীবনধারার স্বপ্নে নিমগ্ন হয়ে পডেন। সংকীর্ণতাব কলঙ্কে সমাচ্ছন্ন মধ্যযুগেব অপ্রত্যাশিত উদাব মানবিকতাব, ভক্তি ও পৌরুষের কয়েকটি কাহিনীও কবিকে আকৃষ্ট কবে। বলা চলে, এই সময়টি কবিকে আশ্রয় ক'রে ভাবতের জাতীয় মহিমার অভিব্যক্তির কাল। বাস্তব-আসঙ্গ গৌণ হয়ে কবির এরকম আদর্শলোকে পবিভ্রমণেব মূলে দুটি সামাজিক কারণ কাজ করেছে বলা যেতে পাবে। একটি হ'ল শিক্ষিত সমাজেব দেশেব মাটি ত্যাগ ও ইংবেজ-মুখাপেক্ষিতা, অন্যটি হ'ল চাবিত্রিক সংকীর্ণতা। এই আদর্শলোকে ভ্রমণকে রোম্যাণ্টিক পলায়নকামিতা মনে করলে ভুল হবে। তবে এরই সঙ্গে সাহিত্যিকের প্রাচীন সৌন্দর্যবাজ্যে পবিভ্রমণও স্বাভাবিক ভাবেই যুক্ত হয়ে পডেছে। মুখ্যতঃ 'কল্পনা'য সৌন্দর্যলোক এবং 'কথা' ও 'নৈবেদ্যে' আদর্শলোকের পবিচয় ফুটেছে। কিন্তু লক্ষণীয় এই যে, আদর্শ-উদ্বোধনের মধ্যে রক্ষণশীলতার আভাস ফুটতেই (যেমন নববর্ষ, ব্রাহ্মণ, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা প্রভৃতি—'স্বদেশ' পুস্তক) কবি-মনীষী দ্রুতগতিতে এ পথ ত্যাগ করেছেন এবং য়ুরোপীয় প্রগতিমূলক জীবনের রসাযনে আমাদের মধ্যযুগাশ্রিত অন্ধ, জড়, সংকীর্ণ জীবনের সংশোধন চেয়েছেন। যে দুটি অভিঘাতের ফলে কবির প্রাচীনতাপ্রীতি ঘটেছে তার পরিচয়ও চৈতালি উৎসর্গ নৈবেদ্যেব কয়েকটি কবিতায় [যেমন—'সভ্যতার প্রতি', 'তপোবন', 'প্রাচীন ভারত', প্রভৃতি (চৈতালি) ; 'একদা এ ভারতের কোন্ বনতলে' এবং 'হে ভারত, নৃপতিরে শিখায়েছ তুমি' প্রভৃতি (নৈবেদ্য) , 'হে বিশ্বদেব, মোর কাছে

তুমি' 'হে ভারত আজি নবীন বর্ষে' প্রভৃতি (উৎসর্গে)] কবি দিয়েছেন। কিন্তু এবিষয়ে যা প্রণিধানযোগ্য তা হ'ল এই যে মধ্যযুগ থেকে প্রবাহিত আধুনিক সংকীর্ণ সমাজ-জীবনের বিকৃতিই কবিকে আহত ক'রে অন্যত্র আশ্রয় খুঁজতে বাধ্য করেছে। শিক্ষিত সমাজেব স্বদেশঘৃণাও ঐ মধ্যযুগীয় শ্রেণীস্বার্থবোধের কলঙ্কে কলঙ্কিত। এই জন্য আশ্রয় তিনি প্রথমে চেয়েছেন প্রাচীনে, পরে চেয়েছেন য়ুরোপীয় জীবনের গতি-শীলতায়। প্রচলিত ভারতীয় জীবনের জড়তা ও ক্ষুদ্রতার দিক তাঁর একালকার প্রাচীনতাপ্রীতির মধ্যেও বারংবার প্রকাশিত হয়েছে, যেমন, চৈতালির 'অন্ধ মোহবন্ধ তব দাও মুক্ত কবি' 'পুণ্যে পাপে দুঃখে সুখে পতনে উত্থানে' 'যে নদী হারায়ে স্রোত চলিতে না পারে' 'কারে দিব দোষ, বন্ধু' 'কে তুমি ফিরিছ পরি প্রভুদের সাজ', কল্পনা কাব্যের 'বঙ্গলক্ষ্মী' কবিতা, 'ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ' 'বিদায়' 'উন্নতি লক্ষণ' এবং সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হ'ল 'বর্ষশেষ'। এই 'বর্ষশেষ'ই 'এবার ফিরাও মোরে'র পর ঐ শ্রেণীর দ্বিতীয় কবিতা যার মধ্যে তীব্র অসহিষ্ণুতা এবং স্পষ্টোক্তির সন্নিবেশে সামন্ত-তান্ত্রিক অবক্ষয়ের ছবি তুলে ধরা হয়েছে। 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতার বেদনা-কাতর মানুষপ্রীতি এর মধ্যে নেই, তার পরিবর্তে রয়েছে প্রচলিত সমাজ-জীবনের উপর তীব্র ঘৃণা। এই কবিতাটি পড়লেই বোঝা যায়, কবি একালে কেন প্রাচীন ভারতীয় জীবনের দিকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। কবিতাটির মূল প্রেরণা নিসর্গ নয়, আমাদের স্বার্থমলিন সংকীর্ণ স্থবির সমাজজীবন, যেমন—

খিন্ন শীর্ণ জীবনের শতলক্ষ ধিক্কার লাঞ্ছনা ‥ ‥
শুধু দিনযাপনের শুধু প্রাণধারণের গ্লানি,
শরমের ডালি,
নিশি নিশি রুদ্ধ ঘরে ক্ষুদ্রশিখা স্তিমিত দীপের
ধূমাঙ্কিত কালি।……
সহে না সহে না আর জীবনেরে খণ্ড খণ্ড করি
দণ্ডে দণ্ডে ক্ষয়।

এই অর্থেই তাঁর নবজীবনের প্রতি আগ্রহ এবং প্রাচীনের মহিমাবর্ণন। সমাজে বঞ্চিত মানুষ যারা অদৃষ্টকে দায়ী ক'রে বসে আছে তাদের উৎসাহিত করার জন্য 'হতভাগ্যের গান' কবিতায় "হাস্যমুখে অদৃষ্টেরে করব মোরা পরিহাস" এরকম বাক্যের গ্রন্থন এবং অন্য কয়েকটি কবিতায় দুরূহ সংগ্রামের প্রেরণা সঞ্চার। রবীন্দ্রচিত্তে খেয়ালখুশী ও পালাবদলের ক্রিয়া অনেকেই লক্ষ্য করেছেন। আমাদের কাজ হ'ল এগুলিকে সমন্বিত ক'রে দেশ ও কালের মর্মের সঙ্গে মহাকবির আত্মপ্রকাশের সংগতি নির্ণয় করা। কল্পনার প্রাচীন সাহিত্য-সংসর্গ এবং নৈবেদ্যের ভারতমহিমা

ও ঈশ্বরকথার মাঝে 'ক্ষণিকা' এমনি এক অদ্ভুত সৃষ্টি। 'ক্ষণিকা'র সহজ সরস ও বিশুদ্ধ কবিত্বের তুলনা নেই, আবার, ক্ষণিকায় প্রকৃতি এবং মানুষ সুদূরলোকের নয়, একেবারে গ্রামীণ। ১৮৯০-৯১ থেকে কবির পরিস্ফুট পল্লীপ্রীতিব প্রারম্ভ, ছিন্নপত্রে এবং ছোটগল্পে যার স্বাক্ষর। ছিন্নপত্রে তবু সোনাবতরী-চিত্রা পর্যায়ের নিরুদ্দেশ সৌন্দর্যভাবনার পরিচয় আছে, ছোটগল্পগুলি একেবারে কাছাকাছি-পাওয়া পল্লীমানুষের কথা। ছোটগল্পের প্রাথমিক স্তর পেবিয়ে এই নিত্যসহচর নিসর্গ ও মানুষের কথা প্রকাশ পেয়েছে চৈতালি ও ক্ষণিকায়। রবীন্দ্রনাথ নিজের সম্বন্ধে একটুও অত্যুক্তি করেন নি যখন তিনি বলেছেন যে বাঙ্‌লা সাহিত্যে তিনিই প্রথম বিচিত্র পল্লীর মানুষের সুখদুঃখেব কথা নিয়ে লিখেছেন। এ ব্যাপাবটিকে অহেতুক অনির্দেয পালাবদল হিসেবে নয়, তাঁব চিত্তেব গভীরতব প্রবর্তনা থেকেই উদ্ভূত ধবতে হবে। দেখতে হবে তাঁর গ্রামপ্রীতি, কৃষকপ্রীতি, গ্রামসংগঠনের আগ্রহ একই সূত্র ধ'রে চালিত হয়েছে, ভাবুকতা এবং কর্মপ্রেরণা বিচ্ছিন্ন ব্যাপার নয়। ক্ষণিকায়—কূলে ('আমাদের এই নদীব কূলে'), এক গাঁযে ('আমবা দুজন একটি গাঁয়ে থাকি'), দুই তীবে ('আমি ভালোবাসি আমায়'), অতিথি ('ঐ শোনো গো অতিথ্‌ বুঝি'), বিবহ ('তুমি যখন চলে গেলে'), ক্ষণেক দেখা ('চলেছিলে পাড়ার পথে'), অকালে (' ভাঙা হাটে কে ছুটেছিস'), আষাঢ় ('নীল নবঘনে'), দুই বোন ('দুই বোন তাবা হেসে যায় কেন'), অবিনয় ('হে নিরুপমা') এবং 'কৃষ্ণকলি' এরকম সুগভীব পল্লী-সংসর্গের পবিচযবাহী ব'লেই ববীন্দ্রনাথেব বৈশিষ্ট্যেবও পরিচাযক।

॥ দ্বিতীয় পর্ব ॥

বাংলা সন ১৩১৭ এবং খ্রীস্টাব্দ ১৯১০ এ লেখা গীতাঞ্জলিব কয়েকটি কবিতায ববীন্দ্রনাথের সাধারণ মানুষপ্রীতির কযেকটি চরম মুহূর্তেব পবিচয় পাওয়া যায। একালে রবীন্দ্রচিত্তে প্রাচীনেব কাব্যিক মোহ অপসৃত। বছব পাঁচেক আগে থেকেই অর্থাৎ 'খেয়া'র বচনাকাল থেকেই পুনরায় নিসর্গ এসে কবিচিত্ত জুড়ে বসেছে। আগেকার সঙ্গে পার্থক্য এই যে, সহজ পল্লীনিসর্গ কবিচিত্তে একটি নিবিড় বসাপ্লুত এমন এক তন্ময় অবস্থার সৃষ্টি করেছে যা পূর্বে দেখা যাযনি। পূর্বেকার বোম্যান্টিক সুদূবসঞ্চরণের প্রবল আগ্রহও এখন নেই। এখন সহজ সাধারণেব মধ্য দিয়ে সহজানন্দ লাভের প্রবৃত্তি। গীতাঞ্জলির গানগুলিতেও নিতান্ত সহজ সাধারণই কবিকে আবিষ্ট করেছে, ভাষা-ভঙ্গীতেও এই সহজের বিস্তাব খেয়াব মত গীতাঞ্জলিরও লক্ষণীয় বিষয়—'আমার এ গান ছেড়েছে তার সকল অলংকার'। প্রায় 'খেয়া'র

সময় থেকেই রবীন্দ্রনাথের স্বকীয় পল্লীমুখী কৃষককেন্দ্রিক স্বাদেশিকতার প্রারম্ভ, এই সময়ে বাউলগান, আরও পূর্ব থেকে পল্লীর ছড়া ও ছড়াজাতীয় লৌকিক রচনার দিকেও কবির আগ্রহ। সব মিলে কবিকে এসময় সহজের ও সামান্যের নিতান্ত পক্ষপাতী ক'রে তুলেছে। গীতাঞ্জলির নিসর্গ ঠিক খেয়া বা ক্ষণিকার পল্লী-চিহ্নিত নিসর্গ না হ'লেও পূর্বেকার সর্বাতিশায়ী সৌন্দর্য-কল্পনা বা মর্ত-চেতনার গভীরতা থেকে গীতাঞ্জলির নিসর্গ বঞ্চিত। উৎসর্গ-খেয়ার সময় থেকে ধীরে ধীরে নিসর্গচারী ও মানুষজীবনবিহারী একটি সত্তার ধারণায় কবি এসে পৌঁছেন, তার ভাবুকতাময় স্বীকৃতি ও তার কাছে আত্মসমর্পণের অভিলাষ গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্যের কিছু গানে কাব্যার্থরূপে পরিস্ফুট হয়েছে। আমরা পূর্বে বুঝিয়েছি যে এ সত্তা আমাদের পরিচিত কোনো ঈশ্বর নয়, এ নিজ উপলব্ধির সূত্রে পাওয়া কবির মিস্টিক কল্পনা মাত্র। এবং এই অরূপ-ভাবুকতার অংশ ত্যাগ ক'রে গীতাঞ্জলি-গীতামাল্যকে স্বচ্ছন্দে নিসর্গ ও মানবহৃদয়ের কাব্য ব'লে গ্রহণ করা চলে। রবীন্দ্রনাথের চলিষ্ণু রোম্যান্টিক প্রবৃত্তি গীতাঞ্জলির সময়কার তথাকথিত ঈশ্বরভাবুকতার মধ্যেই সাধারণ মানুষকে চরমমূল্যে মূল্যবান্ ক'রে দেখেছে এইটিই বিশেষভাবে লক্ষণীয়। একথা বলা ঠিক হবে না যে আধ্যাত্মিক প্রত্যয়ে দাঁড়িয়ে সেই প্রত্যয়ের আলোকে তিনি মানুষকে দেখেছেন। বরঞ্চ এই উপলব্ধিই যথার্থ হবে যে মানবিক স্নেহপ্রেমের অপূর্বতার সূত্রেই তিনি ঐ সত্তার লীলা অনুভব করেছেন, যেমন করেছেন নিসর্গ-সৌন্দর্যে বিহ্বল হয়ে। নিতান্ত সাধারণ মেহনতী মানুষের ক্ষেত্রে বিশেষ হ'ল তাদের চরিত্রে কর্মীরূপ, বিশ্বাস, সেবা, সরলতা, সহিষ্ণুতা প্রভৃতি গুণের সন্নিবেশ। কৃষক জীবনের এই পরিচয় ছিন্নপত্রেই নানা স্থানে রয়েছে। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা এবং অতিপ্রবল সহানুভূতি কবিকে যেমন কৃষি-সংগঠনে প্রবৃত্ত করেছে তেমনি এদের মধ্যেই স্রষ্টার চরমতম প্রকাশ এই ধারণায় উপনীত করেছে—

তিনি গেছেন যেথায় মাটি কেটে
করছে চাষা চাষ—
পাথর ভেঙে কাটছে যেথায় পথ—
খাটছে বারো মাস।

অথবা, 'সবার পিছে, সবার নীচে, সব-হারাদের মাঝে'।

এই সময়েই লেখা 'অপমান' ('হে মোর দুর্ভাগা দেশ') রবীন্দ্রনাথের নিশ্চিত সমাজমুখিতার এবং অমানবীয় সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধে প্রবল অসম্মতির অন্যতম কবিতা। কবিতাটির বক্তব্য এত স্পষ্ট ও সম্পূর্ণ যে রবীন্দ্রনাথ যদি এ বিষয়ে এই একটি রচনাই রেখে যেতেন তবু তাঁকে আধুনিক বাঙ্লার শ্রেষ্ঠ সমাজবাদী ব'লে

গ্রহণ করতে আমাদের বাধা থাকত না এবং মানবপ্রেমের পথে কার্লমার্কস-লেনিন-গান্ধী-বিবেকানন্দের সহযাত্রী হিসেবে তাঁকে ঐ রচনাব জন্যেই স্বচ্ছন্দে চিহ্নিত করা চলত। এই কবিতার প্রথমে 'অপমান' বলতে জাতিবর্ণবিভাগ জনিত অপমানকেই বোঝাচ্ছে। 'অপমানে হতে হবে' বা 'মৃত্যুমাঝে হবে তবে' ইত্যাদি উক্তিতে অনিবার্য ভাবী বিপ্লবের আভাস দেওয়া হয়েছে। 'মানুষের পরশেরে' প্রসঙ্গে দশ বৎসব পরবর্তী গান্ধীজীর অস্পৃশ্যতা-বিরোধী আন্দোলন স্মরণীয়। বিধাতার রুদ্ররোষ বলতে মহাযুদ্ধ, বৈপ্লবিক সংগ্রাম প্রভৃতি বোঝাচ্ছে। যেহেতু ইতিহাসেব গতি পূর্বাহ্ণে নির্ণয় করা যায় না, সেজন্যই অ-দৃষ্ট ইতিহাস-বিধাতাব রুদ্ররোষ কল্পনা কবা হয়েছে। হিন্দু-মুসলমান এই মেহনতী মানুষই দেশের যথার্থ শক্তি, তাদেব দাবিদ্র্য ও অজ্ঞতার মধ্যে রাখাব অর্থ নিজেব পায়েই কুঠাবাঘাত করা। তুলনীয় "এক পক্ষকে দুর্বল কবিযা নিজেব স্বেচ্ছাচাবের শক্তিকে কেবলই বাধাহীন করিতে থাকা আর ডাইনামাইট বুকেব পকেটে লইয়া বেডানো একই কথা—একদিন প্রলয়েব অস্ত্র বিমুখ হইয়া অস্ত্রীকেই বধ করে" (পাবনা সম্মিলনীতে ভাষণ)। তুলনীয় বিবেকানন্দ "ভাবতে দুই মহাপাপ—মেয়েদেব পায়ে দলানো, আব জাতি জাতি ক'বে গবীবগুলোকে পিষে ফেলা।" এবং "যতদিন ভাবতেব কোটি কোটি লোক দাবিদ্র্য ও অজ্ঞানান্ধকাবে ডুবে রয়েছে ততদিন তাদেব পয়সায় শিক্ষিত অথচ তাদেব দিকে চেয়েও দেখছে না, এরূপ প্রত্যেক ব্যক্তিকে আমি দেশদ্রোহী ব'লে মনে কবি।" 'চবণে দলিত হয়ে ধুলায় সে যায় বয়ে' ইত্যাদি ভাষণে সমাজবাদী কবির গভীব সহানুভূতি লক্ষণীয়। পববর্তী স্তবকে "তোমাব মঙ্গল ঢাকি গড়িছে সে ঘোব ব্যবধান" প্রভৃতিব মধ্যে শ্রেণীভেদ ও অনিবার্য শ্রেণী-সংঘাতেব বিষয় ব্যক্ত করা হয়েছে। "শতেক শতাব্দী ধরে" প্রভৃতি উক্তিতে বৌদ্ধযুগের পরবর্তী মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক পবিস্থিতিব বিষয় বলা হয়েছে। এর ইতিহাসানুগত পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা কবি দিয়েছেন কয়েকমাস পবে লেখা "ভাবতবর্ষে ইতিহাসেব ধারা" প্রবন্ধে ('পরিচয়' দ্রঃ)। 'মানুষেব নাবায়ণে' এবং 'হীন পতিতের ভগবান' প্রভৃতি বর্ণনায় কবিচিত্তে বিবেকানন্দেব স্মৃতি লক্ষণীয়। "অভিশাপ আঁকি দিল" প্রভৃতিতে সূচিত অভিশাপ অসহিষ্ণু কবিবই, যিনি এই জঘন্য শ্রেণীশোষণের ইতিহাসানুগত পবিণাম স্বকীয় যুক্তি ও উপলব্ধি অনুসাবেই প্রত্যক্ষ করেছেন। ইতিহাস-বিধাতা সংঘাতময় দুর্যোগের মধ্য দিযে কিভাবে লাঞ্ছিত মানুষের মুক্তি নিয়ে আসবেন তাব ছবি পাওয়া যাবে বলাকার 'পাড়ি' কবিতাব মধ্যে।

গীতাঞ্জলির আর একটি উল্লেখ্য কবিতা হ'ল 'বজ্রে তোমাব বাজে বাঁশি'। এইটির এবং সেইসঙ্গে খেয়া কাব্যেব "আগমন" কবিতার সংকেত ব্যাখ্যা কবি নিজেই করেছেন। তাতে দেখা যায় কবি সমাজের বিরোধ-বিপ্লবকে সত্যের মূল্য দিয়েছেন।

আর দেখা যায়, শান্ত সুন্দর সুসমঞ্জস পরিস্থিতি মানবসমাজের লক্ষ্যবস্তু হলেও মনস্বী ও মহাকবির প্রতীতিতে সংঘাত ছাড়া যথার্থ সামঞ্জস্য আসতে পারে না। একথা তিনি হেগেলীয় তত্ত্বের অনুসরণে বলছেন না, স্বকীয় ইতিহাস অধ্যয়নে অনুভব করেছেন তার পরিচয় অন্যত্রও যথেষ্ট রয়েছে। 'আত্মপরিচয়ে'র এই প্রবন্ধটিতে উক্ত 'আগমন' কবিতা, 'বজ্রে তোমার বাজে বাঁশি' এবং গীতালির 'এক হাতে ওর কৃপাণ আছে, আর এক হাতে হার' প্রভৃতি কবিতার সমাজ-সংঘর্ষমূলক ব্যাখ্যার ভূমিকা দিতে গিয়ে কবি 'বিচিত্র প্রবন্ধে'র অন্তর্গত 'পাগল' প্রবন্ধের উপলব্ধিও ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলছেন—

"এই সৃষ্টির মধ্যে একটি পাগল আছেন, যা-কিছু অভাবনীয়, তাহা খামখা তিনিই আনিয়া উপস্থিত করেন। ··· যাহা হইয়াছে, যাহা আছে, তাহাকেই চিরস্থায়িরূপে রক্ষা করিবার জন্য সংসারে একটা বিষম চেষ্টা রহিয়াছে—ইনি সেটাকে ছারখার করিয়া দিয়া, যাহা নাই তাহারই জন্য পথ করিয়া দিতেছেন। ইঁহার হাতে বাঁশি নাই, সামঞ্জস্যের সুর ইঁহার নহে, বিষাণ বাজিয়া উঠে, বিধিবিহিত যজ্ঞ নষ্ট হইয়া যায় এবং কোথা হইতে একটি অপূর্বতা উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসে। ·· সেই ভয়ংকর, প্রকৃতির মধ্যে একটা অপ্রত্যাশিত উৎপাত, মানুষের মধ্যে একটা অসাধারণ পাপ আকারে জাগিয়া উঠে। তখন কত সুখমিলনের জাল লণ্ডভণ্ড, কত হৃদয়ের সম্বন্ধ ছারখার হইয়া যায়। ·····

'খেয়া'তে আগমন ব'লে যে কবিতা আছে, সে কবিতায় যে মহারাজ এলেন তিনি কে? তিনি যে অশান্তি। সবাই রাত্রে দুয়ার বন্ধ ক'রে শান্তিতে ঘুমিয়ে ছিল, কেউ মনে করেনি তিনি আসবেন। যদিও থেকে থেকে দ্বারে আঘাত লেগেছিল, যদিও মেঘগর্জনের মতো ক্ষণে ক্ষণে তাঁর রথচক্রের ঘর্ঘর-ধ্বনি স্বপ্নের মধ্যেও শোনা গিয়েছিল তবু কেউ বিশ্বাস করতে চাচ্ছিল না যে তিনি আসছেন, পাছে তাদের আরামের ব্যাঘাত ঘটে। কিন্তু দ্বার ভেঙে গেল—এলেন রাজা।

ওরে দুয়ার খুলে দে রে,
বাজা শঙ্খ বাজা।
গভীর রাতে এসেছে আজ
আঁধার ঘরের রাজা।
বজ্র ডাকে শূন্যতলে
বিদ্যুতেরি ঝিলিক ঝলে

ছিন্নশয়ন টেনে এনে
আঙিনা তোর সাজা।
ঝড়েব সাথে হঠাৎ এল
দুঃখবাতেব বাজা।

ওই 'খেয়া'তে 'দান' বলে একটি কবিতা আছে। তাব বিষয়টি এই যে, ফুলেব মালা চেয়েছিলুম, কিন্তু কী পেলুম।

এ তো মালা নয় গো, এ যে
তোমার তববাবি।
জ্বলে ওঠে আগুন যেন,
বজ্র হেন ভাবি—
এ যে তোমাব তববাবি।

এমন যে দান এ পেযে কি আব শান্তিতে থাকবাব জো আছে। শান্তি যে বন্ধন যদি তাকে অশান্তির ভিতব দিযে না পাওয়া যায়। ⋯ চবম সত্য এবং পবম সত্য হচ্ছে ঐ প্রসন্ন মুখ। সেই সত্যই হচ্ছে সকল রুদ্রতাব উপবে। কিন্তু এই সত্যে পৌঁছতে গেলে রুদ্রেব স্পর্শ নিযে যেতে হবে। রুদ্রকে বাদ দিযে যে প্রসন্নতা, অশান্তিকে অস্বীকাব ক'বে যে শান্তি, সে তো স্বপ্ন, সে সত্য নয।

বজ্রে তোমাব বাজে বাঁশি,
সে কি সহজ গান। ⋯⋯
আবাম হতে ছিন্ন কবে
সেই গভীবে লও গো মোবে
অশান্তিব অন্তবে যেথায
শান্তি সুমহান।"

এই ব্যাখ্যা থেকে দেখা গেল রবীন্দ্রনাথ যদিও শান্তি ও সামঞ্জস্যকেই সমাজস্থিতির শেষ লক্ষ্য ব'লে মনে করেন, কিন্তু বিপ্লব ও ভাঙন ছাড়া জোড়াতালি-দেওয়া সংস্কারমূলক সামঞ্জস্যকে সামঞ্জস্য বলতে রাজি নন। এ হ'ল প্রকৃত বিপ্লবীর কথা। পুবাতন পাপের সম্পূর্ণ নিবাকবণ, সমাজের গ্লানিব নিঃশেষে মোচন ছাড়া কাজ-চলা গোছের সামঞ্জস্যকে বিপ্লবীও সামঞ্জস্য বলবেন না। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একালকাব সমাজ-অধ্যয়ন থেকে নিম্নলিখিতরূপ উক্তি সমাহবণ কবা যেতে পারে—

"সমাজেব ভিত্তিই হচ্ছে সামঞ্জস্য। তাই যখনই সেই সামঞ্জস্য নষ্ট হয়ে এমন সকল রিপু প্রবল হয়—এমন সকল ব্যবস্থা-বিপর্যয় ঘটে যা সমাজবিরুদ্ধ,

যাতে ক'রে অল্প লোকে বহুলোকের সংস্থানকে নষ্ট করে, তাদের সকলকে আপন ব্যক্তিগত ঐশ্বর্যবৃদ্ধির উপায়রূপে ব্যবহার করতে থাকে, তখন হয় সমাজ সেই অত্যাচারে জীর্ণ হয়ে বহু লোকের দুঃখ ও দাস্যভারে আধ-মরা হয়ে থাকে, নয় তার আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি বিদ্রোহী হয়ে ওঠে।" (সমবায়নীতি)

"মোট কথা হচ্ছে, আধুনিক কালে ব্যক্তিগত ধনসঞ্চয় ধনীকে যে প্রবল শক্তির অধিকার দিচ্ছে তাতে সর্বজনের সম্মান ও আনন্দ থাকতে পারে না। তাতে এক পক্ষে অসীম লোভ, অপর পক্ষে গভীর ঈর্ষা, মাঝখানে দুস্তর পার্থক্য। সমাজে সহযোগিতার চেয়ে প্রতিযোগিতা অসম্ভব বড়ো হয়ে উঠল। এই প্রতিযোগিতা নিজের দেশের এক শ্রেণীর সঙ্গে অন্য শ্রেণীর, এবং বাইরে এক দেশের সঙ্গে অন্য দেশের। তাই চারদিকে সংশয়হিংস্র অস্ত্র শাণিত হয়ে উঠেছে, কোনো উপায়েই তার পরিমাণ কেউ খর্ব করতে পারছে না। আর পরদেশী যারা এই দূরস্থিত ভোগরাক্ষসের ক্ষুধা মেটাবার কাজে নিযুক্ত তাদের রক্তবিরল কৃশতা যুগের পর যুগ বেড়েই চলেছে। এই বহু-বিস্তৃত কৃশতার মধ্যে পৃথিবীর অশান্তি বাসা বাঁধতে পারে না, একথা যারা বলদর্পে কল্পনা করে তারা নিজের গোঁয়ার্তমির অন্ধতার দ্বারা বিড়ম্বিত। যারা নিরন্তর দুঃখ পেয়ে চলেছে সেই হতভাগারাই দুঃখবিধাতার প্রেরিত দূতদের প্রধান সহায়, তাদের উপবাসের মধ্যে প্রলয়ের আগুন সঞ্চিত হচ্ছে।" (রাশিয়ার চিঠি—উপসংহার)

তা ছাড়া যুদ্ধবিপ্লবের মধ্য দিয়ে স্থায়ী কল্যাণ প্রতিষ্ঠার প্রত্যাশা কবির শান্তিনিকেতন ভাষণমালার 'অমৃতের পুত্র' 'মা মা হিংসীঃ' প্রভৃতির মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। পূর্ব অধ্যায়েই এগুলির দিকে আমরা পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে দেখিয়েছি রবীন্দ্রনাথ কেন প্রথম মহাযুদ্ধকে অভিনন্দিত করেছেন। এখানে প্রসঙ্গক্রমে একটি মাত্র দৃষ্টান্ত পুনরুল্লেখ হলেও করা যেতে পারে—

"এইজন্য ঈশ্বরকে ইতিহাসের বেড়া যুগে যুগে ভাঙতে হয়। তাঁর আলোককে তাঁর আকাশকে যা নিষেধ ক'রে দাঁড়ায় তারই উপরে একদিন তাঁর বজ্র এসে পড়ে, সেইখানে একদিন তাঁর ঝড় বয়। তবে মুক্তি। স্তূপাকার সংস্কার যা জমা হয়ে উঠে সমস্ত চলবার পথকে আটকে বসে আছে সেইখানে রক্তস্রোত বয়ে যায়। তবে মুক্তি। স্বার্থের সঞ্চয় যখন অভ্রভেদী হয়ে ওঠে তখন কামানের গোলা দিয়ে তাকে ভাঙতে হয়। তবে মুক্তি। তখন কান্নায় আকাশ ছেয়ে যায়, কিন্তু সেই কান্নার ধারা নইলে উত্তাপ দূর হবে কেমন করে?"

কিন্তু কবি কেবল মহাযুদ্ধের দ্বারা উদ্দীপিত ও আবেগের বশবর্তী হয়ে সমাজ-সংঘর্ষকে সাময়িকভাবে অভিনন্দন জানালেন এমন অনুভব ঠিক হবে না। স্বদেশের প্রথাজীর্ণ পুরাতনের অভিঘাতে বিদ্রোহের পরিচয় তাঁর রচনায় পূর্ব থেকেই যথেষ্ট পাওয়া যায়, সুতরাং এটি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ব্যাপার, তাঁর চিত্তের একটি স্থায়িভাব। প্রথম মহাযুদ্ধের পর সামাজিক কারণে এই ভাবুকতা উত্তরোত্তর প্রবৃদ্ধ হয়ে তাঁকে পুরাতনের সংগ্রামী শত্রু এবং নূতনের প্রবল পক্ষপাতী ক'রে তোলে। এদিক থেকে 'বর্ষশেষ' কবিতা এবং 'পাগল' প্রবন্ধের বিষয় আমরা বলেছি, আর একটি সুপরিচিত কবিতার দিকেও দৃষ্টি আকর্ষণ করছি—'সুপ্রভাত'। কবিতাটি ১৯০৭ এ লেখা। ঐ সময় বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের শেষ পর্যায়ে সশস্ত্র বিপ্লবের আয়োজন। রবীন্দ্রনাথ রাজনীতিক আন্দোলনের প্রত্যক্ষতা থেকে সরে এসে শিলাইদহ পতিসরে গ্রামসংগঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন। এদিকে মর্লি-মিণ্টো শাসন সংস্কারে মুসলিম স্বার্থসংরক্ষণের দাবি উঠেছে। ১৯০৬ খ্রীঃ মুসলিম লীগ প্রবর্তনের পর থেকে বহু মুসলমান রাজনীতি-ক্ষেত্রে হিন্দুদের আন্দোলন থেকে সরে এসে প্রায় পৃথক্ হয়ে পড়ল। সরকার-বয়কট ও বিলাতি বস্ত্র বয়কট আন্দোলনকে কেন্দ্র ক'রে হিন্দু-মুসলিম সংঘর্ষও আরম্ভ হ'ল। ওদিকে ইংরেজের কৌশল এবং দমননীতি তো আছেই। এরকম দুর্যোগের পরিস্থিতিতে, বিশেষতঃ অপ্রত্যাশিত হিন্দু-মুসলমান বিরোধের ব্যাপারে বিক্ষুব্ধ কবিচিত্ত থেকে 'সুপ্রভাত' কবিতার আবির্ভাব। পল্লীসংগঠনের এবং সেই সূত্রে হিন্দু-মুসলমান বা উচ্চবর্ণ-নিম্নবর্ণ সমস্যা নিবারণের পথিক রবীন্দ্রনাথের চোখে এই ভ্রাতৃরক্তপাত ভিন্নতর অর্থ বহন ক'রে নিয়ে এসেছিল। তিনি ভেবেছিলেন এর ফলে রাজনীতিকদের চক্ষুরুন্মীলন ঘটবে, তাঁরা সংগঠনের মধ্য দিয়ে দুর্ভেদ্য হিন্দু-মুসলিম সামাজিক ঐক্য গড়ে তুলবেন। সংঘর্ষের গুরুতর দুঃখের বিষয়টি তাই তাঁর কাছে রুদ্রের দারুণ দীপ্তি রূপে প্রতিভাত হয়েছে। এর ফলে চৈতন্যোদয় ঘটবে ব'লে 'তোমার খড়্গ আঁধার-মহিষে দুখানা করিল কাটিয়া' এরকম বলা হয়েছে। কবিতাটির উপসংহারে ঐ কারণে এরকম দুর্যোগকে অভিনন্দিত ক'রে ও পরিণামে যথার্থ মিলনের প্রত্যাশা ক'রে বলা হয়েছে—

ভালোই হয়েছে ঝঞ্ঝার বায়ে
প্রলয়ের জটা পড়েছে ছড়ায়ে
ভালোই হয়েছে প্রভাত এসেছে মেঘের সিংহবাহনে।
মিলনযজ্ঞে অগ্নি জ্বালাবে বজ্রশিখার দাহনে।

কবিতাটির মাঝখানে "তোমার শ্মশান-কিঙ্কর দল" বলে যাদের বর্ণনা কবি দিলেন তারা এই শোষিত সর্বহারা হিন্দু-মুসলমান। সংগঠনের দুরূহ পথে আত্মত্যাগের মধ্য দিয়েই যে মিলনের তথা স্বরাজের মহাসম্পদ্ করায়ত্ত হবে সেই অর্থে কবির আহ্বান

ধ্বনিত হয়েছে "উদয়ের পথে শুনি কার বাণী" ইত্যাদিতে। কবির খুবই প্রত্যাশা ছিল রাজনীতিক আন্দোলনে ব্যর্থমনোরথ হয়ে স্বাদেশিকেরা গঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করবেন। তাঁর সুনিশ্চিত প্রত্যয় ছিল যে এই পথে পল্লীর জনের মধ্যে আত্মশক্তির জাগরণ ঘটলে ইংরেজ শাসন আপনা থেকেই অপসৃত হয়ে পড়বে।

এই দ্বিতীয় পর্বে গীতাঞ্জলির 'অপমান' শীর্ষক কবিতা লেখার কিছু পরেই রবীন্দ্রনাথ ধর্মতান্ত্রিক ভেদবুদ্ধির বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অবতীর্ণ হন 'অচলায়তন' লিখে। রবীন্দ্রনাথের অধ্যয়নে যথার্থ হিন্দুধর্ম উদার মানবিক সত্যে প্রতিষ্ঠিত। ধর্মের দোহাই দিয়ে জাতিগত শ্রেণীভেদ এবং মানুষকে ঘৃণা করার ব্যবস্থা শ্রেণীস্বার্থপোষক সামন্ততান্ত্রিক মধ্যযুগের। একে ধর্ম বলা যায় না, বলা যেতে পারে ধর্মতন্ত্র। রবীন্দ্রনাথের 'অচলায়তন' প্রকাশিত হবার পর রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ খুব হৈ চৈ ক'রে ওঠে। নানা পত্র-পত্রিকায় এই সমালোচনা হয় যে রবীন্দ্রনাথ পবিত্র হিন্দুধর্মকে ভাঙবার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছেন। 'সাহিত্য' পত্রিকা মন্তব্য করে "রবীন্দ্রনাথ মেটাবলিংক হউন আমরা আনন্দলাভ করিব, কিন্তু না বুঝিয়া হিন্দুধর্মকে আক্রমণ করিবেন না।" বস্তুতঃ অচলায়তনে মন্ত্রতন্ত্রের আবর্জনাকে রবীন্দ্রনাথ তীব্রভাবে ব্যঙ্গ করেছেন। কিন্তু কেবল ধর্মতান্ত্রিক প্রথাই নয়, এর সঙ্গে যুক্ত জাতিভেদ এবং সাম্প্রদায়িক ঘৃণাকেও রবীন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষ সংগ্রামের দ্বারা নিরস্ত করেছেন। এ সংগ্রামের নেতা হলেন 'গুরু' বা ইতিহাস-বিধাতা। 'গুরু' ওরফে দাদাঠাকুরের নেতৃত্বে অস্পৃশ্য ম্লেচ্ছেরা অচলায়তনের প্রাচীর চুরমার ক'রে দিলে, এর দ্বারা কবি বোধ হয় ইঙ্গিতে বোঝাতে চেয়েছেন যে য়ুরোপীয় মানুষের ও শিক্ষার প্রভাবে হিন্দুসমাজের রক্ষণশীলতা বিচূর্ণ হবে। এবং এই সঙ্গে 'দর্ভক' বা হিন্দুসম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত অথচ অন্ত্যজ অপাঙ্‌ক্তেয় মানুষেরও শৃঙ্খলমুক্তি ঘটবে। ম্লেচ্ছ শোণপাংশুদের প্রতি হিন্দুসমাজের ঘৃণার চিত্র প্রদর্শনে বোধহয় রবীন্দ্রনাথের মনে সুইডেন থেকে আগত ভারতপ্রেমিক হ্যামারগ্রেন্-এর স্মৃতি কাজ করছিল। পথের পাশে পড়ে থাকা এই মুমূর্ষু লোকটিকে জাত যাবে ব'লে কেউ বাইরের চালায় আশ্রয় দেয়নি, স্পর্শও করেনি, এই নিতান্ত করুণ ঘটনাটির বিবরণ প্রসঙ্গক্রমে রবীন্দ্রনাথ কয়েক স্থানেই দিয়েছেন।

শোষণসহায়ক সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথের এই প্রতিবাদসংগ্রাম ঘোষণার পরে আর এক দফা আক্রমণ শুরু হয় মহাযুদ্ধারম্ভের পটভূমিতে। ইতিমধ্যে তিনি য়ুরোপ থেকে ফিরে এসেছেন এবং ব্রহ্মচর্য ও বর্ণাশ্রম বিষয়ে রক্ষণশীলতার যৎকিঞ্চিৎ আভাসও ত্যাগ করেছেন। কেবল তপোবন-বিষয়ে তাঁর স্বকীয় যে কাল্পনিক ও কাব্যিক আদর্শ ছিল তা বোধ হয় কোনো কালেই ত্যাগ করতে পারেন নি, কারণ এরকম ধারণা এবং তপোবনের আবহাওয়ায় শিক্ষার ব্যাপারটি

তাঁব প্রগতি-ভাবনাব বিপরীত কিছু ছিল না। আমবা পূর্বেই বলেছি যে শাসক ইংরেজেব প্রতি ঘৃণা-মিশ্র জাতীয়তার উদ্বোধনের মুহূর্তে 'গোবা' উপন্যাসের উপসংহাব রচনা অর্থবহ। তা লেখকের জাতীয় সংকীর্ণতাব বিপরীত বিষয়ই সূচিত করে।

প্রথম মহাযুদ্ধ সাধাবণভাবে এদেশের জনসমাজে উল্লেখযোগ্য কোনো প্রতিক্রিয়াব সঞ্চার কবেছিল কিনা সন্দেহ, যদিও এব আভ্যন্তবীণ প্রভাব যথেষ্ট ছিল এবং ইংবেজ-শাসিত হওয়ায মহাযুদ্ধের অর্থনীতিক ফলাফল এদেশকেও ভোগ কবতে হয়েছিল। মানবসমাজ সম্পর্কে নিতান্ত সচেতন কবিব পক্ষে এই যুদ্ধ কিন্তু গভীব ও সুদূরচাবী প্রতিক্রিযাব সৃষ্টি কবে। প্রথমতঃ তিনি যুদ্ধেব মধ্য দিয়ে নিপীড়িত মানুষের মুক্তিব আশ্বাস পান, দ্বিতীযতঃ তাঁব মনেব মধ্যে এমন একটি দার্শনিক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয যাতে পুবাতনেব উপব তাঁব তীব্র ঘৃণাবোধ জেগে ওঠে, জীবনে মৃত্যুর ও সংগ্রামেব মধ্য দিযেই অমৃতত্ব পাওয়া যাবে এই ধাবণায স্থিবনিশ্চিত হন এবং জাতীয় জড়তা ও প্রথাব অন্ধতাকে তীব্রভাবে আঘাত ক'বে নিঃশেষে নূতনেব পথবর্তী হন। নূতন পথে মুক্তিব বাণী কবি প্রথম অনুভব করেন আত্মগত-ভাবে, পবে স্বদেশ ও পৃথিবীব দিক থেকে। আত্মগতভাবে সংগ্রামী জীবনকে ববণ করাব উৎসাহ গীতালিব কয়েকটি গানে খুব স্পষ্টভাবেই ফুটে উঠেছে। মহাযুদ্ধেব আবম্ভের একেবাবে সমকালীন গীতালিব গান হ'ল—'তোমাব মোহন রূপে কে রয ভুলে ?' 'একহাতে ওব কৃপাণ আছে আর এক হাতে হার' 'যেতে যেতে একলা পথে নিবেছে মোব বাতি' প্রভৃতি। কবি যাকে চেযেছিলেন প্রভাতেব আলোতে অথবা করুণ সন্ধ্যায, কি নিদ্রাবিহীন নীববতায়, এখন তাকে পেলেন গভীব সর্বনাশেব মধ্যে। বজ্রনির্ঘোষেব ধ্বনিতে নূতন পথেব বার্তা কবিব কানে এসে পৌঁছাল, কবি বুঝলেন সংগ্রামেব বাত্রির মধ্য দিয়ে নোতুন প্রভাত, নোতুন জীবন। ঠিক এই সময়কাব এই মনোভাবের আবও বিস্তৃত পবিচয রয়েছে 'শান্তিনিকেতন' ভাষণমালাব মধ্যে। যুদ্ধাবম্ভের কযেকমাস পূর্বেই 'সবুজপত্রে'ব প্রকাশ এবং তারও পূর্বে তাব প্রস্তুতি। এই 'সবুজপত্রে'ব প্রেরণাও ববীন্দ্রনাথকে জাতীয জড়ত্বমুক্তিব উৎসাহে প্রবলবেগে চালিত কবে। কবি দেশেব অবরুদ্ধ যৌবনেব জয়গানে মুখব হন। সবুজপত্রেব প্রথম সংখ্যায প্রকাশিত 'সবুজেব অভিযান' স্পষ্টভাষণে এবং মৌখিক ভাষাভঙ্গিমায় পূর্বেকার যে-কোনো কবিতা থেকে একেবাবে পৃথক্ সৃষ্টি। এই কবিতায় তিনি প্রবল আঘাত দিতে চেয়েছেন প্রথাজীর্ণ সমাজের ধ্বজাধাবীদের, আর নবজীবনেব সঞ্চাব কবতে চেয়েছেন সেই অর্ধমৃত যুবকদেব অসাড় চিত্তে যাবা মুক্তবুদ্ধির অধিকারী হয়ে পুবানোকে ভেঙে নূতনকে গড়ে তুলবে। 'বলাকা'র দ্বিতীয় কবিতাটিতেও ('এবাব যে ঐ এল সর্বনেশে গো')

ভাবী সর্বনাশের ইঙ্গিত দিয়ে কবি যুবকদের সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হবার আহ্বান জানিয়েছেন। এই কবিতাটি যুদ্ধারম্ভের মাস দুয়েক আগে লেখা। যুদ্ধ যে লাগবেই এমন একটা ভাবনা তখন য়ুরোপে এবং এদেশের উচ্চমহলে প্রসারলাভ করেছে। এরই মানসিক আন্দোলন কবিতাটির জন্ম দিতে পারে, তবু এর সঙ্গে এদেশের জড়স্বরূপ পাপের দারুণ মার্জনার আশ্বাস যে নিহিত নেই এমন নয়। কারণ, "ছি ছি রে ঐ চোখের জল আর ফেলিস্ নে/ ঢাকিস নে মুখ ভয়ে ভয়ে/ কোণে আঁচল মেলিস নে" প্রভৃতি বাক্যে জাতীয় চরিত্রেরই ছবি তুলে ধরা হয়েছে। এ বিষয়ে পরের দিনে লেখা 'আমরা চলি সমুখ পানে' প্রভৃতি কবিতায় খুবই স্পষ্টভাবে বংশপরম্পরায় স্বার্থসেবী এবং প্রথা ও আচারের গণ্ডিতে আবদ্ধ সুতরাং পরিবর্তনের পক্ষপাতী নন এমন শ্রেণীর চরিত্র বর্ণনা ক'রে এদেশের যুবকদের প্রগতির পথিক হতে আহ্বান জানিয়েছেন। পরবর্তী বিখ্যাত "শঙ্খ" কবিতায় স্পষ্টতঃ দুঃখবরণ ও সংগ্রামের তূর্যধ্বনি। কবি আত্মভাষণের মধ্য দিয়ে বললেও তাঁর লক্ষ্য যে স্বদেশের মুক্তচিত্ত ও নূতন সমাজব্যবস্থার জন্য প্রতীক্ষমাণ মানুষ তা স্পষ্ট।

লক্ষণীয় এই যে, কাব্যনাটকে রবীন্দ্রনাথ পুরাতনকে সরিয়ে নোতুন সমাজব্যবস্থা এবং নোতুন মানুষচরিত্র গড়ে তুলতে চান এবং তা দ্রুতগতিতে, সুতরাং তিনি বিপ্লবী। অথচ প্রবন্ধাদিতে দু'এক জায়গায় ছাড়া তিনি বিপ্লবের তেমন পোষকতা করছেন না, সেক্ষেত্রে তিনি দীর্ঘকালসাপেক্ষ সংগঠনের পক্ষেই মত দিচ্ছেন, এ আমরা পূর্ব অধ্যায়েই লক্ষ্য করেছি। রবীন্দ্রোত্তর অথচ রবীন্দ্র-শিষ্য কবিকুলের মধ্যে একমাত্র নজরুলই পরিষ্কারভাবে সশস্ত্র সংগ্রামে আমাদের উদ্দীপিত করতে চেয়েছেন। এক্ষেত্রে এমনও বলা যেতে পারে যে রবীন্দ্রনাথে যা অপরিস্ফুট, যা আভাসে ব্যক্ত, নজরুল তাকেই আবরণমুক্ত করে খোলাখুলি প্রকাশ করলেন। সামন্ততান্ত্রিক শোষণ ও অমানবিকতা দূর করতে গৃহযুদ্ধ হোক এ রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই চান নি, কিন্তু এর বিরুদ্ধে তিনি যে নিতান্ত অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছিলেন তাও ঠিক এবং, এমন কি, তুলনায় বৈদেশিক পরাধীনতাকে তিনি অধিকতর পাপ ব'লে বিবেচনা করেন নি।

'গীতালি' এবং 'বলাকা'র সমকালে 'ফাল্গুনী' নাটক রচনাও রবীন্দ্রনাথের পুরাতন-বিতৃষ্ণার অন্যতম পরিচায়ক। এখানে নিসর্গের দৃষ্টান্তের সহায়তায় কবি দেখাতে চেয়েছেন যে শীত, জরা বা পুরাতন কখনোই সত্য নয়, সত্য হ'ল বসন্ত, যৌবন, নূতন। ফাল্গুনীর এই নবীনতা-সত্য উপলব্ধির বিষয়টি বলাকার একটি কবিতার মধ্যেও প্রকাশ পেয়েছে। এটিকে ফাল্গুনীর ভূমিকা-হিসেবে দেখা যেতে পারে—

ঝরে পড়ে ফোটা ফুল, খসে পড়ে জীর্ণ পত্রভার।

স্বপ্ন যায় টুটে,
ছিন্ন আশা ধূলিতলে পড়ে' লুটে।
শুধু-আমি যৌবন তোমার
চিরদিনকার,
ফিরে ফিরে মোর সাথে দেখা তব হবে বারংবার
জীবনের এপার ওপার।

এ কাব্যকথা, কিন্তু কেবল কাব্যকথা নয়, এর পরিস্ফুট প্রভাব বলাকা ছাড়িয়ে ঋতুনাট্য ছাড়িয়ে 'তাসের দেশ' এমন কি তারও পর পর্যন্ত প্রসারিত। আর এই নবীনতা-প্রীতির সঙ্গে প্রবল রক্ষণশীলতা-বিরোধ, দুঃখবরণ ও সংগ্রামী মনোভাবকে একত্র লক্ষ্য ক'রে ১৯১৪-১৫কে রবীন্দ্র-সমাজ-উপলব্ধির আর এক উল্লেখ্য কাল ব'লে চিহ্নিত করা যেতে পারে। এর পূর্বে সংস্কারমুক্ত খোলা মন নিয়ে য়ুরোপযাত্রা, স্বদেশের তুলনায় য়ুরোপের মানবিকতা ও প্রগতির প্রতি পক্ষপাত, তারপর সবুজপত্রের উদ্দীপনা এবং সবশেষে মহাযুদ্ধ—এসব মিলে কবিকে দ্রুত পরিবর্তিত করেছে এবং সম্ভবতঃ আর একটি বিষয়ও এ ব্যাপারে সাহায্য করেছে। তা হ'ল ১৯১২ খ্রীঃ য়ুরোপ-যাত্রায় দার্শনিক বের্গস্‌র গ্রন্থ ও মতামতের সঙ্গে পরিচয়। বের্গস্‌র বিখ্যাত গ্রন্থ Creative Evolution সেই সবে ইংরেজিতে অনূদিত হয়েছে। ইংল্যাণ্ডে শিক্ষিত মহলে তখন মুখে মুখে বের্গস্‌র পরিবর্তন-সত্যের কথা। রবীন্দ্রনাথও তাঁর মনোমত এই অগ্রগতির দার্শনিক ধারণাকে সহজেই অভিনন্দিত করেন এবং অনুমান, এই সময়েই তিনি Creative Evolution বইখানি উল্টে-পাল্টে একবার দেখে নেন।

পূর্বে উল্লিখিত বলাকার 'শঙ্খ' কবিতাটিকে কবির প্রবল সমাজ-চেতনার পরিচায়ক হিসেবে সহজেই দেখা যেতে পারে। 'শঙ্খ' বলতে কবি ইঙ্গিত করেছেন ইতিহাস-বিধাতার চিরশুভ্র সুতরাং মুক্তির আহ্বানবাণীকে। তাকে এযাবৎ উপেক্ষা করে এসেছে প্রথাশৃঙ্খলিত এই ভারতবর্ষীয় সমাজ, এই নিতান্ত অনুদার স্বার্থমাত্রসম্বল দীনজীবনবাহী শিক্ষিতশ্রেণী। 'বাতাস আলো গেল মরে' উক্তিতে অচলায়তনের বিষয়ই পুনরুক্ত হয়েছে। এরই বিরুদ্ধে সংগ্রামে ডাক দিয়েছেন তাদেরকে যারা তরুণ এবং মুক্ত বুদ্ধির অধিকারী। কবিদের বলা হয়েছে প্রেরণা যোগাতে। 'চলেছিলেম পূজার ঘরে' প্রভৃতিতে সামন্তযুগবাহিত নির্ঝঞ্ঝাট সুবিধাভোগী জীবনের স্বভাব বর্ণিত হয়েছে। এই শ্রেণীর মানুষ দিনান্তের দিকে বাস্তবকে উপেক্ষা ক'রে নিজকল্যাণকামী হয়ে এক ধরনের ধর্মাচরণে মনোযোগ দেয়, সে প্রবৃত্তি নিন্দিত হয়েছে "চলেছিলেম পূজার ঘরে" প্রভৃতি স্তবকে। "আরতি-দীপ এই কি জ্বালা" প্রভৃতির মধ্যে সংকেতে ব্যক্ত করা হয়েছে যে দিনশেষ হয়ে এলেও 'ভজন পূজন সাধন আরাধনা'র আত্ম-

নিলীনতা ত্যাগ করতে হবে। শান্তি পাবার উপায় নেই, রজনীগন্ধাকে বিদায় দিয়ে রক্তজবারই মালা গাঁথতে হবে এই হ'ল ইতিহাসের নির্দেশ। বিরাম বিশ্রাম আত্মসুখের কক্ষ অবরুদ্ধ, খোলা আছে শুধু পথচলার রাস্তা। মানবভাগ্যবিধাতার নির্দেশ যখন অলঙ্ঘ্য তখন আব দ্বিধায় লাভ নেই। আবম্ভ হোক সংগ্রাম। দেশব্যাপী দারিদ্র্য, অশিক্ষা, ঘৃণা, ঈর্ষা প্রভৃতিব বিরুদ্ধে এবং নিজ শ্রেণীস্বার্থপ্রবণতার বিরুদ্ধে। কী হবে সেই সংগ্রামেব রূপ? সেকথা কবিতায় বলা নেই। বলা হয়েছে প্রবন্ধে। সে হ'ল তাঁব গ্রামসংগঠনেব দুরূহ কর্মানুষ্ঠান। "কেউ বা ছুটে আসবে পাশে" প্রভৃতি পঙ্‌ক্তিতে যুদ্ধাবম্ভের বাস্তব পরিস্থিতির বর্ণনা। সুবিধাভোগী যাবা সুপ্তিতে নিলীন থাকতে চাইবে, এই সংগ্রামে তাদেব চিত্তেই আতঙ্ক জাগবে এবং তারা দুঃস্বপ্নের মধ্যে কেঁপে কেঁপে উঠবে। 'তোমার কাছে আবাম চেযে' প্রভৃতি বাক্যে 'তোমাব' বলতে কল্পিত মানব-ইতিহাসেব চালককেই বোঝানো হয়েছে, ইনি কবিব কাছে নিসর্গচাবী নটবাজ রূপেও প্রতিভাত হয়েছেন। 'পাডি' কবিতায় ('মত্ত সাগব দিল পাডি') এই 'নেযে' যে লাঞ্ছিত মানুষেব মুক্তিব জন্য বিপ্লবেব আযোজন ক'বে আসছেন সে বিষয় পূর্ব অধ্যায়েই আমবা দেখিয়েছি। শান্তিনিকেতন ভাষণমালাব "মা মা হিংসীঃ" এবং "পাপের মার্জনা" 'পাডি' কবিতার খুব কাছাকাছি সমযেব বক্তব্য। "আমরা এদেশে প্রতিদিন পরস্পবকে আঘাত কবছি, মানুষকে তার অধিকাব থেকে বঞ্চিত করছি, স্বার্থকে একান্ত ক'রে তুলছি। এ পাপ কতদিন ধবে জমছে, কতযুগ ধ'বে জমছে" এবং "সে চেয়ে দেখবে দুর্যোগেব বাত্রে দূব দিগন্তে মশাল জ্বলে উঠেছে, বেদনায মেদিনী কম্পিত ক'রে রুদ্র আসছেন—সেই বেদনাব আঘাতে তাব হৃদয়ের সমস্ত নাড়ি ছিন্ন হযে যাবে।" প্রভৃতি ঐ ভাষণগুলিব মর্মকথা এই সব কবিতার অভিপ্রেত বক্তব্য বুঝতে সাহায্য কববে।

বলাকার আর একটি কবিতায বাস্তবেব অভিঘাত তীব্রভাবে অনুভব কবা যায়। সে হ'ল 'দূর হতে কী শুনিস্ মৃত্যুব গর্জন' ('ঝড়ের খেয়া')। কবিতাটি স্বার্থসম্বল স্বদেশবাসীর উদ্দেশ্যে লেখা। 'দূর হতে কী শুনিস্' ইত্যাদি বাক্যে আমাদের তিবস্কাব ক'বে বলা হযেছে যে ঐ প্রথম মহাযুদ্ধের ফলিতার্থ আমবা অনুধাবন করতে চাইছি না। এর পরেব চরণগুলিতে যুবোপীয় জীবনে ঐ যুদ্ধের অভিঘাতের বর্ণনা। কবি এই সংগ্রামেব মর্মার্থ অনুভব কবেছেন—

এসেছে আদেশ—
বন্দরে বন্ধনকাল এবারেব মতো হ'ল শেষ,
পুরানো সঞ্চয় নিয়ে ফিরে ফিরে শুধু বেচাকেনা
আর চলিবে না।

বলছেন য়ুরোপের কথা, কিন্তু লক্ষ্য রয়েছে আমাদেব দিকে। আমরাই তো মান্ধাতাব আমলেব সঞ্চিতস্বার্থ আগলে রেখে তারই জের টেনে চলেছি। "বাহিরিয়া এল কারা। মা কাঁদিছে পিছে।" প্রভৃতির মধ্যে যুদ্ধসজ্জায় পুরুষদের স্ব স্ব গৃহ থেকে বহির্গমনের ছবি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এব সঙ্গে এদেশের বিপ্লবী স্বাদেশিকতাব চিত্র মিশ্রিত হওয়াও আশ্চর্য নয়। নিম্নলিখিত অংশে শতশতাব্দীবাহিত স্বদেশীয় সমাজবৈশিষ্ট্যেবই ছবি ফুটেছে নিঃসন্দেহে—

ওবে ভাই, কার নিন্দা কব তুমি। মাথা কব নত।
এ আমাব এ তোমাব পাপ।
বিধাতাব বক্ষে এই তাপ
বহুযুগ হতে জমি' বায়ুকোণে আজিকে ঘনায—
ভীরুব ভীরুতাপুঞ্জ, প্রবলেব উদ্ধত অন্যায,
লোভীব নিষ্ঠুব লোভ,
বঞ্চিতের নিত্য চিত্তক্ষোভ,
জাতি-অভিমান,
মানবেব অধিষ্ঠাত্রী দেবতাব বহু অসম্মান,

এ বর্ণনা কবিব স্বদেশ সম্পর্কেই পুরোপুবি মিলে যায। মানুষের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাব অসম্মান আব কোন্ দেশেই বা এবকম গুরুতর? "দুঃখেবে দেখেছি নিত্য, পাপেবে দেখেছি নানা ছলে"—এই উক্তি অনুসাবে বলা যায় কবি ববীন্দ্রনাথ স্বপ্নসৌধে বসে পাবিজাতেব পাপড়ি গোনেন নি। কবি প্রবল আশাবাদী ব'লেই যুদ্ধান্তে য়ুবোপেব এবং অমানবীয দুর্যোগেব অন্তে এদেশেব মানুষের মুক্তির আলো অনুভব কবেছেন। নববর্ষে লেখা বলাকাব শেষ কবিতাটিও স্বদেশবাসীকে লক্ষ্য ক'বে লেখা। কবিতাটি সাধাবণভাবে তরুণদেব উদ্দেশ্য করে লেখা হলেও বিশেষভাবে তাদেরই জন্য যাবা গ্রাম-সংগঠন ব্রতে আত্মোৎসর্গ করবেন। 'পথে পথে গুপ্তসর্প গূঢ়ফণা' 'নিন্দা দিবে জয়শঙ্খনাদ'—এই সব উৎসাহবাক্য কবিব সংগঠনমূলক প্রবন্ধাবলীতে, আত্মশক্তি কালান্তর প্রভৃতিতে বিস্তৃতভাবেই উচ্চাবিত হয়েছে, যেমন—

"এ কর্মে খ্যাতিব আশা কবিযো না, এমন কি, গ্রামবাসীদেব নিকট হইতে কৃতজ্ঞতার পরিবর্তে বাধা ও অবিশ্বাস স্বীকার কবিতে হইবে। ইহাতে কোনো উত্তেজনা নাই, কোনো বিরোধ নাই, কোনো ঘোষণা নাই, কেবল ধৈর্য এবং প্রেম, নিভৃতে তপস্যা—মনেব মধ্যে কেবল এই একটিমাত্র পণ যে, দেশের মধ্যে সকলেব চেয়ে যাহারা দুঃখী তাহাদেব দুঃখের ভাগ লইয়া

সেই দুঃখের মূলগত প্রতিকার সাধন করিতে সমস্ত জীবন সমর্পণ করিব।" (পাবনা-সম্মিলনী-ভাষণ)

"হাঁ, বিপদ আছে বৈকি, তবু জ্ঞানে যা সত্য ব্যবহারেও তাকে সত্য করিব।"

"কিন্তু আমাদের দেশের লোকই ভয়ে কিম্বা লোভে ন্যায়ের পক্ষে সাক্ষ্য দিবে না, বিরুদ্ধেই দিবে।"

"একথাও ঠিক। তবু সত্যকে মানিয়া চলিতে হইবে।"

"কিন্তু আমাদের দেশের লোকই প্রশংসা কিম্বা পুরস্কারের লোভে ঝোপের মধ্য হইতে আমার মাথায় বাড়ি মারিবে।"

"একথাও ঠিক। তবু সত্যকে মানিতে হইবে।"

"এতটা কি আশা করা যায়?"

"হাঁ এতটাই আশা করিতে হইবে, ইহার একটুকুও কম নয়।"

(কর্তার ইচ্ছায় কর্ম)

"সংকটকে স্বীকার করিয়া, দুঃসাধ্যতা সম্বন্ধে অন্ধ না হইয়া, নিজেকে আসন্ন ফললাভের প্রত্যাশায় না ভুলাইয়া, এই দুর্ভাগা দেশের বিনা পুরস্কারের কর্মে দুর্গম পথে যাত্রা আরম্ভ করিতে কে কে প্রস্তুত আছে, আমি সেই বীর যুবকদিগকে অদ্য আহ্বান করিতেছি—রাজদ্বারের অভিমুখে নয়, পুরাতন যুগের তপঃসঞ্চিত ভারতের স্বকীয় শক্তি যে খনির মধ্যে নিহিত আছে সেই খনির সন্ধানে। কিন্তু, খনি দেশের মর্মস্থানেই আছে—যে জনসাধারণকে অবজ্ঞা করি তাহাদেরই নির্বাক হৃদয়ের গোপন স্তরের মধ্যে আছে।" (সফলতার সদুপায়)

সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় নারীর অবরুদ্ধতা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বহু পূর্ব থেকেই সচেতন ছিলেন এবং কাব্যকবিতায় ও ডায়েরি প্রবন্ধাদিতে এবিষয়ে তিনি স্বীয় অভিমত মোটামুটি ১৮৯০ থেকে জানিয়েও এসেছেন (রাজা ও রাণী, য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারি, পঞ্চভূতের ডায়ারি, চিত্রাঙ্গদা, চৈতালির কয়েকটি কবিতা, মালিনী প্রভৃতি দ্রষ্টব্য), কিন্তু 'বলাকা'র সমকালে য়ুরোপীয় অন্তর্জীবনের দিকে আগ্রহ, মহাযুদ্ধ এবং সবুজপত্রের প্রকাশ এই তিনের অভিঘাতে কল্পনা ও চিন্তায় কবি যখন নূতনের দিকে ফিরলেনই, তখন বাক্যহীনাকে প্রতিবাদিনী ক'রে গড়ে তুললেন। 'স্ত্রীর পত্র' গল্পের মৃণালের বিদ্রোহ পাঠকদের সুবিদিত। আমাদের "সংসারের মাঝখানে মেয়েমানুষের পরিচয়টা যে কী" মৃণাল তা উদ্ঘাটিত করে দেখিয়েছে। 'পলাতকা'র 'মুক্তি', 'নিষ্কৃতি' প্রভৃতি কবিতায় এরই অনুরণন চলেছে হাল্কা সুরে। কিন্তু এর কালোচিত

প্রকৃষ্ট প্রকাশ মহুয়ায় ও তপতী নাটকে। মহুয়ায় শুধু সংস্কার-শৃঙ্খল থেকে নারীচিত্ত-মুক্তির কথাই বলা হয়নি, প্রেমবোধকেও সমান্ততান্ত্রিক বিলাস ও অভ্যাসের ফাঁস থেকে নিষ্কৃতি দেওয়া হয়েছে। এবিষয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর অনুগামী সাহিত্যিকদের থেকেও অগ্রগামী। এবং প্রকৃত বিপ্লবী এইজন্য যে তিনি বাসরশয্যা, বাসকসজ্জা এবং পুষ্পবাণবিলাসের হাবভাব হেলালীলার যাবতীয় রম্য প্রসাধনকে স্বার্থময় ও আলস্যে আবিল ব'লে ধিক্কার দিলেন এবং সংগ্রামক্ষুব্ধ জীবনেব রূঢ় পথে একত্র পা ফেলে চলার জয়গান করলেন। চলার পথে প্রকৃত যে সঙ্গী তার সঙ্গে 'দেখা হবে ক্ষুব্ধসিন্ধুতীরে' অর্থাৎ সংগ্রামী জীবনের ভূমিকায় হবে প্রথম পরিচয়। তাবপরেকার বহুকাল-লালিত সংস্কাবেব বিচিত্র নর্মবিলাস? কবির নায়ক দৃঢ়তাব সঙ্গে বলেছেন—

আমরা দুজনা স্বর্গ-খেলনা গড়িব না ধরণীতে,
.. পঞ্চশবেব বেদনা-মাধুরী দিয়ে
বাসররাত্রি রচিব না মোরা, প্রিয়ে,

দুঃখের দুর্গম পথে, রণক্ষেত্রে পাশাপাশি সংগ্রামের মধ্য দিযে আমাদের প্রেম হবে সার্থক। আব কবির নায়িকা বলেছেন—'পথ বেঁধে দিল বন্ধনহীন গ্রন্থি, আমবা দুজন চলতি হাওযার পন্থী'। 'নাই আমাদের সঞ্চিত ধনরত্ন, নাইরে ঘবের লালনলালিত যত্ন'। ববীন্দ্রনাথের গৃহত্যাগী মনোভাব তাঁর প্রথমের দিকের রোম্যান্টিক মনোভাবের একটি বৈশিষ্ট্য, কিন্তু যেহেতু এই মনোভাব চলিষ্ণু এবং বাস্তবসমাজমুখী সেই হেতু কবিব সুদূরের পিপাসা এবং পথের প্রতি আকর্ষণ ক্রমশঃ একটি জীবনসংলগ্ন মানবিক অর্থ লাভ কবেছে। 'রাজা' নাটকে দেখি রানী সুদর্শনা বিলাসময় একাকিত্বেব কারাগার ত্যাগ ক'রে জনসমাজে পথেব ধুলায় নেমে আসতেই বাজার সঙ্গে তাব মিলন ঘটল। গীতাঞ্জলির মানব-বিধাতা 'রৌদ্রে জলে আছেন সবাব সাথে, ধুলা তাঁহাব লেগেছে দুই হাতে'। গীতালিতে 'আমি পথিক, পথ আমাবি সাথী'। বলাকাব 'ধূসর পথের ধুলা এই তোব ধাত্রী'। ফাল্গুনী নাটকে তো তরুণদের চলারই উৎসব। পুবানো পুঁজি নিয়ে যারা আরামে স্থিতিশীল জীবন কাটাতে চায় তাদের উপর কবিব বিরাগ একরকম তাঁর স্বাদেশিকতার কাল থেকেই, কিন্তু গীতালি বলাকা পর্যায়ে তা খুবই স্পষ্ট এবং প্রবল হয়ে উঠেছে একথা আমরা পূর্বেই বারংবার নির্দেশ করেছি।

মহুয়ার সর্বনাশা পথিক প্রেমের রৌদ্রদীপ্তিতে কেবল দম্পতীরাই মোহত্যাগ ক'রে ছুটে আসছেন না, বসন্তও ভাঙনের নেশায় উন্মত্ত হয়েছে। ফাল্গুনীতে বসন্তের মধ্যে শুধু চঞ্চলের পদধ্বনি শোনা গিয়েছিল। মহুয়ার বসন্ত এসেছে যোদ্ধবেশে, কাড়া-নাকড়া বাজিয়ে জরাজীর্ণ পুরাতনকে সবলে ভেঙে নবীনের প্রতিষ্ঠা করতে—

জড় দৈত্যের সাথে অনিবার চিরসংগ্রাম ঘোষণা তোমার লিখিছ ধূলির পটে।

এ জড়দৈত্য যে আমাদেরই সমাজের প্রথাসংস্কারের ক্লীব দাসত্ব তার পরিচয় স্পষ্ট ক'রেই বলা হয়েছে 'বাঁধন' কবিতায়—

বাঁধন ছেঁড়ার সাধন তাহাব
স্থষ্টি তাহার খেলা।
দস্যুর মত ভেঙেচুবে দেয়
চিবাভ্যাসেব মেলা
মূল্যহীনেরে সোনা কবিবার
পবশপাথর হাতে আছে তার।
তাই তো প্রাচীন সঞ্চিত ধনে
উদ্ধত অবহেলা।

"মূল্যহীনেবে" প্রভৃতির মধ্যে লাঞ্ছিত মানুষকে মনুষ্যত্বে গৌরবান্বিত কবার বিষয় সংকেতিত হযেছে। এই প্রসঙ্গে পাঠক নিশ্চয়ই স্মবণ কববেন বলাকার 'পাডি' কবিতার 'অগৌরবাব বাডিয়ে গবব কববে আপন সাথী বিবহী ঘোব নেযে' প্রভৃতি। কবি নিশ্চিত অনুভব কবেন যে সামন্ততান্ত্রিক সংস্কাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা ক'বে তাকে ভেঙে চুবমাব ক'বে তবেই লাঞ্ছিত মানবতাব উদ্ধার সম্ভব। আর এ ব্যাপাবে বিপ্লবী নবীনকে নির্দয় হতেই হবে। নির্দযতা তাদেব উপব যাবা নিশ্চিন্ত শোষণ সহায়ে আবামেব আয়োজন সঞ্চয় ক'রে চলেছে। কালবাহিত এই ভাঙনের খেলা এবং মানুষেব উদ্ধাব প্রত্যক্ষ করার জন্য কবি কী পবিমাণ ব্যাকুল দেখুন—

বলো 'জয় জয়' বলো 'নাহি ভয'—
কালেব প্রয়াণ-পথে
আসে নির্দয় নবযৌবন
ভাঙনের মহারথে।

অর্থাৎ 'ভাঙিযা পড়ুক ঝড, জাগুক তুফান' 'নাই নাই ভয়, হবে হবে জয়' এই হ'ল পরম আশাবাদী এবং বিপ্লব-সহায় মুক্তিদর্শী কবির আশ্বাস। বলাকা-মহুয়া পর্বে উপলব্ধ সংগ্রামী নবীনতা তার প্রভাব বিস্তাব কবেছে কবিব ঋতুনাট্যে এবং নটরাজ কল্পনায। অর্থাৎ সমাজ-সচেতন কবি প্রথমে জীবন-বীক্ষণেব মধ্য দিয়ে অবশ্যম্ভাবী নূতনের পদসঞ্চার অনুভব করলেন, পরে তাঁব কাব্যজীবনেব শেষ নিসর্গ-দর্শনের মধ্যে এই নূতন অনুভবের স্বাক্ষর বেখে গেলেন। বস্তুতঃ নটবাজ-ঋতুরঙ্গের নিসর্গ পূর্বেকাব সোনারতরী-ছিন্নপত্র, চৈতালি-খেয়ার নিসর্গ থেকে কতই না পৃথক। পুবাতনকে ভেঙে নূতন জীবনরচনার যে প্রত্যয় কবি পেয়েছেন, তাই দিয়েই গড়ে তুলেছেন নটরাজের মূর্তি, যার বামপদক্ষেপে পুরাতন পাত্র বিচূর্ণিত হচ্ছে, আর দক্ষিণ

পদক্ষেপে নূতনের সুধা উন্মথিত হচ্ছে। সৃষ্টিপ্রবাহ জীবনধারা থেমে যাচ্ছে না। কিন্তু তাকে বারংবাব নূতনের সম্মুখীন হতে হচ্ছে। কাবণ, "পৃথিবীতে সৃষ্টিব যে লীলাশক্তি আছে সে যে নির্লোভ, সে নিরাসক্ত, সে অকৃপণ, সে যে কিছু জমতে দেয় না, কেননা জমার জঞ্জালে তাব সৃষ্টির পথ আটকায়, সে যে নিত্যনূতনেব নিরন্তর প্রকাশেব জন্যে তাব আকাশকে নির্মল করে বেখে দিতে চায়" (পঃ যাঃ ডায়াবি)। শীতকে বিনির্জিত ক'রে বসন্ত, বসন্তকে দূরে সবিয়ে নিদাঘ এও যা, আব মানব-সমাজেব এক অবস্থা থেকে অবস্থান্তরে পদক্ষেপ, এ-ও তাই, এ অলঙ্ঘনীয় কালেব বিধি, ইতিহাস-বিধাতার নিত্যলীলা।

মহুয়াব একটি কবিতায বাস্তবদর্শী কবিব সমাজ-অধ্যয়নের খুব স্পষ্ট পবিচয় পাওয়া যাচ্ছে। জাতীয চবিত্রেব যে বর্ণনা তিনি দিয়েছেন তাব সঙ্গে আজকেব বুর্জোয়া অবস্থাও স্বচ্ছন্দে মিলিয়ে নেওযা যায় এবং নিতান্ত সাম্প্রতিকের ব্যাপাবে ঐ বর্ণনের কিছু পবিশিষ্টও বোধ হয় যোগ কবা যেতে পারে—

ধূসব প্রদোষে আজি অস্তপথ জুড়ে
নিশাচব মিথ্যা চলে উড়ে।
আলো-আঁধাবের পাকে না মিলে কিনাবা,
দীর্ঘ যে দেখায় হ্রস্ব যারা।
যাচে দেশ মোহেব দীক্ষাবে,
কাঁদে দিক বিধিব ধিক্কাবে,
ভাগ্যেব ভিক্ষুক চাহে কুটিল সিদ্ধিব আশীর্বাদ,
ধূলিতে-খুঁটিযা-তোলা বহুজন-উচ্ছিষ্ট প্রসাদ।
কুৎসায বিস্তাবি দেয পঙ্কে-ক্লিন্ন গ্লানি,
কলহেবে শৌর্য ব'লে জানি,
ভাবি, দুর্যোগেব সিন্ধু তরিব হেলায়
বঞ্চনাব ভঙ্গুব ভেলায।
ইত্যাদি—'প্রতীক্ষা'

ববীন্দ্রনাথ কি পাপেব অমঙ্গলের ছবি তুলে ধবতে সংকুচিত হযেছেন ?

বলাকার সময়কার কবির আর একটি নূতনতর প্রেরণা হ'ল তাত্ত্বিকভাবে মানুষেব মহিমা-উপলব্ধি। এখন থেকে কবিচিত্তে ক্রমশঃ মানুষের অধিকাব বিস্তৃত হচ্ছে। এব পবেকার ঋতুনাট্যে এবং নটবাজের কল্পনায সংকেতে মানবসমাজের পরিবর্তনচক্রের বিষয়ই আভাসিত হয়েছে। সৃষ্টির অভিব্যক্তিধাবায় কোনো এক কালে মানুষ জীবজন্তুরই সগোত্র ছিল। কিন্তু কর্মে, বুদ্ধিব প্রয়োগে, সংগঠনে মানসিক

শক্তিতে সে তার জীবত্ব অতিক্রম ক'রে নিসর্গের উপর আধিপত্য বিস্তার করেছে। মানুষের এই সংগ্রামী স্বভাবকে কবি নমস্কার জানিয়েছেন, কিন্তু সেই সঙ্গে বিশেষভাবে স্মরণ করেছেন কর্মী ও তরুণদের, আর রক্ষণশীল ও স্থবিরদের নানাভাবে ধিক্কার দিয়েছেন ('ঐ যে প্রবীণ ঐ যে পরম পাকা, চক্ষুকর্ণ দুইটি ডানায় ঢাকা' 'রইল যারা পিছুর টানে কাঁদবে তারা কাঁদবে' 'ওরা আছে দুয়ার ঝেঁপে চক্ষু ওদের ধাঁধবে' 'দুঃস্বপনে কাঁপবে ত্রাসে সুপ্তির পর্যঙ্ক')। বলাকার এই মানুষবোধ পরবর্তী Religion of Man ও 'মানুষের ধর্ম' ভাষণসমূহে বিস্তৃত হয়েছে। এগুলিব মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ঈশ্বর ব'লে কোনো উপাস্য সত্তাকে স্বীকার কবেননি। সব যাত্রী-মানুষ নিযে যে মহামানবতার আইডিযা করা যায তাকেই মানবভাগ্যবিধাতারূপে দেখেছেন। সুতরাং বলা যায়, সৃষ্টির চরমতা রবীন্দ্রনাথ মানুষেব মধ্যেই স্বীকার করেছেন, "সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহাব উপবে নাই" প্রকারান্তরে এইটিই তাঁর আধুনিক তাত্ত্বিক ধাবণার সাবাংশ, আব এ ধারণাব পবিস্ফুট পবিচয় যুদ্ধোত্তব 'বলাকা'-কাব্যেই প্রথম পাওযা যাচ্ছে (বলাকাব ২৮, -৯ সংখ্যক কবিতা দ্রষ্টব্য)।

স্বাধীনতা আন্দোলনেব প্রথম পর্যায়ে অর্থাৎ বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সমযে ববীন্দ্রনাথ 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটক লেখেন, অসহযোগ আন্দোলনের মধ্যে লেখেন 'মুক্তধারা'। আন্দোলনের অবসরে লেখা হলেও নাটক দুটিব বিশেষতঃ দ্বিতীযটির বক্তব্য ব্যাপকভাবে মানবিক। দুটিতেই গান্ধীজীব সত্যাগ্রহ আন্দোলনেব স্পর্শ আছে, জনজাগবণেব ছবি আছে এবং বাজশক্তিব উদ্ধত প্রতাপ ও স্বেচ্ছাচারেব পরিচয় আছে, যদিও গণ-আন্দোলনের ব্যাপাবটি রবীন্দ্রনাথ স্বকীয়ভাবেই নির্বাহ করেছেন। এই আন্দোলনেব পদ্ধতি ও প্রকার এক হ'লেও নাটক দুটিব পবিস্থিতি ভিন্ন। প্রথমটিতে সামন্ত ভূঁইযাব এবং রূপকের হিসাবে ইংবেজ রাজশক্তির স্বেচ্ছাচার ও অমানবিক নিষ্ঠুবতা, দ্বিতীয়টিতে যন্ত্রশক্তিতে বলীয়ান য়ুরোপীয় রাষ্ট্রের তৃষ্ণা (তাঁর নিজেবই অভিধা অনুসারে) জাতি-অহমিকা-সম্পন্ন য়ুরোপীয় নেশনগুলির শোষণের অমানবীয়তা দেখানো হয়েছে। প্রতাপাদিত্যের স্বৈরাচাবী শাসনেব চিত্রের পটভূমি হিসেবে 'রাজা-প্রজা' পুস্তকের লেখনগুলি দ্রষ্টব্য, আর 'মুক্তধারা'র পটভূমি হিসেবে বিচার্য কবির ১৯১৬-১৭এ জাপান-আমেরিকা এবং ১৯২০-২১এ য়ুরোপ-আমেরিকা ভ্রমণের অভিজ্ঞতা ও তাঁর প্রদত্ত Nationalism বিষয়ে প্রতিবাদমুখর ভাষণাবলী। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সাহিত্যেও যে স্বপ্নলোকে বিলীন থাকেন নি, মুক্তধারা এবং রক্তকরবী, বলাকার মতই সেবিষয়ে অন্যতম প্রমাণ। তা ছাড়া রবীন্দ্রনাথ পুলিসী শাসন, শোষণ ও অত্যাচাবের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রামের পথ দেখান নি এমন বিবেচনাও ঠিক নয়। প্রায়শ্চিত্ত বা মুক্তধারায় ধনঞ্জয় বৈরাগী প্রতিরোধ ও প্রতিবাদ-মূলক আন্দোলনের নেতা হয়েও

জনগণকে তাঁর কর্তৃত্বের দ্বারা সমাচ্ছন্ন করতে চান না—এর থেকে স্বচ্ছন্দে অনুমান করা যেতে পারে যে এরকম আন্দোলনে নেতৃত্বের প্রয়োজন রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করলেও একনায়কত্বের বিরোধী ছিলেন। ধনঞ্জয় বৈরাগী উৎপীড়িত প্রজাদের নেতৃত্ব যদিও করেছেন, প্রজারা প্রতিপদে তাঁরই উপর নির্ভর করবে এবং তাঁকে সঙ্গে না পেলে হাল ছেড়ে দিয়ে বসে থাকবে এ বৈরাগীর নিকট অসহ্য। ত্যাগ এবং দুঃখবরণের ক্ষমতাকে রবীন্দ্রনাথ নেতৃত্বের নির্দেশক-লক্ষণ ব'লে গ্রহণ করেছেন। তাঁর প্রস্তাবিত গ্রাম-সংগঠনেও কর্মীদের কাছে এই দুটি গুণের প্রত্যাশা তাঁর ছিল। লক্ষ্য করতে হবে নেতা ধনঞ্জয় আধুনিক শিক্ষিত সমাজের প্রতিনিধি নন এবং প্রজারাও শিক্ষিত নয়, গ্রামীণ সাধারণ মানুষ মাত্র।

প্রায়শ্চিত্ত এবং মুক্তধারায় যে প্রজাবিদ্রোহ দেখানো হয়েছে, রক্তকরবীর পরিস্থিতিতে তা-ই শ্রমিক বিদ্রোহের রূপ পরিগ্রহ করেছে। অবশ্য কেবল শ্রমিক-জাগরণ এবং বিদ্রোহকেই ধনতন্ত্রের বিনাশের কারণ ব'লে নাট্যকার অনুভব করেন নি, ধনতন্ত্রের স্বাভাবিক অপমৃত্যুকেও এর সঙ্গে যোগ ক'রে দিয়েছেন। রক্তকরবীর খনি-শিল্পের রাজা আর কেউ নয়, নিরাকার ধনতন্ত্রেরই ব্যক্তিরূপ। রবীন্দ্রনাথের ধারণায় উত্তরোত্তর পুঞ্জীভূত ধনসঞ্চয় এমনতর জটিলতার সৃষ্টি করবে যে তা থেকে তার নিজেরই পরিত্রাণের পথ থাকবে না, আষ্টেপৃষ্ঠে জটিলতায় বাঁধা হয়ে বিনষ্ট হবে। অবশ্য এর সঙ্গে দাসত্বে আবদ্ধ মানুষের আত্মশক্তি-নিয়োগও নিশ্চিতভাবে থাকবে। সোনার বা টাকার মহিমাকে, বণিক্-বৃত্তিকে রবীন্দ্রনাথ ঘৃণা করেছেন সব সময়েই। আর অমানবিক নিষ্ঠুর ধনতন্ত্রকে অভিশাপ দিয়েছেন বারংবার। তিনি যন্ত্র এবং শিল্পের সমর্থক হ'লেও লোককল্যাণের জন্যই তা করেছেন। আর ঐ মর্মেই এ দেশের কৃষিশিল্পের আধুনিকীকরণ চেয়েছেন। এসব বিষয় আমরা পূর্বেই বলেছি। খনির কুলি-ধাওড়ায় বিপ্লবের নেতৃত্ব করেছেন 'রক্তকরবী'তে বিশুপাগল। আর সংস্কারে অবরুদ্ধ নিষ্প্রাণ শ্রমিকদের মধ্যে প্রাণের উৎসাহ জাগিয়ে তোলার দায়িত্ব নিয়েছে নন্দিনী—কবিকল্পিত কাব্যিক নারীমূর্তি, যার সঙ্গে পূরবীর 'লীলাসঙ্গিনী' এবং সোনার-তরী কাব্যে বর্ণিত 'মানস-সুন্দরী'র সাজাত্য রয়েছে।

রক্তকরবী কেবল সাংকেতিক নয়, বাস্তব লক্ষণেও চিহ্নিত। এই বাস্তব উপাদান ছড়িয়ে রয়েছে শ্রমিকদের জীবনচিত্রে। ফাগুলাল, চন্দ্রা, বিশুপাগল, গোকুল প্রভৃতির সংস্কারে আবদ্ধ জীবনহীন অস্তিত্ব, এদের উপর মোড়ল সর্দারদের নিষ্ঠুর কর্তৃত্ব, এদের ঠাণ্ডা রাখবার জন্য গোঁসাই ও পুরাণবাগীশের শান্তিমন্ত্রবিতরণের ভূমিকা সবই লেখক স্পষ্ট ক'রে এঁকেছেন, এতটাই স্পষ্ট ক'রে যে, বলা যায়, সাংকেতিক নাটকে

বাস্তবতার বাড়াবাড়ি হয়েছে। বস্তুতঃ শ্রমিকদের উপর কবির তীব্র সহানুভূতির জন্যই এটি ঘটেছে। লেখক শ্রমিক-বিপ্লবের ছবি তুলে ধরেছেন। প্রথমে ধূমায়িত অসন্তোষ, বিপ্লবের প্রেরণাদাতা হিসেবে বিশুপাগলের কারাগার, নন্দিনীকে সরিয়ে ফেলার পরামর্শ, রঞ্জনের নেতৃত্বে কয়েকজন শ্রমিকের প্রত্যক্ষ বিদ্রোহ এবং সর্দারগোষ্ঠী কর্তৃক তাদের গোপন হত্যার আয়োজন, পরিশেষে শ্রমিকদল কর্তৃক বন্দীশালার উপর আঘাত, সৈন্যসহ সর্দাবদেব বিপ্লব-দমনের জন্য প্রস্তুতি—এ সবই পর পর দেখিয়ে গেছেন লেখক, কিছুই বাদ দেন নি। তাঁর বৈশিষ্ট্য শুধু এই যে, 'বাজা' অর্থাৎ অশরীরী বা যন্ত্রদেহী ধনতন্ত্রকে নিজের বিরুদ্ধে লড়াই করিয়েছেন তিনি। এ বিষয়ে তাঁর অধ্যয়ন হ'ল—মহাকাল অর্থাৎ মানব-ইতিহাস-বিধাতা ধনতন্ত্রের এই স্পর্ধা বেশিদিন সহ্য করবেন না, ধনসর্বস্বতা নিজের সৃষ্ট জটিল জালে আটকা প'ড়ে আত্মঘাতী হতে বাধ্য। কিন্তু এই সঙ্গে চবমতম দুঃখের মধ্য দিয়ে আত্ম-উদ্ধারও করতে হবে দাসত্বে আবদ্ধ মানুষকে, সুতবাং এর জন্যে বিপ্লবেবও প্রয়োজন হবে। রক্তকরবীব পথনির্দেশ বক্তেব স্বাক্ষবে সমাজতন্ত্রেবই পথনির্দেশ। কেবল বাজাব চিত্র ও চবিত্র কবি-ভাবাদর্শের অনুগত। কিন্তু বাস্তবে, ধনতন্ত্রেব মধ্যেই যে আত্মবিবোধ ঘটবে না এমন কথাও বলা যায় না। দেখা যায়, অন্যত্র ববীন্দ্রনাথ যান্ত্রিকতাব অপবিমেয বিস্তাব ও অপবিমেয় ধনসঞ্চয়ের সঙ্গে ধনেব অব্যাপ্তি, অপবিমিত দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি এবং নির্ঘাত উপবাসকে যুক্ত ক'রে দেখেছেন, যেমন—

(১) কৃত্রিম ব্যবস্থায় মানবসমাজের সর্বত্রই এই-যে প্রাণশোষণকারী বিদীর্ণতা এনেছে, একদিন মানুষকে এর মূল্য শোধ কবতে দেউলে হতে হবে। সেইদিন নিকটে এল। আজ পৃথিবীর আর্থিক সমস্যা এমনি দুরূহ হয়ে উঠেছে যে, বড়ো বডো পণ্ডিতেবা তাব যথার্থ কাবণ এবং প্রতিকার খুঁজে পাচ্ছে না। টাকা জমছে, অথচ তার মূল্য যাচ্ছে কমে, উপকরণ-উৎপাদনেব ত্রুটি নেই অথচ তা ভোগে আসছে না। ধনের উৎপত্তি এবং ধনের ব্যাপ্তির মধ্যে যে ফাটল লুকিয়েছিল আজ সেটা উঠেছে মস্ত হয়ে। সভ্যতার ব্যবসায়ে মানুষ কোনো-এক জায়গায় তার দেনা শোধ করছিল না, আজ সেই দেনা আপন প্রকাণ্ড কবল বিস্তার করেছে। সেই দেনাকেও রক্ষা করব অথচ আপনাকেও বাঁচাব এ হতেই পারে না।.....এই-যে গায়েব জোরে দেনাপাওনাব স্বাভাবিক পথ রোধ করা, এই জোর একদিন আপনাকেই আপনি মারবে। এই রকম অবস্থা ছোটো বড়ো নানা কৃত্রিম উপায়ে পৃথিবীর সর্বত্রই পীড়া সৃষ্টি ক'রে বিনাশকে আহ্বান করছে। সমাজে যারা আপনার প্রাণকে নিঃশেষিত করে দান করছে, প্রতিদানে

তাবা প্রাণ ফিরে পাচ্ছে না, এই অন্যায় ঋণ চিরদিনই জমতে থাকবে এ কখনো হতেই পারে না।" (উপেক্ষিতা পল্লী)

(২) "দেখতে পাচ্ছ না—আজ ধনীর আছে ধন, তার মূল্য গেছে ফাঁক হয়ে গজভুক্ত কপিত্থের মতো। ভবা ফসলের খেতে বাসা কবেছে উপবাস। যক্ষরাজ স্বয়ং তার ভাণ্ডারে বসেছে প্রায়োপবেশনে। দেখতে পাচ্ছ না—লক্ষ্মীর ভাণ্ডার আজ শতছিদ্র, তাঁর প্রসাদধারা শুষে নিচ্ছে মরুভূমিতে—ফলছে না কোনো ফল।"

"হাঁ ঠাকুর, তাই তো দেখি।"
"তোমবা কেবলই কবছ ঋণ,
কিছুই করনি শোধ,
দেউলে কবে দিয়েছ যুগের বিত্ত।
তাই নড়ে না আজ আর বথ—
ঐ যে পথেব বুক জুড়ে পডে আছে তাব অসাড দড়িটা।"

(কালেব যাত্রা)

বক্তকববীব আট বছব পবে নোতুন ক'বে লেখা নাটিকা 'কালেব যাত্রা'য় কবি পণ্য-উৎপাদনে ও ধনেব অধিকাবে ধনিকদেব সঙ্গে মেহনতী শূদ্রদেবও কর্তৃত্ব দাবী কবেছেন। ধনতন্ত্রেব আত্মঘাতী পবিণাম থেকে রক্ষার উপায় হিসেবে রবীন্দ্রনাথেব এই পথনির্দেশ পুবোপুবি সমাজতান্ত্রিক নিঃসন্দেহে। কিন্তু বোধ হয়, কেবল সাম্প্রতিক ধনতান্ত্রিক শোষণ থেকেই নয়, বহুকালেব বহুরূপী শ্রেণী-শোষণ থেকে মানবতাব মুক্তিই 'কালেব যাত্রা'র লক্ষ্য—

…… এক দিকটা উঁচু হয়েছিল অতিশয় বেশি,
ঠাকুব নিচে দাঁডালেন ছোটোব দিকে,
সেইখান থেকে মারলেন টান, বড়োটাকে দিলেন কাত ক'রে।
সমান করে নিলেন তাঁর আসনটা।
… … …
যাবা এতদিন মরে ছিল তারা উঠুক বেঁচে,
যারা যুগে যুগে ছিল খাটো হয়ে, তারা দাঁডাক একবার মাথা তুলে।

'রথের রশি' বা 'কালের যাত্রা'ব পর রবীন্দ্রনাথেব উল্লেখযোগ্য প্রগতিমূলক নাট্যরচনা হ'ল 'তাসের দেশ' ও 'চণ্ডালিকা'। অচলায়তনের 'পর তাসের দেশে কবি আমাদের এই জড়সমাজকে পুনরায় জাগাতে প্রয়াস করলেন শাণিত ব্যঙ্গ

প্রয়োগ ক'রে এবং বিপ্লবের মধ্য দিয়ে ভাঙার সম্ভাবনার দিকে ইঙ্গিত করে। তাসের দেশের বাসিন্দা আমরা প্রথা এবং সংস্কারের নির্জীব দাসত্ব বহন ক'রে নিয়মমত চলছি, নিয়মমত উঠছি পড়ছি, আমাদের সবই গুরুমশায়ের অচল বাঁধনে বাঁধা। কিন্তু বাঁধ ভেঙেই গেল শেষ পর্যন্ত। বাঁধ ভাঙায় সাহায্য করলে সাগরপারের রাজপুত্র। সে কি য়ুরোপীয় সংস্কৃতি? সে যাই হোক, তাসের দেশ অচলায়তন এবং ফাল্গুনীর মিলিত নবীন রূপ, আর্টিস্টের হাতে রমণীয় নূতন ক'রে গঠিত। উপসংহারে গ্রথিত "বাঁধ ভেঙে দাও" গানটি কবির বিপ্লবী সত্তার পরিচায়ক এবং নিতান্ত স্মরণীয়। তবু ভেবে দেখতে হবে এ বিপ্লব আমাদের আভ্যন্তরীণ সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে, পরাধীনতার বিপক্ষে পোলিটিক্যাল্ বিপ্লব নয়। 'তাসের দেশ' কবিচিত্তে সমাজ-অভিঘাত এবং রোম্যান্টিক গতিশীলতার মিশ্রণে গঠিত। আগে আমরা বিশেষভাবেই দেখেছি যে রবীন্দ্রনাথ পরাধীনতার নিষ্পেষণ থেকে আভ্যন্তরীণ সামাজিক নিষ্পেষণ-কেই স্থায়ী ও পরিণামে বেশি ভয়ংকর বলে মনে করেছেন এবং এর সঙ্গে যে অমানবিকতা জড়িত তাকেই প্রধানতম অভিশাপ ব'লে নির্ণয় করেছেন। তাঁর লেখনী ও কর্মের সংগ্রাম মুখ্যত এরই বিরুদ্ধে, যদিও রাষ্ট্রিক ও ধনতান্ত্রিক পীড়ন-শোষণ বিষয়ে তিনি যথেষ্ট মনোযোগ দিয়েছেন। ঐ সামন্ততান্ত্রিক পাপ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ সংগ্রামের আহ্বান তাঁর গ্রাম-সংগঠনের মধ্যে মিলবে।

লক্ষণীয় এই যে 'তাসের দেশ' তারুণ্যের অগ্রদূত ও তখনকার কংগ্রেসের বামপক্ষীয় নেতা সুভাষচন্দ্রকে উৎসর্গ করা হয়েছিল এবং "খর বায়ু বয় বেগে" প্রভৃতি গানে কাণ্ডারী হিসেবে তাঁকে উৎসাহিত করা হয়েছিল।

'চণ্ডালিকা' কতকটা গান্ধীজীর হরিজন আন্দোলনের অভিঘাতে লেখা, যেমন লেখা 'পুনশ্চ'র কয়েকটি কবিতাও। গান্ধীজীর আন্দোলনের বিশ-পঁচিশ বছর আগে থেকেই রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় সমাজের এই লজ্জাকর গ্লানি সম্পর্কে পূর্ণ সচেতন ও কার্যকর হলেও, কবি ব'লে এই সব রচনায় তিনি সাময়িকতার দাবীকে মেনেছেন। 'চণ্ডালিকা'য় অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে করুণ প্রতিবাদ রাখা হয়েছে। তিনি এর বিরুদ্ধে যে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম নির্দেশ করেছেন তার প্রকৃতি সামগ্রিক, অস্পৃশ্যতা তার অংশ মাত্র। একালে শ্রীনিকেতন-কেন্দ্রিক পল্লী-সংস্কারে দেখতে পাই দুর্গত মানুষের উন্নয়নে গ্রামে দিবা ও নৈশ বিদ্যালয়, গ্রন্থাগার, স্বাস্থ্যরক্ষণ, চিকিৎসা, শিল্পস্থাপন, সমবায় ভাণ্ডার, সালিশী বিচার, রাস্তাঘাট সংস্কার প্রভৃতির ব্যবস্থা রয়েছে। এ ছাড়া সভা সম্মেলন, যাত্রা, কীর্তন, কথকতা, মেলা, প্রভৃতির ব্যাপারও আনুষঙ্গিকভাবে রয়েছে। এই সূত্রেই বোধ হয় গান্ধীজীর পল্লী উন্নয়ন ও কুটিরশিল্প প্রতিষ্ঠার আহ্বান, রবীন্দ্রনাথের উদ্যোগের বহু পরে।

॥ তৃতীয় পর্ব ॥

নাটক ছেড়ে এখন পুনশ্চ কাব্য-কবিতার কথা। বাষ্ট্র-সমাজের উপর প্রবল প্রতিবাদ নিয়ে রবীন্দ্রনাথেব আবেগ-উচ্ছ্বাসময় জীবনধর্মী কবিতাব পালা শেষ হ'ল মহুযায়। 'পুনশ্চ' থেকে বাস্তবকে অনুচ্ছ্বসিত সহজ দৃষ্টিতে দেখাব নোতুন পালার প্রাবম্ভ। সেইজন্য প্রকাশেব মধ্যেও অলংকাব ও ছন্দের ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধ কাব্যরীতির পথ পরিত্যাগ। পবে যেখানে কবি মিলেব দিকে ঝুঁকেছেন সেখানেও কবিব নিবলংকার সহজ অন্তবঙ্গতাই লক্ষণীয় হযেছে। তাঁব কবিতাব আধুনিক পাঠকদেব মধ্যে অনেকেই তাঁব পরিশীলিত বক্র গদ্যবীতিব জন্যই এই পর্যায়ের কবিতাব ভক্ত, তাঁদেব মধ্যে কেউ কেউ বা ভাবেব সহজ অন্তবঙ্গতাব্ জন্য। কিন্তু এ অভিমত ঠিক নয় যে এই পর্যায়েই ববীন্দ্রনাথ খুব বেশি মানবিক হযে উঠেছেন। প্রত্যক্ষ পরিচিতেব দিকে অধিকতর আগ্রহ এবং অলংকাবহীন সংকেতহীন ঋজুতাই অনেকক্ষেত্রে গভীবতাব ও আন্তরিকতাব ভ্রান্তি জাগিয়েছে। তবে এ কথা সত্য যে, আগে যেসব কথা কবি স্পষ্ট ক'বে বলতে পাবেন নি, মাত্র ইঙ্গিত দিয়ে ক্ষান্ত হয়েছেন, এখন স্পষ্টভাষী হয়ে উঠেছেন সে সব বিষয়ে, তা ছাডা কালোপযোগী কিছু নোতুন কথাও এ পর্যায়ে রযেছে। সে যাই হোক, বর্তমানে আমাদের লক্ষ্য নিবিষ্ট কবিব মানবিক ও সমাজবাদী ভাবনা বিষযে।

'পুনশ্চ' কাব্যের কযেকটি কবিতায় সাধাবণ ও তুচ্ছেব দিকে কবির মনোযোগ আকৃষ্ট হযেছে দেখি। কি নিসর্গ কি মানুষ সম্পর্কে কল্পনায় আকাশবিহার থেকে কবি ক্ষান্ত। শালিখ, বেজি, খেলনা, সাধারণ মেযে, সাঁওতাল নাবী, ছেঁড়া-ছাতি-মাথায় তিনটাকা মাইনের গুরু এই সব তাঁব চোখে পড়েছে মুহুর্মুহু, পদ্মাসংলগ্ন কল্পনার বিশালতা চলে গিয়ে সাঁওতালীদের সখা কোপাইবাহিত মাটি ও গ্রামীণ মানুষেব ছবির সঙ্গে এখন তাঁর নবপরিচয়েব পালা। 'বাঁশি' কবিতার বিড়ম্বিত কেবানী-জীবনেব ছবির জন্য একালের রবীন্দ্রনাথ অনেকেবই প্রিয় হয়েছেন। নিম্ন মধ্যবিত্তের সামাজিক ও অর্থনীতিক জীবনেব খুঁটিনাটির সঙ্গে কবির পরিচয় কতদূর ঘনিষ্ঠ ছিল তার বিবরণ যেমন তাঁর ছোটগল্পগুলি থেকে পাওয়া যায়, তেমনি পাওয়া যায় তাঁর এই ধরনের কবিতাগুলি থেকে। কৃষক-জীবনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ গভীর-ভাবেই পরিচিত ছিলেন, ছিলেন না ভূমিকেন্দ্রিক স্থায়িত্বের স্পর্শহীন শ্রমিকদের জীবনের সঙ্গে। এজন্য তিনি নিজ জীবনকে অসম্পূর্ণ ব'লেও মনে করেছেন পরবর্তী কয়েকটি কবিতায়। গান্ধীজীর হরিজন-আন্দোলনের দ্বারা উদ্বোধিত 'পুনশ্চ'র

কয়েকটি কবিতায়, যেমন শুচি, মুক্তি, প্রেমের সোনা, রংরেজিনী, সমাপন প্রভৃতিতে কবির অন্ত্যজভেদবুদ্ধি-বিরোধী মনোভাব লক্ষণীয়। গীতাঞ্জলি পর্যায়ে লেখা 'অপমান' কবিতা এবং 'অচলায়তন' নাটকে এবিষয়ে সমাজবাদী কবির গভীর অনুভব বহু পূর্বেই প্রকাশিত হয়েছে, তা ছাড়া লিখিত প্রবন্ধাদিও আরও পূর্ব থেকেই রয়েছে।

'পুনশ্চ'র এই পর্যায়ের কবিতাগুলির মধ্যে 'প্রথম পূজা' কবিতাটি বিশেষ মনোযোগের অপেক্ষা রাখে। ভারতের সামাজিক ইতিহাস বলে, প্রাচীন কাল থেকে আরম্ভ ক'রে মধ্যযুগ পর্যন্ত আর্য ও হিন্দুরা অনার্য অর্থাৎ নিষাদ কিরাত প্রভৃতি নবগোষ্ঠীর লোকদের এবং দ্রাবিড়ভাষী জনের ভাষা ও সংস্কৃতি প্রচুর পরিমাণে আত্মসাৎ করেছে। আজকের হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির মধ্যে অনার্য-মিশ্রণ এত বেশি যে একে আর্য-অনার্য মিশ্র সংস্কৃতি বলাই সমীচীন। বহু পূর্বে আর্য-অনার্য রক্তেরও বিমিশ্রণ ঘটেছিল যথেষ্ট। কিন্তু বৌদ্ধযুগের পর থেকে (আর্য-অনার্য মিশ্রিত) হিন্দুরা আত্মরক্ষায় বদ্ধপরিকর হয়ে সমাজে বিবাহ-সম্পর্কের দ্বারা অনার্যদের প্রবেশ ক্রমশঃ নিষিদ্ধ করে। এখন থেকে উচ্চবর্ণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের অনুকূলে সমাজের অর্থনীতিক বৃত্তিগত বিভাগগুলি জল-অচল কঠোর বর্ণ-বিভাগে রূপান্তরিত ক'রে তোলা হয়। আর জনপদের প্রত্যন্ত প্রদেশে কোল, মুণ্ডা, হো, শবর, কিরাত প্রভৃতি অনার্যদের যারা বসবাস ক'রে আসছিল এবং যারা ঠিক পূর্বেকার অনার্যও ছিল না, আর পুরোপুরি হিন্দু ব্রাহ্মণ্য ধর্মেরও সব কিছু আয়ত্ত ক'রে উঠতে পারেনি, তারা অস্পৃশ্য ম্লেচ্ছ অন্ত্যজরূপে হিন্দুসমাজের দ্বারদেশে থাকার অধিকার পেয়ে বৃহত্তর হিন্দু জাতির গণ্ডীতে রয়ে গেল। এদের গণ্য করা হ'ল হিন্দুসমাজের নিম্নতম বর্ণ ব'লে। এদের মধ্যস্থতাতেই মূল অনার্য ধর্মবিশ্বাসের অন্তর্ভুক্ত চণ্ডী, মনসা, ধর্মঠাকুর (অনার্য সূর্যদেবতা), ভৈরব, পঞ্চানন্দ, মাদানা, জিনাসিনী, বঙ্কিনী প্রভৃতি দেবতা-উপদেবতার পঞ্চম-ষষ্ঠ শতাব্দীতেই হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মে অনুপ্রবেশ। হিন্দুধর্ম ও সমাজের একেবারে প্রত্যন্ত-বাসী এই সব নিম্নবর্ণের জনের বর্ণবিভাগ হ'ল—বাউরী, বাগ্‌দী, ডোম, কুড়মী, মাহাতো, রাজবংশী, পোদ প্রভৃতি। অনার্য ও নিম্নবর্ণের সংস্কৃতির আর্যীকরণ বা হিন্দুসমাজীকরণের মধ্যে লক্ষণীয় ব্যাপার হ'ল এই যে এইসব ধর্ম ও সংস্কৃতি যাদের তারা কিন্তু যত্নপূর্বক উপেক্ষিত রইল। সংকীর্ণমনা এবং শ্রেণীস্বার্থপরায়ণ ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় এদের সর্বস্ব কেড়েকুড়ে নিয়ে ছোটজাতের বিধানের মধ্যে এদের শৃঙ্খলিত করলেন। এই সব দেবতার পূজা বরণ ক'রে সমারোহ সহকারে মন্দির-মণ্ডপ নির্মাণ ক'রে মন্ত্রতন্ত্র ও কাহিনীকাব্য নির্মাণের হুকুম দিয়ে ক্ষত্রিয়-ব্রাহ্মণ ভূম্যধিকারীরা বস্তুতপক্ষে এই অনার্য নিম্নবর্ণের জীবনসর্বস্ব অপহরণই করলেন এবং এখন থেকে তারা ঐ সব দেবতার কেবল পূজা-আরাধনা থেকেই নয়, কোথাও কোথাও চোখে দেখার

অধিকার থেকেও বঞ্চিত হল।* দেবতার কল্পনা ক'রে তার কাছে পূজো-মানত ভালো কি মন্দ সেই নিয়ে কথা নয়, দেখতে হবে একটি বৃহৎ মানবগোষ্ঠীর সমাজজীবন যে-ধর্মবিশ্বাসকে কেন্দ্র ক'রে চালিত হ'ত, যে-ধর্মভয় এই রকম জনসমাজকে সরল অথচ সন্দেহপ্রবণ, ভীত অথচ সত্যবাক্, নম্র এবং সহিষ্ণু অথচ বীরত্বে মণ্ডিত ক'রে তুলেছিল, সেই ধর্মের আশ্রয় থেকে এরা বঞ্চিত হ'ল। যে-দেবতার পূজা উৎসব এদের মিলনের কেন্দ্র ছিল তা থেকে বঞ্চিত হওয়ায় এরা বিপন্ন অসহায় হয়ে পড়ল। 'প্রথম পূজা' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ সভ্য ও বলশালী উচ্চবর্ণ কর্তৃক নিম্নবর্ণের উপর আচরিত এই নিষ্ঠুর শোষণের দিকটি কাহিনীমণ্ডিত ক'রে প্রকাশ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন, ক্ষত্রিয়রাজা যে কিরাতদের দেবতাকে বলপূর্বক রাজধানীতে নিয়ে এসে পাথরের মন্দির গড়ে পূজোর ব্যবস্থা করলেন মহাধুমধাম ক'রে, একদা ভূমিকম্পে মন্দির ভেঙে গেলে সেই কিরাতদেরই ডেকে আনতে হ'ল মন্দির সংস্কার করতে। নিপুণ কারিগর কিরাতবৃদ্ধের চোখ বেঁধে দেওয়া হ'ল, কারণ তার দৃষ্টিতে দেবতা অশুচি হয়ে পড়বেন। সতর্ক প্রহরায় বৃদ্ধ চোখ বেঁধেই কাজ করতে লাগল একদা তার নিজের দেবতাকে দেখার জন্য অন্তরে তৃষিত হয়ে। কাজ যেদিন শেষ হ'য়ে এল, সেদিন আর সে থাকতে পারলে না। রাজার নিষেধ অবহেলা ক'রে প্রাণ ভরে' তার দেবতাকে দেখতে লাগল। কবি বর্ণনা করছেন—

প্রহরী গেল।
মাধব খুলে ফেললে চোখের বন্ধন।
মুক্ত দ্বার দিয়ে পড়েছে একাদশী-চাঁদের পূর্ণ আলো
দেবমূর্তির উপরে।
মাধব হাঁটু গেড়ে বসল, দুই হাত জোড় ক'রে
একদৃষ্টে চেয়ে রইল দেবতার মুখে,
দুই চোখে বইল জলের ধারা।
আজ হাজার বছরের ক্ষুধিত দেখা দেবতার সঙ্গে ভক্তের।
রাজা প্রবেশ করলেন মন্দিরে।
তখন মাধবের মাথা নত বেদীমূলে।
রাজার তলোয়ারে মুহূর্তে ছিন্ন হ'ল সেই মাথা।
দেবতার পায়ে এই প্রথম পূজা, এই শেষ প্রণাম।

গান্ধীজী-প্রবর্তিত হরিজনদের মন্দির প্রবেশ আন্দোলনের অভিঘাতে বিশিষ্ট এই কবিতাটি লেখা এবং এই সামাজিক অপরাধের অমানবীয়তা রবীন্দ্রনাথ ভালোভাবেই

* এবিষয়ে লেখকের 'বৈষ্ণব-রস-প্রকাশ' গ্রন্থের 'সামাজিক পটভূমি' অংশও দ্রষ্টব্য।

পরিস্ফুট করেছেন। অথচ রবীন্দ্রনাথ এর মধ্যে বিশেষত্বও ফুটিয়েছেন। তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন, যে-দেবতার মন্দির প্রবেশে পুরোহিত-ক্ষত্রিয়দের এই জঘন্য স্বার্থপর নিষেধ সেই দেবতা এককালে এই অস্পৃশ্য অন্ত্যজদেরই ছিল। এই প্রসঙ্গে, কবির এই মুক্তচিত্ত শূদ্রানুরাগের ভূমিকায় পরবর্তী পত্রপুট কাব্যের পনেরো সংখ্যক কবিতাটির বক্তব্য মিলিয়ে দেখা যেতে পারে। কবিতাটি কবির মানুষপ্রীতি, বিশেষতঃ লাঞ্ছিত নিপীড়িত মানুষের সঙ্গে একাত্মতা কামনা বিষয়ে একটি উল্লেখযোগ্য দলিলের মত। কবি বাউলদেব উপর উচ্চবর্ণের হিন্দুসমাজের ব্যবহারকে ধিক্কাব দিয়ে কবিতাটি আরম্ভ কবেছেন—

ওবা অন্ত্যজ, ওবা মন্ত্রবর্জিত।
দেবালয়ের মন্দিরদ্বারে
পূজা-ব্যবসাযী ওদেব ঠেকিয়ে রাখে
—ইত্যাদি

এবং এদেব সঙ্গেই তাঁব মানসিক ভাববন্ধন ও সর্বাত্মক একজাতিত্ব অঙ্গীকার ক'বে দৃঢভাবে ঘোষণা করেছেন—

কবি আমি ওদের দলে—
আমি ব্রাত্য, আমি মন্ত্রহীন,
দেবতার বন্দীশালায়
আমার নৈবেদ্য পৌঁছল না।
পূজারি হাসিমুখে মন্দিব থেকে বাহিব হযে আসে,
আমাকে শুধায, "দেখে এলে তোমার দেবতাকে ?"
আমি বলি "না"।
অবাক হয় শুনে, বলে, "জানা নেই পথ ?"
আমি বলি, "না"।
প্রশ্ন করে "কোনো জাত নেই বুঝি তোমাব ?"
আমি বলি, "না"।

মন্দিরে অবরুদ্ধ কেবলমাত্র উচ্চবর্ণের শ্রেণীস্বার্থে বিভক্ত দেবতায় কবির শ্রদ্ধা নেই। হোক মূর্তিতে গাঁথা, তবু কিরাতদের দেবতা এইভাবে অবরুদ্ধ এবং শ্রেণীচিহ্নিত ছিল না। তা ছাড়া দেবতার সঙ্গে তাদের সম্পর্কও ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়দের মত ঐশ্বর্যময় কৃত্রিম ছিল না। দেখতে হবে গীতায় দৈবী এবং আসুরী সম্পদ্ বিভাগের অধ্যায়ে এই ঐশ্বর্য-রীতির দেবপূজাকে আসুরী বলা হয়েছে। এবকম দেবভাবনার প্রতিবাদেই শ্রীচৈতন্যের নামপ্রীতিময় নূতন ধর্মের পথ প্রদর্শন।

'পুনশ্চ' কাব্যের অতিব্যাপক কবি-সহানুভূতির স্পর্শ থেকে ইতর প্রাণীও দূরে থাকেনি একথা পূর্বেই বলেছি। এরকম সহজ সহানুভূতির স্পর্শে সকরুণ কবির একটি বাস্তবধর্মী কবিতা হ'ল 'ছুটির আয়োজন'। এতে সভ্য নরলোকে পূজাব ছুটির আনন্দের তালিকা দিয়ে বৈপরীত্যে জীবলোকে ছাগশিশুদেব বলিদান-পূর্ব নিষ্ফল ক্রন্দনের করুণ সুর শোনানো হয়েছে। এ ছাড়া প্রকাশসৌকর্য, প্রাবম্ভ-মধ্য-উপসংহার-মিলিত ভাববন্ধন প্রভৃতি বিবেচনা ক'বে কেবল কবিতা হিসেবে এটিকে কবিব উৎকৃষ্ট বচনা-গুলিব একটি ব'লে স্বচ্ছন্দে গ্রহণ করা যেতে পাবে। 'পুনশ্চ'ব অধিকাংশ কবিতাই অনাদৃতের জন্য সহানুভূতিতে মাখা, পূর্বেকাব বিদ্রোহ-বিপ্লবেব ভাব নিয়ে নয় এই পার্থক্য। অন্যাযবিবোধী, অন্যায়যুদ্ধবিবোধী, বাষ্ট্রিক ষড়যন্ত্রে এবং মাবণাস্ত্র নির্মাণে ব্যথিত অথচ শেষ পর্যন্ত আশাবাদী কবিব নির্ভবস্থল হিসেবে মানবপুত্র এবং শিশুতীর্থ কবিতা ছুটিব বচনা। এব মধ্যে লক্ষণীয় এই যে মানবপুত্র কবিতায় ঈশ্বরকে 'মানুষেব ঈশ্বব' বা অন্যভাষায় মানুষের অন্তবতম মানুষ হিসেবে দেখা হয়েছে, আব 'শিশুতীর্থ' কবিতায় দ্বন্দ্ববিবোধ-সংশয়সংকটেব মধ্য দিয়ে যাত্রী মানুষেব অবশেষে ঐ মানবপুত্র অর্থাৎ মানুষেব চবম অভিব্যক্তি লাভেব কথা বলা হয়েছে। অভিব্যক্তিব ধাবায় মানুষেব মহিমা বিষয়ে কবি আস্থাবান্ হন 'বলাকা' পর্যায়ে। পরে 'Religion of Man' বক্তৃতায় এই ধাবণাকে প্রাচীন ভাবতীয় এবং বাউলদেব জীবন-দর্শনের বিশ্লেষণ মিলিয়ে বিস্তৃতভাবে দেখেন, তারপর 'মানুষের ধর্ম' ভাষণে আবও সংহতভাবে স্বার্থত্যাগী অভিযাত্রী মানুষেব চবম প্রকাশেব মধ্যে মহামানবেব প্রকাশ দেখেন। পূর্বে উল্লিখিত পত্রপুটের আত্মস্বরূপবিবৃতিব মধ্যে তিনি আমাদের পরিচিত ঈশ্বরকে অস্বীকাব ক'রে সৃষ্টিব চরম এবং পরম সত্তাকে 'চিবকালেব মানুষ' 'সকল মানুষের মানুষ' ব'লে আহ্বান কবেছেন। কাবণ, তাঁব মতে সৃষ্টির শেষ সীমা মানুষে এবং মানুষেব শেষ সীমা সংকীর্ণতাহীন বিভেদহীন একমানবতায়। এর উপবে নিয়ন্তা ঈশ্বব আছেন কি নেই এ চিন্তা এবং একে স্বীকার কবা রবীন্দ্রনাথ প্রয়োজনীয় ব'লে মনে কবেন না। পত্রপুটের ঐ কবিতাটিতেই কবি জাতিবর্ণেব চিহ্নহীন অভিযাত্রী আত্মপ্রকাশশীল মানুষেব সঙ্গে নিজের সাজাত্য নিম্নলিখিতভাবে জানিয়েছেন—

যারা এসেছে ইতিহাসের মহাযুগে
আলো নিয়ে, অস্ত্র নিয়ে, মহাবাণী নিয়ে।
তারা বীর, তারা তপস্বী, তারা মৃত্যুঞ্জয়,
তারা আমার অন্তরঙ্গ, আমার স্ববর্ণ, আমার স্বগোত্র,
তাদের নিত্যশুচিতায় আমি শুচি।

মহাকবি রবীন্দ্রনাথের শেষজীবনের এই সব সামন্ততান্ত্রিক অমানবিকতার

প্রতিবাদের সঙ্গে তাঁর পূর্বকালের গদ্যপদ্য ভাষণাবলীর বক্তব্য মিলিয়ে দেখতে হবে এবং একালের শ্রীনিকেতন-স্বাক্ষবিত বাস্তব জনসংযোগের বিষয়ও চিন্তা করতে হবে। এই ১৯৩০-৩২এর সময় ভারতে আইন-অমান্য আন্দোলনের প্রাবল্য। এর ফলে ইংরেজরা যে নির্যাতন চালিয়েছিল তার প্রতিবাদ কবি নানাভাবে করেছেন, কিন্তু ঐ আন্দোলনের পরিপার্শ্বে যুক্ত হবিজন আন্দোলনই তাঁকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছে। এটি আংশিকভাবে তাঁর স্বকীয় পুনঃপুনঃ পূর্বাচরিত ব্যাপার ব'লে, এবং তাঁব পরিকল্পিত সামন্ততান্ত্রিকতার প্রতিবাদ স্বরূপ স্বদেশী-সমাজ গঠনের অনুকূল ব'লে। নতুবা আইন-অমান্যেব রাজনীতিক সাফল্য সম্পর্কে তিনি সন্দিগ্ধ, যেমন ছিলেন পূর্বে অসহযোগ সম্বন্ধে, কিম্বা আবও পূর্বে বাঙ্‌লার বয়কট সম্বন্ধে। এই মানব-মহিমা উপলব্ধির সূত্রে পত্রপুটেব পৃথিবী-প্রণাম বিষয়ক কবিতাটিব কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। কর্মী এবং সংগ্রামী মানুষকে দুঃখের পথে জয়ের পথে গৌরবান্বিত হওয়ার অধিকার দিয়েছে এই পৃথিবী। যে পৃথিবী কেবল শস্যশ্যামল পুষ্পকোমল নয়, বন্ধুব রুক্ষ কঠিনও। এর মধ্যে নিযত পঞ্চভূতেব সঙ্গে সংগ্রাম ক'বেই মানুষ সভ্যতার বিজয়তোরণ গডতে পেবেছে। কবি পৃথিবী-ভিত্তিক মানব-সভ্যতার সেই ইতিবৃত্ত দিযেছেন, পৃথিবীব কোমলতা ও ভীষণতার বৈপবীত্য দেখিয়েছেন এবং এই সূত্রে অভিযাত্রী মানুষের পক্ষ নিযে পৃথিবীকে প্রণাম জানিয়েছেন। পৃথিবী এবং তার রূঢ় বাস্তব পবিস্থিতিকে এই মর্মে স্বীকার ও গ্রহণ করার বিষয় শেষলেখাব "রূপনারানেব কূলে জেগে উঠিলাম" প্রভৃতি কবিতা পর্যন্ত প্রসারিত। অন্য একটি কবিতায় আবাব কঠোর দুঃখময় সংগ্রামী জীবনের এই গৌবব তাঁর নিজের হ'ল না ব'লে আক্ষেপ কবেছেন, যেমন—

মৃত্যুর গ্রন্থি থেকে ছিনিযে ছিনিয়ে
যে উদ্ধাব কবে জীবনকে
সেই রুদ্রমানবের আত্মপরিচয়ে বঞ্চিত
ক্ষীণ পাণ্ডুব আমি
অপরিস্ফুটতার অসম্মান নিয়ে যাচ্ছি চলে।

(পত্রপুট—বারো)

ঠিক এই আক্ষেপ আরও স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে 'জন্মদিনে' কাব্যের 'ঐকতান' কবিতায়। যাবতীয় কর্মযোগী মানুষের এই শ্রেণীতে তিনি সমাজের অবহেলিত সবচেয়ে দরিদ্র কৃষক-শ্রমিকদেরও দেখেছেন, তাদেবও উক্ত গৌরবেব অধিকার দিয়েছেন এবং তুলনায় নিজেকে সংকীর্ণ গণ্ডির এবং ভুয়ো সম্মানের অধিকারী ব'লে বিবেচনা করেছেন, যেমন—

চাষি খেতে চালাইছে হাল।
তাঁতি বসে তাঁত বোনে, জেলে ফেলে জাল—
বহুদূরপ্রসারিত এদের বিচিত্র কর্মভার
তারি 'পরে ভর দিয়ে চলিতেছে সমস্ত সংসার।
অতিক্ষুদ্র অংশে তার সম্মানের চিরনির্বাসনে
সমাজের উচ্চমঞ্চে বসেছি সংকীর্ণ বাতায়নে।

কবি ঠিকই লক্ষ্য করেছেন, একদা যে মানুষ পাথর গুঁড়িয়ে, বাধা ডিঙিয়ে পৃথিবীকে তার অধীন করেছে, তার উপর আহার পরিধেয় শ্রী-সম্পদ্ সৃষ্টি করেছে, তাদেরই বংশধরেরা আজ সভ্যতার বনিয়াদ আরও মজবুত করে চলেছে, আর সেই আদিকাল থেকেই সুকৌশলে এই কর্মের ফলভোগ ক'রে আসছে বণিক্ বুর্জোয়া শ্রেণী। এই কথাই কবি গদ্যে বলতে চেয়েছেন বহু পূর্ব থেকেই, যেমন, রাশিয়ার চিঠি—

চিরকালই মানুষের সভ্যতায় একদল অখ্যাত লোক থাকে, তাদেরই সংখ্যা বেশি, তারাই বাহন, তাদের মানুষ হবার সময় নেই, দেশের সম্পদের উচ্ছিষ্টে তারা পালিত। সব চেয়ে কম খেয়ে কম পরে কম শিখে বাকি সকলের পরিচর্যা করে, সকলের চেয়ে বেশি তাদের পরিশ্রম, সকলের চেয়ে বেশি তাদের অসম্মান। কথায় কথায় তারা উপোসে মরে, উপরওয়ালাদের লাথি-ঝাঁটা খেয়ে মরে—জীবনযাত্রার জন্য যত কিছু সুযোগ সুবিধে সব কিছুরই থেকে তারা বঞ্চিত। তারা সভ্যতার পিলসুজ, মাথায় প্রদীপ নিয়ে খাড়া দাঁড়িয়ে থাকে—উপরের সবাই আলো পায়, তাদের গা দিয়ে তেল গড়িয়ে পড়ে।

যেমন 'পল্লীসেবা' প্রবন্ধে—

মুখে আমরা যাই বলি, দেশ বলতে আমরা যা বুঝি সে হচ্ছে ভদ্রলোকের দেশ। জনসাধারণকে আমরা বলি ছোটোলোক, এই সংজ্ঞাটা বহুকাল থেকে আমাদের অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করেছে। ছোটোলোকদের পক্ষে সকল-প্রকার মাপকাঠিই ছোটো। তারা নিজেও সেটা স্বীকার করে নিয়েছে। বড়ো মাপের কিছুই দাবি করবার ভরসা তাদের নেই। তারা ভদ্রলোকের ছায়াচর, তাদের প্রকাশ অনুজ্জ্বল।

এই সময়কার শ্রেণীপার্থক্যের প্রতিবাদে লেখা 'কালের যাত্রা' প্রভৃতির বিষয় পূর্বেই বলা হয়েছে।

এসব কথা আমরা প্রথম অধ্যায়েই যদিও বলেছি, তার পুনরুল্লেখ করতে হ'ল এই

বোঝানোর জন্য যে কবিতায় মহাকবি যা বলেছেন তা নিছক কাব্য-কল্পনা নয়, তার মূল নিহিত রয়েছে তাঁর আন্তরিক এবং অর্থবান্ সুগভীর প্রত্যয়ের মধ্যে, আর তাঁর এই মানবিকতা আজকের পৃথিবীব যুক্তিনির্ভর সর্বাধুনিক মানবমুক্তির প্রয়াসের সঙ্গে একান্তভাবেই যুক্ত, এ ঔপনিষদিক ভাবমুগ্ধতা মাত্র নয়। রবীন্দ্রনাথ রোম্যাণ্টিক কবিমন নিয়ে একদা আধুনিক সভ্যতার কৃত্রিমতায় ব্যথিত হযে এ থেকে মুক্তি চেয়েছিলেন এই ব'লে যে—'দাও ফিবে সে অবণ্য লও এ নগর', কিন্তু ক্রমশঃ তিনি আবণ্যক মনোভাব ত্যাগ কবেছেন, বিজ্ঞানাশ্রয়ী আধুনিক সভ্যতার কল্যাণমূলক ঐশ্বর্যে আকৃষ্ট হযেছেন, যদিও গ্রামকেন্দ্রিক নূতনতর সমাজবন্ধনের জীবনই তাঁর প্রার্থিত হযেছে। তাঁর আদর্শের এই সমাজবন্ধনে অবহেলিত নিম্নবর্ণ ও হিন্দু-মুসলমান-বিভেদ থাকবে না, যন্ত্রবিজ্ঞানেব উপকাবিতা থাকবে, অথচ দাসত্বে আবদ্ধ-কবা শোষণ থাকবে না, সেই সঙ্গে প্রথা ও সংস্কাবেব এবং মাটিব অধিকাবেব চিবাগত সামন্ততান্ত্রিক শোষণ থেকেও মানুষ হবে মুক্ত। এই দৃষ্টিকোণ যেমন তাঁব প্রবন্ধ ও ভাষণে, তেমনি কাব্য-নাট্য-কবিতাব মধ্যেও সমান্তবালভাবে অভিব্যক্ত হয়েছে। কাব্যে অনেকটা সংকেতে কথা বলতে হয়, একটি বাক্যে বা শব্দে অনেক কথাব আভাস দিতে হয, সেজন্য অনেক সময পাঠকেব ধাবণা হতে পাবে যে প্রবন্ধেই রবীন্দ্রনাথ বুঝি সমাজ-বিপ্লবেব কথা বলেছেন, আর কাব্যে কাল্পনিক বিষযেব অবতাবণা করেছেন। সে বিচার ঠিক নয দেখানোর জন্যে কবিতা নাটক ও প্রবন্ধাদি পাশাপাশি বেখে কবিব অভিপ্রায বোঝানোব প্রয়াস করতে হ'ল।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর মোটামুটি দীর্ঘ জীবৎকালেব মধ্যে সাম্রাজ্যবাদ, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ ও সোচ্চাবে উল্লিখিত গণতন্ত্রের স্বরূপ বেশ বুঝে নিযেছিলেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের হুংকার ও হত্যালীলাব বিবরণ শুনতে শুনতেই তাঁর লোকান্তর ঘটে। প্রথম মহাযুদ্ধ এবং তার ফলাফল তিনি পূর্ণভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। তাবও পূর্বে নৃশংস বুয়ব যুদ্ধের সঙ্গে তাঁব পরিচয় ঘটে। কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধ তাঁর ধ্যান ধারণা যেভাবে বদলে দেয়, এমন আব কোনোটিই নয়। প্রথম মহাযুদ্ধে তাঁর মনে কিছু আশার সঞ্চার হয়েছিল, আশা এই নিয়ে যে ঐ যুদ্ধে সাম্রাজ্যলোভীদের শির-দাঁড়া ভেঙে যাবে। তাঁর এই আশার পবিচয় 'শান্তিনিকেতন' ভাষণে, বলাকার 'ঝড়ের খেয়া' কবিতা প্রভৃতিতে প্রকাশিত হয়েছে। এরকম একটা আশা নিয়েই তিনি জাপান ও আমেরিকায় উগ্র-জাতীয়তাবিবোধী বক্তৃতা শুরু করেন, কিন্তু যুদ্ধ শেষ না হতেই কবির স্বপ্নভঙ্গও ঘটে পীস কনফারেন্স্, লীগ অব্ নেশন প্রভৃতির কার্যাবলী দৃষ্টে। রোমাঁ রোলাঁর মত তিনিও স্পষ্ট বুঝতে পারেন যে উপনিবেশ ভাগাভাগি ও পরাজিত শত্রুকে কাবু করার যে রকম আয়োজন হচ্ছে তাতে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ অনিবার্য। ফলে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ যখন

এল তখন শুধু হত্যালীলা এবং মানুষের দুর্ভোগের বিষয় চিন্তা ক'বে তিনি নিতান্ত বিষণ্ণ হলেন এবং কদাচিৎ অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামেব আহ্বানও জানালেন। কিন্তু ইটালির বলপূর্বক আবিসিনিয়া অধিকার এবং বিশেষতঃ জাপানের পুনঃ পুনঃ চীন আক্রমণ তাঁর কাছে অসহনীয় হয়েছিল। এবং ভাষণে .কবিতায় চিঠিপত্রে তিনি এর প্রতিবাদও করেছিলেন যথেষ্ট। বস্তুতঃ সাম্রাজ্যবাদীদেব লীলাভূমি আফ্রিকা ও চীন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের অন্তবে একটি কোমল ও স্পর্শকাতর কক্ষ ছিল। 'আফ্রিকা' কবিতায় তাই কেবল ইটালিকেই নয়, সমস্ত সাম্রাজ্যবাদীদেব ধিক্কাব দিলেন এবং তাদের চরিত্র আঁকলেন স্পষ্টভাবে নিন্দাব কালি মাখিয়ে—

এল ওবা লোহাব হাতকডি নিযে
নখ যাদের তীক্ষ্ণ তোমাব নেকডের চেয়ে।
এল মানুষ-ধবার দল
গর্বে যাবা অন্ধ তোমাব সূর্যহাবা অবণ্যেব চেযে।
সভ্যেব বর্বব লোভ
নগ্ন কবল আপন নির্লজ্জ অমানুষতা।

ববীন্দ্রনাথের অধ্যযনে এই লোভ গর্ব নিষ্ঠুবতা অহমিকা এ হ'ল য়ুবোপীয জাতি-স্বভাব, সেইজন্য সাম্রাজ্যবাদী পবদেশাধিকাব বাষ্ট্রনীতিকদেব হাতে সংঘটিত হ'লেও এব পিছনে আমেবিকা-যুবোপীয় জাতিগুলিব লোলুপ নীরব সমর্থন বযেছে, তাই তিনি দেখালেন যে রাজনীতিকদের নৃশংস আচবণে যুবোপীয মানুষ নির্বিকাব, কোনও প্রতিবাদই উঠছে না সমগ্রভাবে সেই মানুষদেব কাছ থেকে—

সমুদ্রপাবে সেই মুহূর্তেই তাদেব পাডায় পাডায
মন্দিবে বাজছিল পূজাব ঘণ্টা
সকালে সন্ধ্যায়, দয়াময় দেবতাব নামে,
শিশুবা খেলছিল মায়েব কোলে,
কবিব সংগীতে বেজে উঠছিল
সুন্দরের আবাধনা।

রবীন্দ্রনাথের এ ধারণা যে বহুল পরিমাণে ঠিক তাব পরিচয় মিলছে জাপান কর্তৃক চীন আক্রমণের পর (১৯৩৭ খ্রীঃ) জাপানী কবিবন্ধু নোগুচির জাপানী আক্রমণ সমর্থনে। এই জাপানী কার্যের প্রতিবাদে কবি পর পর বেশ কযেকটি কবিতা লেখেন, যার মধ্যে প্রথম কবিতাটিতে যে ভাষা কবি ব্যবহার করেছেন তাতে এব্যাপাবে তাঁর অসহিষ্ণুতা যে চরমে উঠেছিল তা বোঝা যায়, যেমন—

ওদের ঘাড় হ'ল বাঁকা, চোখ হ'ল রাঙা,
কিড়মিড় করতে লাগল দাঁত,
মানুষের কাঁচা মাংসে যমের ভোজ ভরতি করতে
বেরোল দলে দলে।
সবার আগে চলল দয়াময় বুদ্ধের মন্দিরে
তাঁর পবিত্র আশীর্বাদের আশায়।

'নবজাতকে' গ্রথিত একটি কবিতায় কবি স্পষ্ট দেখতে পেয়েছেন এই সাম্রাজ্যবাদী বর্বরতার পিছনে রয়েছে ধনতান্ত্রিক লোভ। শুধু রাষ্ট্রনীতি নয়, সাহিত্য বিজ্ঞানও এই আক্রমণে মদত দিচ্ছে। মনে হয় তাঁর বহুকথিত উগ্রজাতীয়তাকে এখন ধনতান্ত্রিকতা নামেই তিনি অভিহিত করতে চান। ঐ 'প্রায়শ্চিত্ত' কবিতায় 'সভ্যনামিক পাতালে যেথায় জমেছে লুটের ধন' 'বিদীর্ণ হল ধনভাণ্ডারতল' 'ধরার বক্ষ চিরিয়া চলুক বিজ্ঞানী হাড়গিলা' প্রভৃতি বাক্য লক্ষণীয়।

একদিকে স্বদেশে আইন-অমান্য, ১৯৩৫এর শাসনসংস্কার, সুভাষচন্দ্রের বাধ্য হয়ে কংগ্রেস ত্যাগ প্রভৃতি নিয়ে অনিশ্চিত অবস্থা, অন্যদিকে রোমাঁ রোলাঁ প্রমুখ মানবহিতৈষীদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ ক'রে য়ুরোপে এশিয়ায় সাইরেন-সংকেত এবং স্বগৃহে তাঁর গ্রাম-সংগঠনের প্রতি দেশবাসীদের উপেক্ষা—এ সব নিয়ে যৌবনের অগ্রদূত চির-যাত্রী কবি নিশ্চিন্তে মহাযাত্রা করতে পেরেছিলেন কিনা সন্দেহ। তবু যেহেতু আশাবাদী এবং আজীবন নিপীড়িত মানুষের মুক্তিকামী, সেইহেতু তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস অনুসারে ইতিহাস-বিধাতা নিশ্চয়ই মানুষের লাঞ্ছনা বেশিদিন সহ্য করবেন না। আর স্বদেশ সম্পর্কে তিনি পুনঃ পুনঃ জানিয়ে এসেছিলেন যে ইংরেজেরা ইতিহাসের ধারায় এসেছে, আবার সেইভাবেই বিদায় নিতে বাধ্য হবে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ সম্পর্কে তাঁর উপলব্ধি প্রথম মহাযুদ্ধকালের মতই—এ বিধাতার অভিশাপে এসেছে, পাপের আত্ম-হত্যা ঘটবে। বলা বাহুল্য, এর পর থেকেই উপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ লোপ পেয়ে এসেছে, পর্যবসিত হয়েছে অর্থনীতিক অধীনতাবাদে। আজকের দুর্বল রাষ্ট্রগুলি বলশালী হয়ে উঠলে তাও থাকবে না। অন্ততঃ সাম্প্রতিকে আমাদের স্বদেশে অর্থনীতির আত্মনিয়ন্ত্রণের দিকে প্রয়াস উজ্জ্বল ভবিষ্যতেরই সূচনা করছে বলা যেতে পারে। তবু গ্রামীণ মানুষ আজও সেই তিমিরে, অশিক্ষায় দারিদ্র্যে এবং জাতিভেদজনিত ঘৃণার কবলে। এদিকে অর্থনীতিক উন্নয়ন-পরিকল্পনার সুযোগ নিয়ে মুষ্টিমেয় পুঁজিপতি দেশকে তাদেরই নিয়ন্ত্রণে রাখার প্রয়াস করছে, বুর্জোয়া সম্প্রদায় সুবিধাবাদীর ভূমিকা নিয়েছে, যেমনটি ঠিক শাস্ত্রে লেখে তেমনভাবেই। দেশের এই অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে সুযোগ্য প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী যে দৃষ্টিভঙ্গি অবলম্বন

করেছেন তার সঙ্গে রবীন্দ্র-অভিলাষের বিশেষ মিলই দেখা যাচ্ছে। তবু নীতি নির্ধারণ এক কথা, আর কাজে পরিণত হওয়া অন্য কথা। এ বহুল পরিমাণে নির্ভর করছে দেশের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের উপর, তাঁদের চারিত্র্যের উপর। এমন সময়ে স্বদেশ ও সমাজ বিষয়ে লেখা রবীন্দ্রনাথের সর্বশেষ কবিতাটি সকলকে স্মরণ করিয়ে দিই। কবিতাটি ইংরেজের ভাবী বিদায়কালকে সামনে রেখে লেখা হ'লেও তার স্পষ্টাক্ষর মর্মকথা আজও অনুধাবনযোগ্য—

সিংহাসনতলচ্ছায়ে দূরে দূরান্তরে
যে রাজ্য জানায় স্পর্ধাভরে
রাজায় প্রজায় ভেদ মাপা,
পায়ের তলায় রাখে সর্বনাশ চাপা।
হতভাগ্য যে রাজ্যের সুবিস্তীর্ণ দৈন্যজীর্ণ প্রাণ
রাজমুকুটেরে নিত্য করিছে কুৎসিত অপমান,
অসহ্য তাহার দুঃখ তাপ
রাজারে না যদি লাগে, লাগে তারে বিধাতার শাপ।
মহা-ঐশ্বর্যের নিম্নতলে
অর্ধাশন অনশন দাহ করে নিত্য ক্ষুধানলে,
শুষ্কপ্রায় কলুষিত পিপাসার জল,
দেহে নাই শীতের সম্বল,
অবারিত মৃত্যুর দুয়ার,
নিষ্ঠুর তাহার চেয়ে জীবন্মৃত দেহ চর্মসার
শোষণ করিছে দিনরাত
রুদ্ধ আরোগ্যের পথে রোগের অবাধ অভিঘাত—
সেথা মুমূর্ষুর দল, রাজত্বের হয় না সহায়,
হয় মহাদায়।

কবির বাস্তব সমাজবোধের একটা সাধারণ পরিচয় সংক্ষেপে বিবৃত ক'রে আমরা উপসংহারের দিকে আসছি। রবীন্দ্রনাথের কাব্য-সমীক্ষায় তাঁর জীবনবাদ এবং স্বদেশ-চিন্তায় তাঁর সমাজবাদের বিষয়টি উপেক্ষিত হওয়াতেই আমাদের এই প্রয়াস। সংস্কারমুক্ত শুদ্ধ অনুভব যেমন কবিচিত্তকে মহৎ কলাসৃষ্টির উপযোগী ক'রে তুলেছে তেমনি সমাজদর্শনেও করেছে প্রগতির পথিক। আবার মুক্তমনের অধিকারী হওয়ার জন্যই কোনো ইজ্‌ম্ বা প্রচলিত মতামতের প্রভাবে প'ড়ে তিনি কোনো নির্দেশ দিতে চান নি, সে মতামত যত প্রবলই হোক না কেন। যে সংস্কার ও

অভিমত তাঁর অনাবিল নিরীক্ষায় ও অধ্যয়নে যথাযথ ব'লে মনে হয়েছে, মাত্র তাকেই তিনি বহুমান করেছেন। তবু স্থান-কাল-পরিবেশের দাবিও হয়ত তাঁকে স্বল্প পরিমাণে সীমিত করেছে, সেক্ষেত্রে পরস্পর-বিরোধী বক্তব্যের যৎকিঞ্চিৎ সন্নিবেশ থাকলেও কোন্‌টি তাঁর স্থায়িভাবে অভিপ্রেত তা অনুধাবন করা সহানুভূতির অধিকার নিয়ে বোধ হয় শক্তও নয়। কবিতায় একরকম কথা আর চিন্তায় অন্যরকম কথাও তিনি বলেন নি।

আমাদের এই সাম্প্রতিক উদ্যম বিশেষভাবে স্বদেশের তরুণ সম্প্রদায়কে লক্ষ্য ক'রে। তাঁরা দেখুন এই কবি-মনীষী উপনিষদীয় ভূমা নিয়ে কাল কাটান নি, পুণ্য আর অমৃতের ফাঁকা বুলিতে ঝুলি ভরিয়ে তোলেন নি। স্বার্থসুবিধাবাদী বুর্জোয়া মনোভাবকে এবং পুরাতন অন্ধ সংস্কারকে বিতাড়িত করতে চেয়েছেন, সমাজ-বিপ্লব চেয়েছেন কায়মনোবাক্যে। আর তিনি কালবারিতও হয়ে পড়েন নি। তাঁর জন্মসূত্র ধ'রে এবং বহিরঙ্গ কর্মবশ্যতার দু একটি দিক লক্ষ্য ক'রে অথবা আমাদেরই বিকৃত ব্যাখ্যা কানে শু'নে বা বইয়ে প'ড়ে যাঁরা তাঁকে বুর্জোয়া মনোভাবের ব'লে ধ'রে রেখেছেন তাঁরা যেন সহানুভূতি নিয়ে অধ্যবসায়ের সঙ্গে কবির গদ্যপদ্য প'ড়ে দেখেন, ভুল অবশ্যই ভাঙবে। কবি তাঁর শেষ আত্মপরিচয় দিয়ে গেছেন 'পত্রপুট' কাব্যের পনেরো সংখ্যক কবিতায়। এতে তিনি নিজকে শ্রেণীসংস্কারহীন সাম্প্রদায়িকতাহীন বাউলদের একজন ব'লেই পরিচিত করেছেন। "ওরা অন্ত্যজ, ওরা মন্ত্রবর্জিত। কবি আমি ওদের দলে···আমি ব্রাত্য, আমি জাতিহারা।"—প্রভৃতি পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে।

'পথ-পরিচায়ক জয় হে'

রবীন্দ্র-চিন্তা এবং রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যিক জীবন-সমীক্ষা যে কার্যকরভাবে শোষিত মানুষের শোষণমুক্তির সহায়ক হতে পারে তার পরিচয় আজকের 'বাঙ্লাদেশ'। ঠিক কোন্ পদ্ধতিতে চললে রাজনীতিক অর্থনীতিক মুক্তি আসতে পারে তার নির্দেশনা ব্যাবহারিক রাজনীতিকদের কাছ থেকে আসে, মনীষী ও কবি সে ক্ষেত্রে উদ্দীপনা উৎসাহ ও প্রেরণা জাগিয়ে চলেন। কর্মীর ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ গ্রামসংগঠনের দিকে লক্ষ্য নির্দেশ করলেও কাব্য-কবিতায় বিপ্লব ও সংগ্রামের পোষকতা করেছেন এ আমরা পূর্বেই ভালোভাবে দেখেছি। রবীন্দ্রনাথের মৃত্তিকা-প্রীতি, পূর্ববঙ্গপ্রীতি, মাতৃভাষানুরাগ এবং মুসলিম-সহানুভূতি পূর্ববঙ্গের আধুনিক শিক্ষিতদের কাছে তাঁকে নিতান্ত প্রিয় ক'রে তুলেছিল। এরই সঙ্গে কার্যক্ষেত্রে অর্থাৎ ভাষা-আন্দোলনে এবং পরিশেষে মুক্তিযুদ্ধে যুক্ত হ'ল তাঁর ভাবোদ্দীপনা, ন্যায়ের জন্য স্বদেশের জন্য মরণপণ সংগ্রামের প্রেরণা। রবীন্দ্রনাথেরই উত্তরাধিকার নিয়ে নজরুল আরও স্পষ্ট ভাষায় শোষিত জনগণকে হাতিয়ার নিয়ে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হওয়ার প্রেরণা দিয়েছিলেন। এল মুক্তি, এখন বাঙ্লাদেশের সংগঠনের পালা। অনিশ্চিত ভবিতব্য নিয়ে দুরন্ত শত্রুর সঙ্গে সেই সংগ্রামের অবস্থায় রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব বিষয়ে নোতুন ক'রে সমীক্ষার প্রয়োজন অনুভূত হয়। সেই অবকাশে যে লেখা অনায়াসে নির্গত হয়েছে তা পূর্বপ্রকাশিত হলেও আংশিকভাবে এখানে গ্রন্থমধ্যে সন্নিবেশিত করা গেল।*

মুষ্টিমেয় ব্যক্তির স্বার্থ স্বল্পমাত্র বিঘ্নিত হওয়ার সম্ভাবনায় সেই স্বার্থের সংরক্ষক রাষ্ট্র কী ভয়ংকর অমানবিক হতে পারে তার প্রত্যক্ষ পরিচয়ের মধ্যে পর্যাকুল অবস্থায় এই মুহূর্তে আমাদের দিন কাটছে। এরকম তুলনাহীন গণহত্যার উল্লাস দৃষ্টে মারণাস্ত্র-সহায় যে-কোনো রাষ্ট্রব্যবস্থার উপর প্রজাসাধারণের সন্দেহ ঘনীভূত হওয়াও স্বাভাবিক। বিশেষতঃ সাম্রাজ্যিক দুর্বিপাক থেকে সদ্য-মুক্ত মানুষ আত্মশাসনের ক্ষেত্রে যদি তপ্তকটাহ থেকে অগ্নিকুণ্ডে এসে পড়ে তাহলে বুঝতেই হয় যে, রাষ্ট্রিক ব্যবস্থাপনার মূলেই গলদ থেকে গেছে। আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার পাওয়ার পূর্বে আত্মসংগঠন হয়নি। এখন, হয় কায়েমি স্বার্থের কাছে আত্মসমর্পণ ক'রে বংশপরম্পরায় কথঞ্চিৎ জীবদেহ রক্ষা করতে থাকো, নয়, রক্তের মূল্যে পূর্ণ জীবন অর্জন করো।

* এই লেখাটি কিঞ্চিৎ ভিন্ন আকারে এবং ভিন্ন আখ্যায় "রবীন্দ্রনাথ নজরুল ও বাংলাদেশ" সংকলনগ্রন্থে পূর্বেই বেরিয়েছে। কিছু পরিবর্তনসহ লেখাটিকে এখানে সন্নিবেশ করার অনুমতি দেওয়ার জন্য সম্পাদক শ্রীরঘুবীর চক্রবর্তী ও প্রকাশক ওয়ার্লড্ প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড্-এর কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানাই।

অথচ এই সাবধানবাণীই পুনঃপুনঃ উচ্চারণ করেছেন একালের জীবনদ্রষ্টা মহাকবি, যাঁর গদ্য-রচনাবলীর অর্ধেকেরও উপর স্থান দখল ক'রে আছে রাষ্ট্রিক ও সামাজিক চিন্তা, জাতির দুর্দশায় বিলাপ, মোহ-অপসারণের উৎসাহ এবং পথনির্দেশ। তাঁর শতাধিক প্রবন্ধ এবং ভাষণ রাষ্ট্র-সমাজ-চিন্তায় ব্যয়িত হয়েছে, এ ছাড়া চিঠিপত্রে এবং ডায়েরিতে প্রসঙ্গক্রমে দেশের সমস্যা নিয়ে স্বতই তাঁকে নিজ মনোভাব ব্যক্ত করতে হয়েছে বহুবার। এমনকি কাব্য-নাটকেও তিনি কেবল স্বপ্নের মায়া বিস্তার করেননি, জীবনভাবুকতার শীর্ষে উঠে জাতিকে দৃঢ় পদক্ষেপে অগ্রসর হওয়ার এবং দুর্বলতা, কাপুরুষতা ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য প্রস্তুতির আহ্বান জানিয়েছেন। সম্প্রদায়-ভেদ ও জাতিবর্ণ-ভেদ, অশিক্ষাজনিত কুসংস্কার ও সনাতনী প্রথার অন্ধ দাসত্ব, জঘন্য স্বার্থবুদ্ধি ও ঈর্ষা-দলাদলি-চক্রান্তের নীচতা থেকে মুক্তিই রবীন্দ্রনাথের অভিলষিত প্রাথমিক স্বাধীনতা। এই আভ্যন্তরীণ মুক্তি অর্জিত হলে পর দ্বিতীয় পর্যায়ে অর্থনীতিক ও সামাজিক স্বায়ত্তশাসন। গ্রাম-কেন্দ্রিক সংগঠনের মধ্য দিয়ে কার্যকরভাবে এ দু'টিতে এসে পৌঁছালে সাম্রাজ্যবাদী শোষণ এবং শাসন সহজেই স্খলিত হয়ে পড়বে এই ছিল তাঁর সুচিন্তিত অভিমত।

রাষ্ট্রনীতি বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের আদ্যন্ত সুসমঞ্জস পূর্ণাঙ্গ চিন্তাধারা নেই, এমন মন্তব্য কেবল অসংগতই নয়, নিষ্প্রয়োজনও। কারণ, যিনি মুখ্যভাবে সাহিত্যিক তাঁর কাছে নিয়মানুগ রাষ্ট্রতত্ত্ব সমাজতত্ত্ব প্রত্যাশা করা যায় না। কিন্তু কল্পনাশীল কবি হলেও জীবনের কবি হিসেবেই তিনি আমাদের সবিশেষ প্রিয়, আর জীবনদর্শনের সঙ্গে সমাজদর্শন অভিন্ন। রাজনীতি-চর্চা তাঁর লেখায় ধারাবাহিক বিশ্লেষণে তেমন ছড়িয়ে নেই, যেমন আছে সামগ্রিকভাবে। অথচ প্রয়োজনীয় কোন্ বিষয়েই না তিনি কথা বলেছেন? শিক্ষা, সামাজিক প্রথা, বর্ণ-বৈষম্য, হিন্দু-মুসলমান, ইংরেজের শাসননীতি, প্রথম পর্যায়ের স্বদেশী, গান্ধীজীর আন্দোলন, গুপ্ত স্বদেশী, কৃষি ও কৃষক-সংগঠন, জমিদারি, সমবায়—প্রায় সব ব্যাপারেই। আর এগুলির মধ্যে তাঁর চিন্তা বহুধা বিভক্ত এবং স্ববিরোধী হয়েছে এমন ধারণাও ঠিক নয়, যেমন ঠিক নয় তাঁর স্বাদেশিক চিন্তা ভাবাকুল বিশ্বপ্রেমে অথবা উপনিষদীয় ভগবৎধারণায় সমাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে এমন বোধ। তাঁর ভাষায় কাব্যগুণ আলংকারিকতা স্বাভাবিক ব'লে এবং আত্মপক্ষ সমর্থনে মনোমত ব্যাখ্যার দ্বারা তিনি উপনিষদের কিছু মন্ত্র গ্রহণ করেছেন ব'লে তিনি আদর্শ ও উপনিষদের ভূমার দ্বারা পরিচালিত হয়েছেন এমন অনুভব অসম্যক্ দৃষ্টির পরিচায়ক। তবে একথা ঠিক যে কালের গতিতে এবং স্বাদেশিক বৈদেশিক ঘটনার ভূমিকায় তাঁর ধারণার অল্পস্বল্প পার্থক্য ঘটেছে। এসব মিলিয়ে এবং তাঁর সহজ মৌল অনুভবকে সামনে রেখে তাঁর দেশ- ও সমাজ-চিন্তার একটা স্পষ্ট

ছবি গড়ে তোলা যায় এবং তা বোধ হয় তাঁর কাব্যিক উপলব্ধির সঙ্গে মিলিয়েও নেওয়া যায় স্বচ্ছন্দে। যে লক্ষণীয় ভাবসূত্র তাঁর সব খণ্ড প্রকাশকে অখণ্ড ক'রে অনুভব করায় তা হ'ল এই যে তিনি চিরনূতনের উপাসক, অমানবিক পুরাতনের প্রবল প্রতিবাদী। কাব্যজীবনের প্রথমের দিকে রোম্যান্টিক্ কবিকল্পনায় তিনি প্রাচীন ভারতকে চিত্তাকর্ষকরূপে অনুভব করেছেন। কিন্তু একালের দেশ ও সমাজের জড়ত্ব যখনই তাঁর কাব্যভাবনাকে অধিকার করছে তখন থেকে তিনি পুরানো পথ পুরানো সংস্কার সর্বতোভাবে বর্জন করারই নির্দেশ দিয়েছেন। এটাই স্বাভাবিক, কালবাহিত ভাবনা ও ধারণা বহন ক'রে রবীন্দ্রনাথ একালকার আমাদের মুগ্ধ করেননি। তিনি যদি নোতুনের দিশারী ও জীবন-সংলগ্ন না হন তাহলে তিনি কিছুই না। বলা বাহুল্য, তাত্ত্বিকতা এবং প্রাচীন-পক্ষপাতিত্বের প্রতিবাদ কবি নিজেই করেছেন বহুবার, মৌলিক লেখার মধ্যে তো বটেই, চিঠিপত্রে এবং ভাষণেও। হয়তো ভুল বুঝেছি, হয়ত-বা ইচ্ছে ক'রেই ঠিক বুঝতে চাইনি।

রাষ্ট্র বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের চিন্তা ছড়িয়ে রয়েছে 'রাজা-প্রজা' 'সমূহ' 'স্বদেশ' 'কালান্তরে'র প্রবন্ধাবলীতে। এ সবের মধ্যে তিনি বাস্তব দিক থেকেই রাষ্ট্রস্বরূপ বিবেচনা করেছেন, কাল্পনিক কথা সৃজন করেননি। বিদেশীকে অপসারিত ক'রে স্বদেশে আত্মকর্তৃত্ব ও রাষ্ট্রগঠন তিনি চান নি একথা ঠিক নয়, কিন্তু ঐ পশ্চিমা যান্ত্রিক আদর্শের বা পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী আদর্শের রাষ্ট্র নয়। তিনি পৃথিবীর এই পূর্বদিগন্তের মানুষের ইতিহাস অধ্যয়ন ক'রে দেখেছেন যে সমাজশক্তিই এ অঞ্চলের কর্তৃশক্তি, রাষ্ট্র চিরকাল ঐ সমাজেরই অধীন। সুতরাং এদেশের রাষ্ট্র সমাজ-সামঞ্জস্যের রাষ্ট্র হবে, আজকের ভাষায় প্রায় সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র।

বাঙলাদেশের মারণযজ্ঞের পটভূমিতে রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রচেতনার বিষয় স্মরণ করা যাক এবং কাব্যকল্পনারই কথা ধরা যাক। বহুপরিচিত তাঁর একটি গান হ'ল—

আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে,
নইলে মোদের রাজার সনে মিলব কী স্বত্বে।
আমরা যা খুশি তাই করি
তবু তাঁর খুশিতেই চরি,
আমরা নই বাঁধা নই দাসের রাজার ত্রাসের দাসত্বে।....

'রাজা' নাটকের রাজা-প্রজা সম্পর্কের গান। রাজা সাংকেতিক নাটক, হয়ত বা আধ্যাত্মিকও, কিন্তু রবীন্দ্র-অধ্যাত্ম মানুষ ও নিসর্গের বাইরের কোনো তুরীয় ব্যাপার নয়। তা ছাড়া বাস্তবের রেখাচিত্র অনুসরণ না ক'রে, বর্ণিত বিষয়কে প্রতীতিসিদ্ধ না ক'রে সার্থক কল্পনা ও সংকেতসৃষ্টিও সম্ভব নয়। সুতরাং কবির রাষ্ট্রিকতা-বোধ

গানটির নির্মাণমূলে কাজ করেছে। প্রজারা এতে স্বাধিকারেব আনন্দ ব্যক্ত করছে, যদিও এ আনন্দ নৈরাজ্যেব নয়, রাজাকে অর্থাৎ রাষ্ট্রকে স্বীকার কবেই এ আনন্দ। রাষ্ট্র আছে, তার দাসত্ববোধ নেই এজন্য যে, মুষ্টিমেয়ের স্বার্থের রক্ষক এ ধরনেব রাষ্ট্র নয়। শাসনদণ্ডের চালনার প্রয়োজনই হয় না যদি প্রজাব ইচ্ছা ও রাষ্ট্রের কর্তব্য এক হয়ে পড়ে। প্রজার স্বতঃস্ফূর্ত সামাজিক কর্মবন্ধনেব যোগসূত্রমাত্র সেই রাষ্ট্র যদি হয়, নিঃশেষ প্রজাকল্যাণ ছাড়া অন্য কোনো স্বার্থে যদি বাষ্ট্র নিহিত না থাকে তাহলে সন্ত্রাস এবং শাসনের কীই বা প্রয়োজন। এ এমন এক স্বেচ্ছাবন্ধন যাব মধ্যে নিয়ম-কানুন এবং স্বাধীনতা একার্থবাচক। বলা বাহুল্য, মানুষেব উন্নত সমাজবোধই এবকম 'থেকেও নেই' রাষ্ট্রেব অভ্যুদয় সম্ভব কবতে পাবে। 'দাসের বাজা' বলতে, যে-রাষ্ট্রযন্ত্রেব কর্মচাবীরা সম্প্রদাযবিশেষেব ইচ্ছানুবর্তী হয এমন বাষ্ট্র। 'বাজা' নাটক লেখা হয ১৯১০ খ্রীস্টাব্দে, যতদূব মনে পড়ছে কবি তখন শিলাইদহে, প্রত্যক্ষ জমিদাব-প্রজা সম্বন্ধেব মধ্যবর্তী হযে। এব পূর্বে ববীন্দ্রনাথ সাম্রাজ্যবাদেব স্বরূপ ভালোভাবেই অধ্যযন কবেছেন, ইংবেজ-ভাবতবাসী সম্পর্ক নিযে লিখেছেনও বেশ কিছু, এবং কেবল স্বদেশেব শোষণ-শাসন নিযেই নয, চীন-আফ্রিকা-অস্ট্রেলিযাব পুঁজি-উপনিবেশ স্বার্থেব নিতান্ত নগ্ন প্রকাশ নিযেও। তা ছাড়া কিছু পূর্বে বঙ্গবিভাগেব ফলে যে প্রবল স্বাদেশিক আন্দোলন প্রারব্ধ হয তাব সঙ্গে প্রত্যক্ষে এবং পবোক্ষে জড়িযেও পড়েছিলেন কবি। তাঁব রাষ্ট্রিক ও মানবিক চৈতন্য এই ঘটনাতেই পূর্ণভাবে উদ্বুদ্ধ হয়, আর সেই উদ্বোধনেব ফলেই নোতুন এবং মৌলিক সমাজনীতি-চিন্তার দ্বারও তাঁর কাছে খুলে যায়।

এই চিন্তাব প্রকাশ তাঁর 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধ, প্রকৃত বঙ্গবিচ্ছেদেব প্রায এক বছব আগে লেখা। এই ভাষণেব মূল কথা হ'ল গ্রামকেন্দ্রিক নব্যবীতিব সমাজশাসন-ব্যবস্থার সংগঠন, পূর্ণ স্ববাজেব পূর্ববর্তী সমাজতান্ত্রিক আত্মশাসন শিক্ষা, সংক্ষিপ্ত বাক্যে —গঠনমূলক স্বদেশী, যা তখনকাব সোচ্চাবকণ্ঠ অথচ ইংবেজকৃপাভিক্ষু নব্যশিক্ষিত স্বাদেশিকদের চিন্তা.ও উদ্‌যোগেব ত্রিসীমায ছিল না। কিন্তু পবেও কি সত্যকাব কোনো সংগঠনপ্রয়াস হয়েছে? নবম এবং চবম, অসহযোগ এবং সহযোগ, কাউন্সিল প্রবেশ এবং অপ্রবেশ, গ্রহণ এবং বর্জন, ডোমিনিয়ন এবং স্ববাজ, অনশন এবং অনশন-প্রত্যাহাবেব বিষম আবর্তে অর্ধশতাব্দী ঘুবপাক খেযে এপাশ-ওপাশ কবতে কবতে যাত্রী-বোঝাই নৌকা সেই আঘাটাতেই এসে ভিড়ল যেখানে কোনক্রমে হালে পানি পাওয়া গেলেও প্রাণ বাঁচানো দায় হয়ে উঠল। দেশগঠনের প্রয়োজন ছিল পূর্বাহ্ণেই, তা হয়নি। রবীন্দ্রনাথ ঠিকই বুঝেছিলেন—'বড়ো দুঃখেব মধ্য দিযেই সকল দেশ সার্থকতায় পৌঁছেচে।' তিনি জানতেন ইংরেজদের ফেলে-যাওয়া এই শ্মশানে

শবলুব্ধের মেলা বসবে, তারপব সুকঠিন চিতাগ্নি-পবীক্ষার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হলে ও যথার্থ চৈতন্যেব আবির্ভাব ঘটলে তবেই মুক্তি মিলবে, মানুষ মানুষের অধিকার ফিবে পাবে। ববীন্দ্রনাথ আশাবাদী বলেই জটিল দুর্বিপাকেব মধ্য দিয়েও মানুষেব বাস্তব মুক্তিব ছবি দেখেছেন। কী হযনি এবং কী হতে পাবত একথা ভেবে আজ হয়ত লাভ নেই, তবু ববীন্দ্রনাথের সমাজচিন্তাব মধ্যে এমন কিছু সাধাবণ সত্য থেকে গেছে, যাব অনুসবণে ব্যাপক সর্বনাশেব মধ্যেও পথেব সন্ধান হযত-বা পাওয়া যায়।

রাষ্ট্র বলতে ববীন্দ্রনাথ প্রকৃষ্ট সমাজবন্ধনের স্বরূপকেই বুঝেছেন এবং তাকে গ্রাম-কেন্দ্রিক কবতে চেযেছিলেন এই অর্থে যে, গ্রামীণ মানুষেব সংখ্যা তখনকাব ভাবতে শতকবা নব্বই, এবং জীবিকা হিসেবে কৃষি ও কৃষকেবই প্রাধান্য। দেখতে হবে তখন কল-কাবখানা এবং শ্রমিক-জীবন-সমস্যা উল্লেখযোগ্য মূর্তি নিযে দেখা দেয নি। পবে যখন তা হযেছে তখন সর্বাগ্রে ববীন্দ্রনাথই তাব স্বরূপ উদ্‌ঘাটন কবেছেন। যাই হোক, জীবনেব কৃষিকেন্দ্রিকতা ছাডা সুচিবাগত এক ধবনেব সমাজ-সহযোগিতাও আমাদেব দেশে ছিল, যাব জন্য গ্রামকেন্দ্রিক আত্মশাসনকেই তিনি দেশগঠনেব ভূমিকা হিসেবে দেখেছিলেন। আশ্চর্যেব বিষয এই যে, তাঁব পবিকল্পিত সমাজ-কর্মিসভার সংবিধানও তিনি বচনা কবেছিলেন এবং আধুনিক বাষ্ট্রেব যা যা কবণীয—শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খাদ্য, অর্থভাণ্ডাব, ব্যবসা-বাণিজ্য, জীবিকাব সংস্থান, বিচাব-ব্যবস্থা, আমোদ-প্রমোদ পর্যন্ত প্রায সবই এই স্বাযত্তশাসনেব অন্তর্গত কবতে চেযেছিলেন। অবশ্য, বৈদেশিক শাসনেব অন্তর্বর্তী অবস্থায এবকম প্রায পূর্ণস্ববাজ সম্ভবপব ছিল কি না সে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। প্রশ্ন হতে পাবে, না-হয সবকাবি স্কুলে হাসপাতালে কোর্ট-কাছাবিতে না-ই গেলাম, মাতৃভাষাতেই আমাদেব শিক্ষা না-হয হ'ল, কিন্তু সবকাব-নির্দিষ্ট প্রত্যক্ষ এবং প'বোক্ষ কব দেব কিনা, নির্ধাবিত মুদ্রামান অগ্রাহ্য কবা কতদূব চলবে, সবকাবি চাকবি গ্রহণ কবব কি না, কলকাবখানা স্থাপনে বিদেশীব দ্বাবস্থ হব কি না, দ্বৈতশাসনেব জটিলতা অতিক্রম কবা কতদূব সাধ্যাযত্ত হবে, জমিদারি ব্যবস্থাব কী গতি হবে, ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিকানাব উপব সমাজ-নিযন্ত্রণ কী ভাবে প্রযোগ কবা হবে—এই সব সম্ভাব্য সমস্যাব ফাঁক এই পবিকল্পনায থেকেই গিযেছে, তা ছাড়া এবকম উদ্‌যোগে সাম্রাজ্যবাদীব সদিচ্ছাব উপবেও হযত অলিখিতভাবে নির্ভব কবা হয়েছে এবং সর্বোপবি নানা বর্ণে সম্প্রদায়ে বিভক্ত ও স্বভাব-স্বার্থসন্ধানী এই জাতটার উপবেও রবীন্দ্রনাথ বেশ কিছু প্রাথমিক প্রত্যাশা ন্যস্ত কবেছেন, অর্থাৎ তাঁব পবি-কল্পনাব মধ্যে বেশ খানিকটা ফাঁক থেকে গেছে, তবু বলা যায যে, বঙ্গভঙ্গের ভাব-মুহূর্তে বৈদেশিক বাষ্ট্রনীতিব সঙ্গে আপোষহীন এ ধরনের সমাজনির্ভব সংগ্রামপদ্ধতি স্বাধীনতার পববর্তী দেশগঠনে প্রবলভাবে সহায়ক হ'ত নিঃসন্দেহে। হিন্দু-মুসলিম

ঐক্য হয়ত এই পথেই সহজে সম্ভব হ'ত, উচ্চবর্ণ-নিম্নবর্ণের এবং নবশিক্ষিত চাকুরিসহায় বাবু ভদ্রলোকদের সঙ্গে অশিক্ষিত কৃষক ও মেহনতী মানুষের দুই-মেরু ব্যবধান ক্ষীণ হয়ে পড়ত। এরকম সামাজিক রাষ্ট্রগঠনের মৌলিক কার্যকারিতা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্বদেশচিন্তার শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত নিঃসংশয় ছিলেন এবং বিষয়টির অকুণ্ঠ পুনরাবৃত্তি করেছেন বহু প্রবন্ধে ও ভাষণে। আত্মশক্তি, ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ, অবস্থা ও ব্যবস্থা, পাবনা সম্মিলনীতে ভাষণ, ব্যাধি ও প্রতিকার, সদুপায়, সমবায় প্রভৃতি স্বদেশী আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ের সমকালীন রচনা থেকে আরম্ভ ক'রে ১৯৩৩-৩৪ সালে প্রদত্ত ময়মনসিংহের জনসভায় ও শ্রীনিকেতনে প্রদত্ত ভাষণাবলী পর্যন্ত কবির বক্তব্যের এই একই সুর। তাঁর এই কার্যকরী স্বাদেশিকতার ধার দিয়েও যে সেকালের রাজনীতিকেরা গেলেন না তাই নিয়ে তাঁকে বহুবার খেদোক্তি করতেও শোনা যায়, যেমন—"আমার মতো লোকের মুখে কোনো প্রস্তাব শুনিলেই সেটাকে নিরতিশয় ভাবুকতা বলিয়া শ্রোতারা সন্দেহ করিতে পারেন" (ধর্মশিক্ষা—শিক্ষা), অথবা "আমি অনেকবার বলেছি, কবি ব'লে আমার কথা শোনে নাই"

(ম্যালেরিয়া—পল্লীপ্রকৃতি)।

হিন্দু-মুসলিম বিরোধ যা আমাদের স্বাদেশিক আন্দোলনের অসাফল্যের মুখ্য কারণ তার সমাধান রবীন্দ্রনাথ সামাজিক মিলনের মধ্যে দেখেছিলেন। বাঙলায় প্রথম স্বদেশী আন্দোলনের অভিঘাতে ইং১৯০৭ সালে প্রথম হিন্দু-মুসলিম বিরোধে কবির দৃষ্টি খুলে গেল, মনোযোগ নিহিত হ'ল দেশের এই মৌলিক সমস্যাটিতে। এ নিয়ে তাঁর লেখা কবিতা 'সুপ্রভাত'-এর বিষয় পূর্বেই বলেছি। এরই সমকালে লিখিত প্রবন্ধ হ'ল 'ব্যাধি ও প্রতিকার'—এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে তাঁর প্রথম অধ্যয়ন। এতে তিনি হিন্দু-মুসলিম বিরোধের আসল কারণটি কোথায় তা বিশ্লেষণ করেছেন এবং এই সুচিন্তিত অভিমত প্রকাশ করেছেন যে এ বিচ্ছেদ হ'ল জাতীয় পাপ এবং এই পাপের নিরাকরণ না ক'রে জাতীয় আন্দোলনে কোনো সুফল পাওয়া যাবে না। এই কথাই পরে তিনি বারংবার বলেছেন রাজা-প্রজা, সমূহ, কালান্তর, শিক্ষা প্রভৃতি পুস্তকে গ্রথিত বহু প্রবন্ধে ও ভাষণে। হিন্দুরা আচারের গোঁড়ামি ত্যাগ ক'রে মুসলমানকে সামাজিকভাবে অন্তরে গ্রহণ করলে এবং মুসলমানেরা ধর্মের গোঁড়ামি ত্যাগ করলে মিলন সম্ভব হবে, কিন্তু গোঁড়ামি দূর হওয়ার জন্য ব্যাপক জনশিক্ষা চাই, সেই জনশিক্ষার ব্যবস্থা আমাদের নিজেদেরই করতে হবে, এই তাঁর সিদ্ধান্ত। এ-বিষয়ে কবিচিত্তের ঐ প্রাথমিক প্রতিঘাতের স্বরূপ দেখা যাক।

"আজ আমরা সকলেই এই কথা বলিয়া আক্ষেপ করিতেছি যে, ইংরেজ মুসলমানদিগকে গোপনে হিন্দুর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া দিতেছে। কথাটা

যদি সত্যই হয় তবে ইংরেজের বিরুদ্ধে রাগ করিব কেন। দেশের মধ্যে যতগুলি সুযোগ আছে ইংরেজ তাহা নিজের দিকে টানিবে না, ইংরেজকে আমরা এতবড়ো নির্বোধ বলিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিব এমন কী কারণ ঘটিয়াছে।

মুসলমানকে যে হিন্দুর বিরুদ্ধে লাগানো যাইতে পারে এই তথ্যটাই ভাবিয়া দেখিবার বিষয়, কে লাগাইল সেটা তত গুরুতর বিষয় নয়। শনি তো ছিদ্র না পাইলে প্রবেশ করিতে পারে না, অতএব শনির চেয়ে ছিদ্র সম্বন্ধেই সাবধান হইতে হইবে। আমাদের মধ্যে যেখানে পাপ আছে শত্রু সেখানে জোর করিবেই··অতএব শত্রুকে দোষ না দিয়া পাপকেই ধিক্কার দিতে হইবে।

হিন্দু-মুসলমানের সম্বন্ধ লইয়া আমাদের দেশের মধ্যে একটা পাপ আছে; এ পাপ অনেকদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে। ইহার যা ফল তাহা না ভোগ করিয়া আমাদের কোনোমতেই নিষ্কৃতি নাই।

অভ্যস্ত পাপের সম্বন্ধে আমাদের চৈতন্য থাকে না। এইজন্য সেই শয়তান যখন উগ্রমূর্তি ধরিয়া উঠে তখন সেটাকে মঙ্গল বলিয়াই জানিতে হইবে। হিন্দু-মুসলমানের মাঝখানটাতে কতবড়ো যে একটা কলুষ আছে এবার তাহা যদি এমন একান্ত বীভৎস আকারে দেখা না দিত তবে ইহাকে আমরা স্বীকারই করিতাম না, ইহার পরিচয়ই পাইতাম না।

পরিচয় তো পাইলাম, কিন্তু শিক্ষা পাইবার কোনো চেষ্টা করিতেছি না। যাহা আমরা কোনোমতেই দেখিতে চাই নাই বিধাতা দয়া করিয়া আমাদিগকে কানে ধরিয়া দেখাইয়া দিলেন, তাহাতে আমাদের কর্ণমূল আরক্ত হইয়া উঠিল, অপমান ও দুঃখের একশেষ হইল—কিন্তু দুঃখের সঙ্গে শিক্ষা যদি না হয় তবে দুঃখের মাত্রা কেবল বাড়িতেই থাকিবে।

আর মিথ্যা কথা বলিবার কোনো প্রয়োজন নাই। এবার আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে হিন্দু-মুসলমানের মাঝখানে একটা বিরোধ আছে। আমরা যে কেবল স্বতন্ত্র তাহা নয়। আমরা বিরুদ্ধ।

আমরা বহুশত বৎসর পাশে পাশে থাকিয়া এক খেতের ফল, এক নদীর জল, এক সূর্যের আলোক ভোগ করিয়া আসিয়াছি, আমরা এক ভাষায় কথা কই, আমরা একই সুখ-দুঃখে মানুষ, তবু প্রতিবেশীর সঙ্গে প্রতিবেশীর যে সম্বন্ধ মনুষ্যোচিত, যাহা ধর্মবিহিত তাহা আমাদের মধ্যে হয় নাই। আমাদের মধ্যে সুদীর্ঘকাল ধরিয়া এমন-একটি পাপ আমরা পোষণ

করিয়াছি যে, একত্র মিলিয়াও আমরা বিচ্ছেদকে ঠেকাইতে পারি নাই। এ পাপকে ঈশ্বর কোনোমতেই ক্ষমা করিতে পারেন না।"

('ব্যাধি ও প্রতিকার'—সমূহ)

ক্ষমা করেনও নাই। কিন্তু মনীষী ও মহাকবির ভূয়োদর্শন, তাঁর সমাজ-অধ্যয়ন-নৈপুণ্যই বিস্ময়কর। কারণ এ হ'ল ১৯০৭ খ্রীস্টাব্দের কথা, তারপর সুদীর্ঘ স্বদেশী-আন্দোলনের প্রায় সব সময়েই এই বিরোধমূলক পশ্চাদ্‌গতি এবং পরিণামে ভারত-বিভাগ। রাজনীতিগত আপোষের ঐক্যকে রবীন্দ্রনাথ বালুকার বন্ধন বলেই মনে করতেন। আমরা মনে করি, সামাজিক মিলন ও 'সামাজিক সমকক্ষতা' বলতে তিনি প্রথমতঃ শিক্ষা-দীক্ষায় পদে-মানে সমতা, দ্বিতীয় পর্যায়ে বিবাহাদি সম্পর্কের দ্বারা গঠিত অচ্ছেদ্য আত্মীয়তাকেই লক্ষ্য করেছেন। যদিও একথা ঠিক যে নিরতিশয় কাম্য হলেও সমাজের পক্ষে অতিদুরূহ এই ব্যাপার নিয়ে চিঠিপত্রে কোথাও কোথাও নিজ মনোভাব ব্যক্ত করা ছাড়া প্রকাশ্যে স্পষ্ট ভাষায় কোনো নির্দেশ তিনি দিতে চাননি। তাঁর ধারণা বোধ হয় এই ছিল যে, সংগঠনমূলক কর্মক্ষেত্রে মিত্রতা ঘটলে এবং অশিক্ষার অন্ধকার দূর হলে হিন্দুপক্ষে আচারপ্রথার দাসত্ব এবং মুসলিম পক্ষে ধর্মের গোঁড়ামি চলে যাবে এবং গভীরতর মিলনের ক্ষেত্র আপনা থেকেই উন্মুক্ত হবে। একবার সংগঠনের পথে চালিত হলে জনস্রোত নিজের পথ নিজেই ঠিক ক'রে নেবে। উচ্চবর্ণ-নিম্নবর্ণের দুস্তর পার্থক্যের বিষয়েও রবীন্দ্রনাথ এইভাবেই আশা পোষণ করতেন। হিন্দু-মুসলমান সমস্যার সমাধান বিষয়ে চিন্তা এবং পথনির্দেশ তাঁর রাজনীতিক প্রবন্ধগুলির বৃহৎ অংশ জুড়ে রয়েছে।

'স্বদেশী সমাজ' ভাষণে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন "যে লোকের ব্যবসা বাঁশি বাজানো, সহসা সর্পাঘাতের উপক্রম হইলে সে বাঁশিকে লাঠির মতো ব্যবহার করিয়া থাকে, আমার যাহা কিছু শক্তি আছে তাহা উদ্যত করিয়া আজ দেশের এই দুর্দিনে আসন্ন অমঙ্গলকে ঠেকাইতে চেষ্টা করিয়াছি···আমি শুধু উদ্দীপনার জন্যই এই প্রবন্ধ পাঠ করি নাই।" এই উক্তির সমর্থন পাওয়া যায় কবিকে কর্মীর ভূমিকায় নামতে দেখে। শিলাইদহে সমবায় প্রথায় চাষে উৎসাহ, পতিসর ও কুষ্টিয়ায় সমবায় ব্যাঙ্ক ও বয়ন বিদ্যালয় প্রভৃতির পরিচালনা, ট্রাক্টর সহযোগে চাষের ব্যবস্থা, বিদ্যালয়-স্থাপন, পঞ্চের মণ্ডলীর দ্বারা গ্রাম-স্বরাজের প্রবর্তন এবং শ্রীনিকেতনে গ্রামসংগঠনের স্থায়ী উদ্‌যোগ এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। এসব বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের নৈষ্ঠিকতা এবং শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীদের অনীহা তুলনা ক'রে দেখার বিষয়। রবীন্দ্রনাথ এরকম স্বায়ত্তশাসনের প্ল্যানে বৈদেশিক শাসনকে কার্যতঃ নিষ্ক্রিয় করেই তুলতে চেয়েছিলেন।

তাঁর দুর্ভাগ্যক্রমেই রবীন্দ্রনাথ জমিদার হয়ে জন্মেছিলেন। তাঁর জমিদারি

জমিদারের বিরুদ্ধ কাজকেই নানাভাবে স্মরণ করিয়ে দেয়। কিন্তু তিনি কাব্যকল্পনার চোখ দিয়ে প্রজাদের দেখেন নি। নায়েব গোমস্তা পুলিসের শোষণ ও অত্যাচার থেকে কৃষক প্রজাদের রক্ষা করেছেন যথাসাধ্য এবং মহাজনদের হাতে দরিদ্র চাষীর জমি বিক্রী না হয়ে যায় সেদিকেও যেটুকু সাধ্য নজর রেখেছেন। এ বিষয়ে প্রমাণ তাঁর অন্তরঙ্গ চিঠিপত্র এবং প্রবন্ধাদিতে বহুবার প্রকাশিত তাঁর কৃষক প্রজার দুর্দশা বর্ণনা ও আত্মকর্মকথা। রায়তদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার তো তাঁর মজ্জাগত সংস্কার ছিল বললেই চলে। রবীন্দ্রনাথ স্থির জানতেন যে "জমির স্বত্ব ন্যায়তঃ জমিদারের নয়, সে চাষীর" এবং জমিদাররাই বিদেশি সরকারের সবচেয়ে বড় আমলা। তবু কেন তিনি জমিদারি উঠিয়ে দেওয়ার সপক্ষে কিছু বলেন নি তার সদুত্তরও দিয়েছেন নানা স্থানে। তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় তিনি বুঝেছিলেন যে তাহলে স্বল্পভূমি দুর্বল রায়তের জমি গ্রাস ক'রে প্রবল রায়ত এবং মহাজন নোতুন জমিদার হয়ে উঠবে এবং এদের অত্যাচারে দরিদ্র প্রজা উৎসাদিত হয়ে যাবে। বস্তুতঃ জমিদারি বিলোপ এবং সেই সঙ্গে রায়তের স্বত্ব সংরক্ষণ ব্যাপক সামাজিক বা রাষ্ট্রিক নীতির অপেক্ষা করে। সে সুযোগ স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পর বর্তমানে এসেছে, বিদেশি শাসনে তা অকল্পনীয় ছিল। রবীন্দ্রনাথের অভিমত অনুসারে কৃষকদের শিক্ষায় ও সম্পদে বলবান্ ক'রে তোলাই জমিদারের লক্ষ্য হওয়া উচিত—"রায়তদিগকে এমনভাবে সবল ও শিক্ষিত করিয়া রাখা উচিত যে, ইচ্ছা করিলেও তাহাদের প্রতি অন্যায় করিবার প্রলোভনমাত্র জমিদারের মনে না উঠিতে পারে।" 'ছিন্নপত্র' প্রভৃতিতে রবীন্দ্রনাথ প্রজাদের উপর অকপটে তাঁর প্রীতির কথা জানিয়েছেন, তাতেও নিশ্চিত বুঝা যায় যে তাঁর প্রজাপ্রীতি নিষ্ক্রিয় সাহিত্যিক ব্যাপার ছিল না। মনে রাখতে হবে, কবির কৃষক-সংগঠনের মনোভাব এদেশে কৃষক-আন্দোলনের বহু আগেকার এবং এদেশের সেরা রাজনীতিক প্রতিষ্ঠান যেখানে কৃষকদের সম্বন্ধে বহুদিন পর্যন্তই নীরব সেখানে স্বকীয় সীমিত উদ্যোগে কৃষকদের দুঃখদুর্দশা এবং অশিক্ষা নিরাকরণের প্রয়াস রবীন্দ্রনাথেরই।

বস্তুতঃ এসব বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ একটি সামগ্রিক ধারণার অধীন ছিলেন, তা ভাববাষ্প-বিমলিন ছিল না এবং উদারতা ও সক্রিয় বাস্তবতার সম্মিলনে তা একান্ত-ভাবে মৌলিক ছিল। এমন কি শান্তিনিকেতনে বৃক্ষরোপণ এবং শ্রীনিকেতনে হলকর্ষণ উৎসবও তাঁর ঐ সামগ্রিকতারই অঙ্গীভূত ছিল। দেশগঠনের পরিকল্পনায় রক্ষণশীল কোনো সংস্কার তাঁকে পশ্চাদ্‌গতি করতে পারেনি। কৃষিতে যন্ত্রের ব্যবহার ও যন্ত্র-চালিত কলকারখানার সম্প্রসারণে মানুষের লক্ষ্মীলাভ বিষয়ে তাঁর প্রগতিশীল ধারণা তিনি বহুবার ব্যক্ত করেছেন। তাঁর আপত্তি ছিল যান্ত্রিক উৎপাদনের মুনাফালোভী মালিকানায়। স্বদেশী সমাজের পরিকল্পনায় ধনী জমিদার ও মহাজনদের স্থিতির

বিপক্ষে রবীন্দ্রনাথ যান নি সত্য, কিন্তু তাদের ধনাধিকারকে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের অধীন ক'রে দেখেছেন। পরবর্তীকালে গান্ধীজী যে অছিবাদের কথা বলেছেন তা থেকেও এই সামাজিক নিয়ন্ত্রণ অধিকতর কার্যকর ব'লে আমাদের কাছে মনে হয়েছে। রাশিয়া ভ্রমণে রবীন্দ্রনাথ দেখেছিলেন যে তিনি তাঁর সীমিত উদ্‌যোগে যা-যা করতে চেয়েছিলেন সেখানে তারই দেশব্যাপী তোড়জোড়। 'প্রতিদিনই আমি ভারতবর্ষের সঙ্গে এখানকার তুলনা ক'রে দেখি আর ভাবি কী হয়েছে আর কী হতে পারত।' আর, সকল প্রয়াসের সব উদ্‌যোগের যে-সারতত্ত্বকে এখানে স্বীকৃত দেখে তিনি নিজ উদ্‌যোগকেও যথার্থ বলে মনে করলেন, তা হ'ল শিক্ষা—প্রকৃত শিক্ষা ও জনশিক্ষা। ভারতের অশিক্ষার দুর্গতিকে মানুষের স্বাধিকার লাভের প্রবলতম বাধা ব'লে অনুভব ক'রে স্বদেশী সমাজ সংগঠনে শিক্ষার উপরেই তিনি প্রধান গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

দেশগঠন বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ যে সামগ্রিক ধারণার অধিকারী ছিলেন তাতে কোথাও গুরুতর স্ববিরোধ ছিল এমন আমরা মনে করি না। এমন কি তাঁর মনন এবং কবি-কল্পনার মধ্যেও স্বভাবের বিপর্যয় অনুভব করা যায় না এবং এইটি দেখানোও আমাদের বর্তমান সমীক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য। যদিও একথা ঠিক যে কালক্রমে নূতনতর অভিজ্ঞতার স্পর্শে তাঁর পূর্ব পূর্ব ধারণার বিকাশ ও বিস্তার ঘটেছে। মৌলিক এবং সামগ্রিক ভাবনার অনুবর্তী ছিলেন ব'লেই প্রথম দিককার রাজনীতিক আন্দোলনের বয়কট প্রভৃতির সঙ্গে তাঁর মেলেনি। নতুবা ঐ সময়ে তিনি শ্রীঅরবিন্দের বিপ্লবী আদর্শকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছিলেন। জীর্ণ প্রথা এবং সংস্কারের শোষণরজ্জুতে আবদ্ধ, অনৈক্য অসাম্য এবং স্বার্থকলুষিত বিভেদে বহুচ্ছিদ্র অবস্থার সাময়িক তালিমারা রাজনীতিতে রবীন্দ্রনাথ অনাগ্রহী ছিলেন, এজন্য যখন গান্ধীজী নূতন সজ্জায় রণক্ষেত্রে এলেন তখনও বয়কট এবং চরকা-খদ্দর-অনশনের সঙ্গে কবি নিজেকে মেলাতে পারলেন না। গান্ধীজীর সত্যাগ্রহী ব্যক্তিত্বের উপর কবির যথেষ্ট শ্রদ্ধা ছিল, অসহযোগকে জনজাগরণের মূল্যে সারার্থে স্বীকারযোগ্য ব'লেও তিনি মনে করেছিলেন, কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী সরকার নিজের পছন্দমত এক এক দফা বহীন ফানুস ছাড়বেন, আর তাই নিয়ে ছেলেমানুষি কাড়াকাড়ি দলাদলি উত্তেজনা আরম্ভ হবে এ তিনি সহ্য করেন নি, প্রতিবাদ করেছেন। গণ-অধিকারের প্রবল পক্ষপাতী ছিলেন ব'লেই কংগ্রেস আন্দোলনের প্রায় শেষ পর্যায়ে স্বেচ্ছাতন্ত্র এবং একনায়কতন্ত্রেরও প্রতিবাদ করেছেন। তাঁর অধ্যয়নে, দেশের হিন্দু-মুসলমান অশিক্ষিত শোষিত নিম্নস্তরের মানুষ শিক্ষিত হয়ে স্বাধিকার বুঝে না নিলে তাদের স্বাধীনতা কোনো কালেই হবে না, ইংরেজ চলে গেলে এদেশেরই মুষ্টিমেয় শ্রেণীস্বার্থরক্ষকদের হাতে পড়ে সেই নিগ্রহ ভোগ করতে থাকবে ('কালান্তর' দ্রঃ)। রাজনীতি আখ্যার দলস্বার্থনীতি

এবং কৌশলজাল বিস্তারকে তিনি ঘৃণাই করেছেন এবং দেশেব মৌল সমস্যাগুলিব সঙ্গে বাজনীতিক আন্দোলনেব তেমন যোগ নেই ব'লে একে যথাসম্ভব পবিহাবই কবেছেন, সুতবাং শান্তিনিকেতনে এই ধরনেব সাময়িক উত্তেজনা প্রবেশ না কবে সে বিষয়ে সতর্কও হয়েছেন। অসহযোগ আন্দোলনকে কখনো কখনো এবং হরিজন আন্দোলনকে পুবোপুরি সমর্থন, অথচ গান্ধীজীব চবকা-খদ্দব-অনশনেব অসমর্থন থেকে মনে হয়, রবীন্দ্রনাথ সংগ্রামেব কঠোবতার পক্ষপাতী ছিলেন, কিন্তু অভ্যাসজাত সংস্কাব, নির্বিচাব প্রথানুসবণ, প্রাচীনধর্মিতা এবং গুরুবাদেব পবম বিবোধী ছিলেন ব'লেই এগুলি মেনে নিতে পাবেন নি। গুপ্ত স্বদেশী আন্দোলন বিষযে ববীন্দ্রনাথেব বিরূপ মনোভাব ছিল ব'লে তিনি সমালোচিত হযেছেন। ববীন্দ্রনাথেব অসমর্থনেব পিছনে এই যুক্তি ছিল যে নিবস্ত্র দেশে এ ধবণেব বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত প্রযাস অসার্থক হবে, এ বীবত্বের আত্মঘাত। তাঁব 'প্রশ্ন' কবিতাব 'কী যন্ত্রণায় মবিছে পাথবে নিষ্ফল মাথা কুটে' পঙ্‌ক্তিতে এ বিষযে তাঁব সহানুভূতি অথচ অসমর্থন দুই-ই প্রকাশিত হযেছে। প্রবন্ধেব কযেকটি স্থানেও তিনি গুপ্ত স্বাদেশিকতাব সংগ্রামী বীবত্ব এবং দুঃখববণেব দিকটিকে সকরুণ উদাব দৃষ্টিতে দেখেছেন, যেমন—'অসহিষ্ণু তারুণ্যেব হৃদযবিদাবক প্রমাদ' 'সাংঘাতিক ব্যর্থতাব মধ্যে বীবহৃদযেব মহিমা' 'হৃদযাবেগকে একমাত্র সম্বল কবিযা তাহারা দুর্গম পথে বাহিব হইযা পডিয়াছে' প্রভৃতি মন্তব্য। তবু 'ঘবে-বাইবে' এবং 'চাব-অধ্যায' উপন্যাসে গুপ্ত বিপ্লবীব চবিত্রাঙ্কনেব সমর্থন যথার্থ ই কঠিন হযে পডে। এমন অবশ্য হতে পাবে দু'একটি বিশেষ ক্ষেত্রে যে দুর্বলতাব চিহ্ন ছিল, তা-ই উপন্যাসেব কাজে লাগাতে চেয়েছেন, হযত বা তিনি ভুল খবব পেযেছিলেন, হয়ত তিনি কোথাও কোথাও বাজনীতিক চবিত্রে যে আন্তবিকতাব অভাব দেখেছিলেন তাব প্রভাব এতেও পডেছে।

ববীন্দ্রনাথেব বিপ্লবী মনোভাবেব উৎকৃষ্ট এবং যথার্থ বাহন তাঁব কাব্য-কবিতা ও নাটক। সেখানে উচ্চকল্পনাবলে সমগ্রদৃষ্টিতে তিনি ইতিহাস ও জীবনকে দেখেছেন এবং পুবাতনকে সবলে দূবে নিক্ষেপ ক'বে নোতুন জীবনেব জন্য সংগ্রাম ও মৃত্যুকে বরণ করতে আহ্বান জানিযেছেন। এই ববীন্দ্রনাথই আমাদেব বিস্মষ এবং পুনঃপুনঃ নমস্য। কাব্যে-কবিতায় বৈপ্লবিক জাগবণ যে-ভাবে নির্দেশ কবেছেন, গদ্যে প্রবন্ধে তা বলেন নি এমন নয, তবে অত সুনিশ্চিত এবং ব্যাপকভাবে হযত নয। এ স্বাভাবিক, কাবণ, রাজনীতিক প্রবন্ধে এবং অর্থপ্রধান যুক্তিমূলক বাগ্‌বিন্যাসে সশস্ত্র বিপ্লবকে পবিস্ফুটভাবে সমর্থন জানানো তাঁব পক্ষে সম্ভব ছিল না। আবাব দেখা যায়, ভ্রাতুষ্পুত্র সুরেন্দ্রনাথ এবং তাঁর পবিবারগত আবও দু-একজন যাঁবা সশস্ত্র বিপ্লবের পক্ষে ছিলেন, অথবা শ্রীঅরবিন্দ বা নিবেদিতা, কাবো সম্পর্কেই এ বিষযে তিনি কোনো

প্রতিবাদ তো করেনই নাই, বরং সকলকে বহুমান করেছেন। অন্তত চল্লিশ বছব ধরে ববীন্দ্রনাথ এদেশে মানুষে-মানুষে যে অসাম্য দেখে এসেছেন ১৯৩৪এ তারই ধনতন্ত্রগত মূর্তি উপলব্ধি ক'বে স্বার্থবাদীদেব তিনি সাবধান ক'বে দিয়েছেন—"এই আসন্ন বিপ্লবেব আশঙ্কাব মধ্যে আজ বিশেষ ক'বে মনে বাখবার দিন এসেছে যে, যাবা বিশিষ্ট সাধাবণ ব'লে গর্ব কবে তাবা সর্বসাধাবণকে যে-পবিমাণে বঞ্চিত করে তাব চেয়ে অধিক পবিমাণে নিজেকেই বঞ্চিত কবে, কেন না শুধু কেবল ঋণই যে পুঞ্জীভূত হচ্ছে তা নয, শাস্তিও উঠছে জমে।" ঐ 'দেশেব কাজ' ভাষণেই উচ্চারিত নিম্নলিখিত বক্তব্যটি ক্ষুদে সাম্রাজ্যবাদী পাকিস্তান সম্পর্কে অক্ষবে অক্ষরে ফ'লে গেল দেখছি—"পৃথিবীতে ধন-উৎপাদক এবং অর্থ-সঞ্চয়িতাব মধ্যে সেই সাংঘাতিক বিচ্ছেদ বৃহৎ হযে উঠেছে। তাব একটা সহজ দৃষ্টান্ত ঘবেব কাছেই দেখতে পাব। বাংলাব চাষী পাট উৎপাদন কবতে বক্ত জল কবে যাচ্ছে, অথচ সেই পাটেব অর্থ বাংলাদেশেব নিদাৰুণ অভাব মোচনেব কাজে লাগছে না। এই যে গাযেব জোবে দেনা-পাওনাব স্বাভাবিক পথ বোধ কবা, এই জোব একদিন আপনাকেই আপনি মাববে।" ববীন্দ্রনাথ সামাজিক অসাম্যেব চিব-প্রতিবাদী হ'লেও দেখা যায, রাশিয়া পবিদর্শনেব পব এই অসাম্যকে আব একটু গভীবতব অর্থেই দেখছেন। বাশিযার চিঠিব উপসংহাবেব দিকে বলছেন "এই বহুবিস্তৃত কৃশতাব মধ্যে পৃথিবীব অশান্তি বাসা বাঁধতে পাবে না একথা যাবা বলদর্পে কল্পনা কবে তাবা নিজেব গোঁযাতুর্মিব অন্ধতাব দ্বাবা বিড়ম্বিত। যাবা নিবন্তব দুঃখ পেযে চলেছে সেই হতভাগাবাই দুঃখবিধাতাব প্রেবিত দূতদেব প্রধান সহায, তাদেব উপবাসেব মধ্যে প্রলযেব আগুন সঞ্চিত হচ্ছে।" এতে স্পষ্টভাবেই শ্রেণীস্বার্থমূলক সংঘাতেব আভাস দেওয়া হযেছে। এব পূর্বে যে সব জায়গায সংঘাত ও বিপ্লবেব কথা বলা হযেছে তাতে ধনতান্ত্রিক অসাম্য ছাড়া অন্যবিধ অসাম্য এবং অন্ধতাও স্থান পেযেছে। তবে সাম্রাজ্যবাদী শাসনেব সঙ্গে ধনতান্ত্রিক শোষণেব হবি-হব সম্পর্কেব বিষয তিনি স্বদেশী আন্দোলনেব প্রাবম্ভ থেকেই ধবেছিলেন। পূর্ব-উল্লিখিত 'লড়াইযেব মূল' প্রবন্ধেব আলোচনা স্মবণীয়।

ভাবতবর্ষে বহুকাল-আগত পাকা ক'বে গাঁথা সার্বিক শ্রেণীবৈষম্যেব বিষয়টি ববীন্দ্রনাথ যেমন ক'বে বুঝেছিলেন সেকালে তেমন ক'বে বোঝা এবং তেমন ক'বে বলার আন্তবিক প্রয়াস কোনো বাজনীতিক নেতাব মধ্যেও দেখা যায না। নেহরু এবং সুভাষচন্দ্রেব প্রগতিবাদী মানস-গঠনে ববীন্দ্রনাথেব প্রভাবের সম্ভাব্যতাব বিষযটি ভেবে দেখতে হবে। পশ্চিমেব সাম্রাজ্যবাদেব সঙ্গে ধনতান্ত্রিকতার যে একটা সম্পর্ক আছে তা ববীন্দ্রনাথ ক্রমশঃ উপলব্ধি করেছেন, কিন্তু করেছেন তাঁর বাশিয়া দর্শনেব পূর্বেই, এমনকি রুশ- বিপ্লবেরও আগে। পশ্চিমী ন্যাশ্‌ন্যালিজ্‌ম্-এর বিপক্ষে তিনি যে সব

ভাষণ দেন তাতে অস্ত্রসহায়ে উপনিবেশকে শোষণ এবং য়ুরোপীয় রাষ্ট্রগুলির প্রভূত ধনসঞ্চয়ের কথা তিনি বারংবার বলেছেন। 'লোভরিপু' প্রভৃতি নৈতিক কথার সহযোগে বলেছেন ব'লে সে অভিযোগের ব্যাবহারিক মূল্য স্বল্প এমন কথা বলা যায় না। জাপান-যাত্রী, পশ্চিম যাত্রীর ডায়ারি প্রভৃতি থেকে এসব বিষয়ে দৃষ্টান্ত পূর্বেই সমাহৃত হয়েছে। পণ্য উৎপাদন, মুনাফার রহস্য এবং বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদের স্বরূপ রবীন্দ্রনাথ হয়ত পুরোপুরি জানতেন না শেষ পর্যন্ত, তাঁর পক্ষে জানার কথাও নয়, আর জানলেও এ দৃষ্টিকোণের সঙ্গে তাঁর সর্বাংশে মিলও হয়ত সম্ভবপর ছিল না, তবু তাঁর কণ্ঠ থেকেই আমরা বাঙ্‌লাভাষায় শোষণজনিত সংগ্রামের প্রথম পরিচয় পাই, এও অত্যুক্তি নয়।

ধনতান্ত্রিকতাই হোক আর সামন্ততান্ত্রিক জাতিবর্ণ-বৈষম্যই হোক কবির বাস্তব ও কার্যকর সুবৃহৎ মানবিকতার মধ্যে সব নিঃশেষে মিলে গেছে। এজন্য তাঁর প্রাবন্ধিক বক্তব্যে ও কাব্যের অর্থে কোনো বিরোধ লক্ষ্য করা যায় না। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায়, উপনিষদে কথিত রস এবং আনন্দ তিনি নিসর্গ এবং মানুষের মধ্যেই রূপায়িত অনুভব করেছেন। তুরীয় কোনো লোকান্তরে নয়। তাঁর উক্তিমতে "আমার সব অনুভূতি ও রচনার ধারা এসে ঠেকেছে মানুষের মধ্যে। বার বার ডেকেছি দেবতাকে, বার বার সাড়া দিয়েছেন মানুষ।" এই মানুষ ইতিহাসের ধারায় চলমান, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব সংশয়-সংগ্রাম পতন-উত্থানের মধ্য দিয়ে অজানা পূর্ণতার যাত্রী বাস্তব মানুষই। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা, যা এখনও আমাদের শ্রোতব্য এবং জ্ঞাতব্য তা এই যে তিনি বিন্দুমাত্রও পুরাতনের পথিক ছিলেন না। তিনি চিরনূতনের বার্তাবহ এবং তা সর্বতোভাবেই। তুলনায় দেখা যায় এদেশের বুদ্ধিজীবীরা তাঁর কল্পনা এবং ভাবনা থেকে চিরকাল পিছিয়েই পড়ে থেকেছেন। যাঁরা রবীন্দ্রনাথকে উপনিষদের ব্রহ্মগত রস অমৃত প্রভৃতির বাহক ব'লে মনে করেছেন তাঁরা ভেবে দেখেননি যে রবীন্দ্রনাথ মানবীয় স্নেহপ্রেম আত্মত্যাগ দুঃখবরণের মধ্যেই অমৃত এবং ভূমাকে পেয়েছেন। তিনি জীবনের এত উচ্চ মূল্য দিয়েছেন যে তার বর্ণনায়, ভাষার অভাবে, ঐ সব শব্দ ব্যবহার করেছেন। নতুবা তিনি বর্ণাশ্রম এবং ব্রহ্ম ব্রহ্ম করে গেছেন এমন কথা তাঁর অতিবড় শত্রুরও বলা উচিত হবে না। সংস্কারবিমূঢ় প্রাচীনতার পক্ষপাতী অদূরদর্শী বিচারকেরা পাছে তাঁকে ভুল বোঝে, এজন্য তিনি আত্মপক্ষ বিশ্লেষণে নিরত হয়েছেন বার বার। তবু ঐ প্রাচীনপন্থীদের ঋষিত্ব-সংস্কারের জোর এত বেশি যে এরকম জীবনের মহাকবিকে তাঁরা পিছনেই ফেলে রাখতে প্রয়াস করলেন। যার ফলে আজকের তরুণেরা রবীন্দ্রনাথকে নমস্কার করেই বিদায় দিতে দ্বিধা করছে না। কিন্তু বিলাপী রবীন্দ্রনাথের নিজের কথা শোনা যাক—"নির্বিচার অন্ধ রক্ষণশীলতা সৃষ্টিশীলতার

বিরোধী" (কালান্তর)। "পূর্বপুরুষের পুনরাবৃত্তি করা মনুষ্য-ধর্ম নয়। জীবজন্তু তাদের জীর্ণ অভ্যাসের বাসাকে অাঁকড়ে থাকে। মানুষ যুগে যুগে নব নব সৃষ্টিতে আত্মপ্রকাশ করে।" ('গান্ধীজী')। "আমার স্বভাবটা একেবারেই সনাতনী নয়, অর্থাৎ খুঁটিগাড়া মত ও পদ্ধতির অতীতকালে আড়ষ্টভাবে বদ্ধ হয়ে থাকলেই যে শ্রেয়কে চিরন্তন করতে পারবে একথা আমি মানিনে" (কালান্তর)। দেহহীন আত্মা অর্থাৎ জীবনধর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন আদর্শ এবং ধর্মের চর্চা রবীন্দ্রকল্পনারও বাইরে, এবং যথার্থ জীবনই ধার্মিক জীবন এই তাঁর মনোভাব, যেমন—"আজ যেমন করিয়াই হোক আমাদিগকে এই দেহতত্ত্ব সাধন করিতে হইবে। যেমন করিয়াই হোক আমাদের এই কথাটা বুঝিতে হইবে যে, কলেবরহীন আত্মা কখনোই সত্য নহে" (পথের সঞ্চয়)। এক্ষেত্রে বিবেকানন্দের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধির সাদৃশ্য লক্ষণীয়। কিন্তু এই বিবেকানন্দকে আমরা সযত্নে সমাধিস্থ ক'রে ফেলেছি, এমনভাবে, যাতে তাঁর ব্যুত্থানের কোনো সম্ভাবনাই না থাকে। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও কি সেরকম করব, তাঁর সর্বাঙ্গ বল্মীক দিয়ে ঢেকে তাঁকে চ্যবনপ্রাশের উন্নততর বিজ্ঞাপনমাত্রে পরিণত করব?

নাম-নির্দেশিকা